আর্য জ্যোতি

৮ম সংখ্যা

জুলাই - সেপ্টেম্বর '২৪

২০৮১ বিক্রমাব্দ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (আষাঢ় - আশ্বিন)

বাংলাদেশ অগ্নিবীর ত্রৈমাসিক অনলাইন পত্রিকা

সূচিপত্র

ক্রমিক - বিষয় - পৃষ্ঠা সংখ্যা

১.মহর্ষির্বিরজানন্দঃ [১৭৭৬-১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ] - ১
২. যোগিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ - ২
৩. বেদে সন্ন্যাস আশ্রমের কথা কোথায় আছে ? -৫
৪. বেদে বানপ্রস্থ আশ্রমের কথা কোথায় আছে ? - ১২
৫. কুন্তাপ সূক্ত - প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা প্রসঙ্গ -১৫
৬. জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ বা অণু পরিমাণ বলতে কী বোঝায় ? -১৭
৭. মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী ? - ১৯
৮. বৈদিক ঋষি তত্ত্ব - ২১
৯. বেদ ও অহিংসার প্রকৃত স্বরূপ - ২৩
১০. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখতে কেমন ছিলেন ? - মহাভারতের আলোকে জানুন - ৩৩
১১. নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে বেদে কী বলা হয়েছে ? - ৩৫
১২. ত্রৈতবাদ নিয়ে মূর্খের আস্ফালন নিবারণ - ৩৯
১৩. ক্রিয়াযোগ কী ? - ৫৬
১৪. নামের আগে ১০৮ কেন লেখা হয় ? - ৫৭
১৫. শিব কে ? ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুযায়ী আলোচনা - ৫৮
১৬. বেদে স্নেহময়ী মায়ের বন্দনা - ২১টি বৈদিক প্রমাণ - ৬০
১৭. কেনোপনিষদে ত্রৈতবাদ - ৬৫
১৮. মুণ্ডকোপনিষদে ত্রৈতবাদ - ৬৬
১৯. ঈশ্বর মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর নাকি অধীন ? - ৬৯
২০. প্রার্থনা ও অভিশাপে কি আসলেই ফল হয় ? - ৭০
২১. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদভাষ্যের বিশেষত্ব - ৭১
২২. নিরাকারবাদীদের মন্দিরের কী প্রয়োজন ? - ৭৭
২৩. যা ভাগ্যে (কপালে) লেখা আছে তাই পাওয়া যায় অথবা ঘটে ? - ৭৯
২৪. সূর্যের গতি ও পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ - বৈদিক বিজ্ঞান -৮১
২৫. বেদ অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি কী ? - ৮৪

২৬. বাসন্তী নবশস্যেষ্টি ও হোলি উৎসব - কারণ ও পালনপদ্ধতি - ৮৫
২৭. যে ২০০টি উপকার মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদের করেছেন.... - ৯০
২৮. নারীর যজ্ঞ ও পৌরহিত্য অধিকার - বেদমন্ত্রে প্রমাণ - ১০০
২৯. বেদে ঘোড়ার মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোথায় আছে? - ১০২
৩০. যজুর্বেদ ৩২|৩ ও পরমাত্মার স্বরূপ - ১০৩
৩১. সনাতন ধর্ম কি ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা সমর্থন করে ? - ১০৮
৩২. বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের মুক্তো - ১১৩
৩৩.গুরু ছাড়া কি মুক্তি হবে না ? - ১২০
৩৪. যেকোনো অভ্যাস কীভাবে গড়ে তুলবেন ? কোন মন্ত্র পড়লে সহজে হবে? - ১২৪
৩৫. বৈদিক বিজ্ঞান - সূর্যের আলোতে বস্তুর প্রকাশ ও দর্শন - ১২৬
৩৬. অবতার বুদ্ধ আর গৌতম বুদ্ধ এক নয় ! পড়ুন প্রমাণসহ - ১২৮
৩৭. উপনিষদ রহস্য - ইন্দ্র ও যক্ষ সংবাদ - ১৩৩
৩৮. উপনিষদ্ রহস্য - অদৃশ্যই সত্য (সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ) - ১৩৬
৩৯. সত্যার্থ প্রকাশে উল্লেখিত মন্ত্র, শ্লোক ও অন্যাদি বাক্য গণনা -১৩৮
৪০. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কার কার কাছে কোন কোন শাস্ত্র পড়েছিলেন ? - ১৪১
৪১. পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরঃ -১৪৩
৪২. ভক্তরা কাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে যজ্ঞ করেও অভক্ত কারা ? - ১৪৪
৪৩. ব্রহ্মভাব কী ? - ১৪৪
৪৪. মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা - ১৪৬
৪৫. ব্রহ্মবাদিন্য ঋষিকাঃ - ১৪৭
৪৬. আসলেই কি ঈশ্বর যাকে খুশি নিজ কৃপা করেন, সবার প্রতি নয় - ১৪৮
৪৭. উপনিষদে জীবনে চলার পথের শিক্ষা - ১৪৯
৪৮. বেদে সৌরশক্তিতে চলনমান বিমান - ১৫০

মহর্ষির্বিরজানন্দঃ [১৭৭৬-১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ]

- পূজ্য ভগবৎপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতীর গুরুদেব

বৈদিক বিদ্যামার্তণ্ডো যোঽখিলপাখণ্ডবিভেত্তা যেন দয়ানন্দর্ষিসমানং, নররত্নং সমপাদি ।
যস্যাভ্যন্তরনেত্রে হ্যাস্তাং, দিব্যতেজসা পূর্ণে বন্দনীয়কমনীয়পদোঽসৌ, বিরজানন্দমহাত্মা ॥১॥
ভাবার্থ: যিনি বৈদিক বিদ্যার সূর্যসম প্রবক্তা হয়ে সর্ব পাষণ্ড মত খণ্ডন করতেন, যিনি ঋষি দয়ানন্দের ন্যায় মানবরত্ন পেয়েছিলেন, যার আভ্যন্তরীণ নেত্র জ্ঞানের তেজে পরিপূর্ণ ছিলো, সেই পূজ্য মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের বন্দনীয় পদযুগলধারী।

আর্ষগ্রন্থাধ্যয়নবিলোপো জাতো ভারতবর্ষে সর্বত্রৈবানার্ষপুস্তকাধ্যয়নে জনা নিমগ্নাঃ ।
দৃষ্ট্বনিষ্টং খলু পরিণামং, বদ্ধপরিকরো ধীরো বন্দনীয়কমনীয়পদোঽসৌ, বিরজানন্দমহাত্মা ॥২॥
ভাবার্থ: ভারতবর্ষে আর্ষগ্রন্থের পঠনপাঠন বিলোপ, অনার্ষ গ্রন্থের প্রচলনে মানুষকে নিমগ্ন হতে দেখে এবং এর অনিষ্টকর পরিণাম দেখে বদ্ধপরিকর মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের বন্দনীয়।

কথং দক্ষিণা দেয়া ভগবন্ ধনরহিতেন ময়েয়ম্ দয়ানন্দয়তিমেবং চিন্তাতুরমবলোক্য নিতান্তম্ ।
মৈবং বিধাং দক্ষিণামীহে মাকার্ষীস্ত্বং চিন্তাং সমাশ্বাসয়ন্নিত্থং বন্দ্যো, বিরজানন্দমহাত্মা ॥৩॥
ভাবার্থ: 'ভগবন্ ! আমি কী দক্ষিণা দিবো ? আমি যে ধনহীন ' সন্ন্যাসী দয়ানন্দের এই চিন্তা দেখে যিনি কোন ধন দক্ষিণা চান না বলেছিলেন, সেই মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের বন্দনীয় ।

বৈদিকমার্গ সরলং ত্যক্ত্বা জনাঃ শুদ্ধমতিহীনাঃ, ইতস্ততো ভ্রষ্টা অতিদীনাঃ, শোচনীয়গতিমাপ্তাঃ ।
সন্মার্গ সন্দর্শ্য বৎস তান্, দলিতান্ পতিতানুদ্ধর, এবং বদন্নুদারো বন্দ্যো, বিরজানন্দমহাত্মা ॥৪॥
ভাবার্থ: 'হে শিষ্য ! সরল বৈদিক মার্গ ত্যাগ করে এদিক-ওদিকে বিভ্রান্ত দীন, শোচনীয় গতিপ্রাপ্তদের সত্যের পথ দেখিয়ে দলিত-পতিতজনকে উদ্ধার করো ', নিজ শিষ্য দয়ানন্দকে এমম উপদেশ দাতা মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের বন্দনীয় ।

আর্ষান্ গ্রন্থানপঠিত্বা যেঽনার্ষপুস্তকেষ্বাস্থাং, কৃত্বা সম্প্রদায়শতভক্তা ভূত্বাতীব বিভক্তাঃ ।
নিগমাগমদীক্ষাং ত্বং তেভ্যো দত্বা ধ্বান্তং পরিহর, ইমাং দক্ষিণামুররীকুর্বন্ বিরজানন্দয়তীড্যঃ ॥৫॥
ভাবার্থ: 'আর্ষগ্রন্থ না পড়ে, অনার্ষ পুস্তক পড়ে যারা শত সম্প্রদায়ে ভক্ত নামে বিভক্ত হচ্ছে তাদের বেদমার্গে এনে অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করো ' ঋষি দয়ানন্দের কাছে যিনি গুরুদক্ষিণা হিসেবে এই প্রতিজ্ঞা চেয়েছিলেন সেই মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের পূজনীয়।

অন্তেবাসী যেন দয়ানন্দর্ষিসমানোঽলম্ভি, যস্য খ্যাতিস্তৎকৃতসুকৃতৈরখিলে ভুবনে ব্যাপ্তা ।
ত্যাগতপস্যামূর্তিরুদারো গুরুরাদর্শাচার্যো, বন্দনীয়কমনীয়পদোঽসৌ বিরজানন্দমহাত্মা ॥৬॥

ভাবার্থ: যিনি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শিষ্য পেয়েছিলেন, যে মহর্ষি দয়ানন্দের কীর্তি সম্পূর্ণ সংসারে ব্যপ্ত হয়েছে, যে দয়ানন্দ ত্যাগ-তপস্যার প্রতিমূর্তি ছিলেন সেই মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর গুরু ও আদর্শ মহাত্মা বিরজানন্দের পদযুগল আমাদের বন্দনীয় ।

স্বতন্ত্রতার্থং কৃতে বিপ্লবে, যেন গৃহীতো ভাগঃ, তথা প্রেরিতা ভূপাঃ কর্তুং ক্রান্তিমুত্তমাং ঘোরাম্ ।
দেশোন্নতিহিতশুভা ভাবনা ভরিতাঃ প্রিয়তমশিষ্যে, নবযুগনির্মাতা কিল বন্দ্যো বিরজানন্দমহাত্মা ॥৭॥
ভাবার্থ: স্বাধীনতা বিপ্লবে যিনি অংশ নিয়েছিলেন, যার প্রেরণায় রাজারা স্বতন্ত্র-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলো, মহর্ষি দয়ানন্দ দেশের ক্রান্তিলগ্নে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য যিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই নবযুগ নির্মাতা মহাত্মা বিরজানন্দ আমাদের বন্দনীয় ।

- পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যোগিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ

যো যোগিরাজঃ কিল কর্মযোগ-
মার্গস্য নেতৃত্বমলঞ্চকার ।
সদ্ধর্মসংরক্ষণদত্তচিত্তঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥১॥
ভাবরূপ: যে যোগিরাজ শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ মার্গের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সদ্‌ধর্ম রক্ষায় চিত্তার্পণ করেছেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

জ্ঞানী সুবীরঃ শুভগায়কো যো
গুণাকরঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা ।
তথাপ্যহঙ্কারলবেন হীনঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥২॥
ভাবরূপ: যিনি জ্ঞানী, উত্তম বীর, গায়ক, গুণাকর ও নিত্য সনাতন ধর্মের রক্ষক হয়েও অহংকার শূন্য ছিলেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

পরোপকারার্পিতজীবিতো যঃ
কংসাদিদুষ্টারিগণস্য হন্তা ।
গীতামৃতং পায়য়িতা প্রশস্তং
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৩॥

ভাবরূপ: যিনি পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন, কংসাদি দুষ্ট শত্রুর হনন করলেন, প্রসিদ্ধ গীতামৃত মানুষকে পান করালেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

সন্ধ্যাগ্নিহোত্রাদিককৃত্যজাতং
সন্নিষ্ঠয়া যো বিদধেঽপ্রমত্তঃ ।
দেবেশভক্ত্যাধিগতপ্রসাদঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৪॥

ভাবরূপ: যিনি সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম প্রমাদহীনভাবে করতেন, প্রভুভক্তিতে যার অদ্ভুত শক্তি প্রসাসরূপে লাভ হয়েছিলো - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

টীকা: যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভোর এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যা করা, যজ্ঞ করা, সূর্য নমস্কার করার কথা স্বয়ং মহাভারতেই লেখা আছে। মহাভারত ৫.৮২.৬-৯, ৫.৮৪.২০-২২, ১৩.৫২.৭ দ্রষ্টব্য।

আত্মাঽবিনাশী হ্যজরোঽমরোঽয়ং।
মৃত্যুস্তু বাসঃ পরিবর্ত এব।
ইত্যাদিতত্ত্বং প্রদিশন্ যথার্থং
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৫॥

ভাবরূপ: এই আত্মা অমর, মৃত্যু বস্ত্র পরিবর্তনের মতো ; এই যথাযথ তত্ত্ব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

টীকা: গীতা ২.২২ দ্রষ্টব্য ।

ভূত্বেহলোকে গুণসাগরোঽপি
যঃ পাদপূজাং বিদধে দ্বিজানাম্ ।
আসীৎ সুহৃদ্ যো ধনবর্জিতানাং
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৬॥

ভাবরূপ: গুণাকর হয়েও রাজসূয় যজ্ঞে যিনি ব্রাহ্মণ পদপ্রক্ষালণের কর্ম গ্রহণ করেছিলেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

টীকা: সভাপর্ব ৩৫.১০ দ্রষ্টব্য।

বিপ্রে সুশীলে বিনয়োপপন্নে
তথা শ্বপাকে শুনি গোগজেষু ।
সমানদৃষ্টিং য ইহাদিদেশ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৭॥

ভাবরূপ: যিনি বিনীত, সুশীল, বিপ্র, চণ্ডাল, কুকুর ও হাতিতেও সমদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

টীকা: গীতা ৫.১৮ দ্রষ্টব্য।

আসীৎ ক্ষমাবান্ ধৃতিমান্ নয়জ্ঞো
যো রাজনীতৌ কুশলোঽদ্বিতীয়ঃ ।
ত্রাতা সতাং পাপিদলস্য ছেত্তা
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৮॥
ভাবরূপ: যিনি ক্ষমাশীল, ধৈর্যবান, নীতিজ্ঞ, রাজনীতিতে অদ্বিতীয় কুশল ছিলেন , যিনি সাধুদের রক্ষক ও পাপীদের নাশক ছিলেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

ক্লৈব্যং প্রপন্নং যুধি পার্থ শূরং
বিসৃজ্য চাপং বিকলং স্থিতং তম্ ।
বিবোধ্য ধর্মং বিদধে সুবীরং
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৮॥
ভাবরূপ: ভাবরূপ: যুদ্ধের প্রারম্ভে ক্লীবত্বভাব প্রাপ্ত হওয়া, ধনুকত্যাগী, ব্যাকুলচিত্ত অর্জুনকে ধর্মতত্ত্ব অনুধাবন করিয়ে পুনর্বার বীর তৈরি করেছেন যিনি - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

যোগস্য যজ্ঞস্য সুখস্য শান্তে-
স্ত্যাগস্য তত্ত্বং সুরসম্পদশ্চ ।
জ্ঞানস্য ভক্তেস্তপসো দিশন্ নঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥৯॥
ভাবরূপ: যোগ, যজ্ঞ, সুখ, শান্তি, ত্যাগ, দৈবী সম্পত্তি, জ্ঞান, ভক্তি, তপস্যার বাস্তবিক স্বরূপ বক্তা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

জাতোঽমরো দিব্যগুণৈঃ স্বকীয়ৈ-
র্মতো জনৈর্যো ভগবানিবেহ ।
যজ্ঞান্বিতং জীবিতমাদধানঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥১০॥
ভাবরূপ: যিনি স্বীয় দিব্যগুণে অমর হয়েছেন, যাকে মানুষ ভগবান জ্ঞান করে এমন যজ্ঞময় জীবনধারক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

যদীয়শিক্ষা প্রদদাতি মোদং
স্ফূর্তিং নবোৎসাহবলং সুধৈর্যম্ ।
শ্রদ্ধান্বিতানাং মনসাং স সম্রাট্
কৃষ্ণো মহাত্মা ন হি কেন বন্দ্যঃ ? ॥১১॥

ভাবরূপ: যাকে শিক্ষা প্রসন্নতা, নব উদ্যম, উৎসাহ ও ধৈর্য দান করে, শ্রদ্ধালুদের যিনি হৃদয় সম্রাট - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

যো ঘাতকায়াশিষ এব দত্ত্বা
চকার শান্ত্যা পরলোকযাত্রাম্ ।
বভূব মুক্তঃ প্রভুতত্ত্ববেত্তা
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥১২॥
ভাবরূপ: যিনি ঘাতককেও আশীর্বাদ দিয়ে শান্তিতে পরলোক যাত্রা করেছিলেন, যিনি প্রভুতত্ত্ববেত্তা হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

সংস্থাপ্য সাম্রাজ্যমধর্মনাশং
কর্তুং তথা ধর্মবিবর্ধনায় ।
যেন প্রযত্নো বিহিতোঽভিনন্দ্যঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥১৩॥
ভাবরূপ: যিনি আর্যসাম্রাজের স্থাপনা করে ধর্মের বৃদ্ধি ও অধর্মের নাশের জন্য প্রশংসনীয় প্রযত্ন করেছেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?

যো মোহনঃ স্বীয়গুণৈঃ প্রশস্তৈঃ
স্থিতো জনানাং হৃদয়েষু নিত্যম্ ।
নিষ্কামকর্মাণ্যকরোৎসদা যঃ
কৃষ্ণো মহাত্মা স ন কেন বন্দ্যঃ ? ॥১৪॥
ভাবরূপ: যে মোহন নিজের শ্রেষ্ঠ গুণের জন্য মানুষের হৃদয়ে সদা নিবাস করেন, যিনি সর্বদা নিষ্কাম কর্মই করেছেন - এমন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কার বন্দনীয় না ?
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে সন্ন্যাস আশ্রমের কথা কোথায় আছে ?

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সমস্ত মোহাদি আবরণ ও পক্ষপাতত্যাগ করা। সন্ন্যাসী তাঁকেই বলে যিনি সমস্ত কুকর্ম ও নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যান এবং বৈরাগ্যবান হয়ে পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করেন [ঋগ্বেদ ৯।১১৩।১-১১, মনুস্মৃতি ৬।৩৩-৮৫]। যিনি ধন, পুত্র এবং যশের ইচ্ছা থেকে ওপরে উঠে গেছেন, তিনি নির্ভয় হয়ে সমস্ত জায়গায় ধর্মের প্রচার করেন। অধর্ম, অন্যায়, অত্যাচারের ঘোর বিরোধিতা করেন। যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেম–দৃষ্টি রাখেন। এমন সত্যিকারের সন্ন্যাসীর সংখ্যা যত অধিক হবে তত তাড়াতাড়ি সংসারের ভালো এবং উদ্ধার হবে।

প্রশ্ন- সন্ন্যাসগ্রহণের দরকার কী?

উত্তর - শরীরের যেমন মাথার দরকার তেমন আশ্রমসমূহের মধ্যেও সন্ন্যাসের দরকার। কারণ সন্ন্যাস ব্যতীত কখনও বিদ্যোন্নতি ও ধর্মোন্নতি হতে পারে না । অন্যান্য আশ্রমস্থদের বিদ্যাভ্যাস, গৃহকৃত্য এবং তপশ্চর্যাদি থাকার জন্য অবসর

অতি অল্পই থাকে। পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্বক কার্য করা অন্য আশ্রমবাসীর পক্ষে দুষ্কর। সন্ন্যাসী যেমন সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে জগতের উপকার করেন তেমন অন্য কোন আশ্রমবাসী করতে পারে না। কারণ সত্যবিদ্যা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সন্ন্যাসীর যেমন অবকাশ থাকে, অন্য কোন আশ্রমবাসীর তেমন থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য থেকে সন্ন্যাসী হয়ে সত্যেপদেশ দ্বারা জগতের যেমন উন্নতি করা যায় গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাসী হলে তেমন করা যায় না।

প্রশ্ন- সন্ন্যাস গ্রহণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কারণ মানবসংখ্যাবৃদ্ধি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। গৃহস্থাশ্রম প্রতিপালন না করলে তার দ্বারা সন্তানও হবে না। যদি সন্ন্যাস আশ্রমই মুখ্য হয় এবং সকল মানুষ তা গ্রহণ করে তবে মানুষের মূলোচ্ছেদ হবে।

উত্তর - আচ্ছা, বিবাহ করেও অনেকের সন্তান হয় না অথবা হলেও শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। তাও তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ হল। যদি বল, 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ' এটা কোন কবির উক্তি [পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৪.২১৭]= চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধি না হলে তাতে আমার কোন দোষ নেই। তাহলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যদি গৃহস্থাশ্রম পালন করে বহু সন্তান জন্মে এবং তারা পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ ও বিবাদ করে মরে তবে কতদূর অনিষ্ট হয়ে থাকে? ভুল বুঝার জন্য অনেক বিবাদ হয়ে থাকে। যখন সন্ন্যাসী এক বেদোক্তধর্মের উপদেশ দ্বারা পরস্পর প্রীতি উৎপন্ন করবেন তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ষা পাবে এবং সহস্র সহস্র গৃহস্থের ন্যায় মানব বৃদ্ধি হবে। আর সকল মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই পারে না। কারণ সবার বিষয়াসক্তি কখনো দূর হয় না। সন্ন্যাসীদের উপদেশ অনুসারে যাঁরা ধার্মিক হন তারা সন্ন্যাসীদের পুত্র তুল্য জানবে।

প্রশ্ন - সন্ন্যাসীরা বলেন আমাদের কোন কর্তব্য নাই। অন্ন বস্ত্র পেয়ে আনন্দে থাকব। অবিদ্যারূপী সংসার নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? নিজেকে ব্রহ্ম মেনে সন্তুষ্ট থাকব এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাকেও উপদেশ দেব, 'তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, কারণ শীতা-উষ্ণ শরীরের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম। জগৎ মিথ্যা এবং জগতের যাবতীয় ব্যবহারও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং তাতে আবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাপপুণ্য যা কিছু সব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, আত্মার নয়' ইত্যাদি । তারা এসব উপদেশ দিয়ে থাকেন । কিন্তু আপনি সন্ন্যাসের অন্য রকম ধর্ম বলছেন। এখন কার কথা সত্য মানব?

উত্তর- সৎকর্ম করাও কি তাদের কর্তব্য নয়? দেখ, 'বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ' মনু০ [৬.৭৫]। মনু লিখেছেন, 'বৈদিক কর্ম' যা ধর্মসঙ্গত সত্য কর্ম তা সন্ন্যাসীদেরও অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাসীরা কি গ্রাসাচ্ছাদনাদি কর্মও পরিত্যাগ করতে পারে? যদি এসব পরিত্যাগ করা না যায় তবে উত্তম কর্ম পরিত্যাগ করলে তারা কি পতিত হবে না? যদি তারা গৃহস্থদের নিকট হতে অন্নবস্ত্রাদি গ্রহণ করে কিন্তু তাদের কোন প্রত্যুপকার না করে তবে কি তারা মহাপাপী হবে না? যেমন চোখ দিয়ে না দেখলে এবং কান দিয়ে না শুনলে চোখ-কান থাকা বৃথা তেমনি সত্যোপদেশ ও বেদাদি সত্যশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার না করলে সন্ন্যাসীরা জগতে বৃথা, ভারস্বরূপ হয়ে থাকে।

আর যে 'অবিদ্যারূপী সংসারে মাথা কেন ঘামাব' ইত্যাদি কথা লেখা ও বলা হয়, যারা এমন উপদেশ প্রদান করে তারা স্বয়ং মিথ্যাস্বরূপ পাপের বৃদ্ধিকারী পাপী। শরীরাদি দ্বারা যেসব কর্ম করা হয় সেসব আত্মারই কর্ম এবং আত্মাই সেসবের ফলভাোগী । যারা জীবকে ব্রহ্ম বলে তারা অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত। কারণ জীব একদেশী ও অল্পজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য, বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাবযুক্ত। আর জীব কখনও বদ্ধ ,কখনও মুক্ত থাকে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বলে তার কখনও অবিদ্যা অথবা ভ্রম হতে পারে না। কিন্তু জীবের কখনও বিদ্যা, কখনও অবিদ্যা হয়ে থাকে। ব্রহ্ম কখনও জন্ম-মরণ জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জীব তা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাদের ওসব উপদেশ মিথ্যা।

বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।
চতুর্থং আয়ুষো ভাগং ত্যক্বা সঙ্গান্পরিব্রজেৎ॥১॥ [মনু০ ৬।৩৩]

এভাবে বনে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ বছর থেকে,পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বানপ্রস্থে থেকে আয়ুর চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ করে 'পরিব্রাট্' অর্থাৎ সন্নাসী হবে।

প্রশ্ন- ব্রহ্মচর্য থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তা পালন করা কঠিন হবে। কাম নিরাোধ করা অতি কঠিন। তাই গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম শেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করাই ভালো।

উত্তর- যিনি সন্ন্যাস পালনে ও ইন্দ্রিয় নিরোধে অসমর্থ, তিনি ব্রহ্মচর্য হতে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যিনি সমর্থ তিনি গ্রহণ করবেন না কেন? যিনি বিষয়ভোগের দোষ ও বীর্যসংরক্ষণের গুণ জানেন তিনি কখনো তাতে আসক্ত হন না, এবং তারা বীর্য বিচার রূপ অগ্নির ইন্ধন সদৃশ অর্থাৎ তাতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। রোগীর জন্য চিকিৎসক ও ঔষধের দরকার, নীরোগের জন্য নয়। এমনই যে পুরুষ বা নারীর উদ্দেশ্য বিদ্যোন্নতি, ধর্মোন্নতি ও সমস্ত জগতের উন্নতি করা তিনি বিবাহ করবেন না। পঞ্চশিখ প্রভৃতি পুরুষ এবং গার্গী প্রভৃতি নারী এমন ছিলেন। তাই যাঁরা অধিকারী তাদের সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, অনধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করলে নিজেও ডুববেন এবং অপরকেও ডোবাবেন। যেমন 'সম্রাট'সর্বোপরি চক্রবর্তী রাজা তেমনই সন্ন্যাসী 'পরিব্রাট্'। বরং রাজা স্বদেশে অথবা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সম্মানিত হন আর সন্ন্যাসী সর্বত্র পূজিত হন।

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ।।১॥ এটি চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক[৩]।

বিদ্বান এবং রাজা কখনো সমতুল্য হন না, কারণ রাজা কেবল নিজ দেশেই সম্মান লাভ করেন, আর বিদ্বান সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আসুন সন্ন্যাস সম্পর্কে বেদ কী বলে জেনে নেই -

শ॒র্য॒ণাব॑তি॒ সোম॒মিন্দ্র॑: পিবতু বৃত্র॒হা।
বল॑ং দধা॑ন আ॒ত্মনি॑ কৃ॒ষ্যন্বী॒র্যং॑ ম॒হদিন্দ্রা॑য়েন্দো॒ পরি॑ স্রব॥১॥
আ প॑বস্ব দিশাং পত আর্জী॒কাৎ সো॑ম মী॒ঢ্বঃ।
ঋ॒ত॒বা॒কেন॑ স॒ত্যেন॑ শ্র॒দ্ধয়া॒ তপ॑সা সু॒ত ইন্দ্রা॑য়েন্দো॒ পরি॑ স্রব ॥ ২।।

[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ১-২]

অর্থঃ- আমি ঈশ্বর, সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, যেমন (বৃত্রহা) মেঘবিনাশক (ইন্দ্রঃ) সূর্য্য (শর্যণাবতি) হিংসনীয় পদার্থযুক্ত ভূমিতলে স্থিত (সোমম্) রসকে পান করে, সেরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক পুরুষ উত্তম ফলমূলের রসকে (পিবতু) পান

করুক এবং (আত্মনি) নিজের আত্মার (মহৎ) মহৎ (বীর্যম্) সামর্থ্যকে (করিষ্যন্) বৃদ্ধি করবো, এইরূপ ইচ্ছা করে (বলং দধানঃ) দিব্যবল ধারণপূর্বক (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্যের জন্য, হে (ইন্দো) চন্দ্রমাসদৃশ সকলকে আনন্দদাতা পূর্ণ বিদ্বান্! তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সকলের উপর (পরি স্রব) সত্যোপদেশ বর্ষণ করো। ॥১॥

হে (সোম) সৌম্যগুণসম্পন্ন (মীঢ়্ব) সত্য দ্বারা সকলের অন্তঃকরণকে সিঞ্চনকারী, (দিশাং পতে) সত্যজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সর্বদিকস্থ মনুষ্যের পালক, (ইন্দো) শম ইত্যাদি গুণযুক্ত সন্ন্যাসী! তুমি (ঋতবাকেন) যথার্থ ন্যায় বচন, (সত্যেন) সত্যভাষণ দ্বারা, (শ্রদ্ধয়া) সত্যধারণে সত্য প্রীতি এবং (তপসা) প্রাণায়াম, যোগাভ্যাস দ্বারা (আর্জীকাৎ) সরলতাপূর্বক (সুতঃ) নিষ্পন্ন নিজের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে (আ পবস্ব) পবিত্র করো, (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্যবান্ পরমেশ্বরের জন্য (পরি স্রব) সর্বদিকে গমন করো। ॥২॥

ঋ॒তং বদ॑ন্নৃত॒দ্যু॒ম্ন স॒ত্যং বদ॑ন্ত্সত্যকর্মন্।

শ্রদ্ধাং বদন্ত্সোম রাজন্ধাত্রা সোম্ পরিষ্কৃত্ ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥৩॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ৪]

অর্থঃ- হে (ঋতদ্যুম্ন) সত্যধন ও সত্যকীর্তিময় যতিবর! (ঋতং বদন্) নিরপেক্ষভাবে সত্যবাদী, (সত্যকর্মন্) সত্য, বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা হে সন্ন্যাসী! (সত্যং বদন) সত্য বলতে, (শ্রদ্ধাম্) সত্যধারণে প্রীতি করতে (বদন) উপদেশ প্রদাতা, (সোম) সৌম্যগুণসম্পন্ন, (রাজন্) জ্যোতির্ময় আত্মবান্, (সোম) যোগৈশ্বর্যযুক্ত (ইন্দো) সকলকে আনন্দদাতা হে সন্ন্যাসী! তুমি (ধাত্রা) সম্পূর্ণ বিশ্বের ধারণকর্তা পরমাত্মার অবলম্বনে যোগাভ্যাস করে (পরিষ্কৃতঃ) শুদ্ধ হয়ে (ইন্দ্রায়) যোগোৎপন্ন পরমৈশ্বর্যের সিদ্ধির জন্য (পরি স্রব) যথার্থ পুরুষার্থ করো। ॥৩॥

যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং৩ বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥৪॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ৬]

অর্থঃ- (ছন্দস্যাম্) স্বতন্ত্র (বাচম্) বাণী (বদন) বলতে বলতে (সোমেন) বিদ্যা, যোগাভ্যাস ও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা (আনন্দম্) সকলের জন্য আনন্দ (জনয়ন্) প্রকট করতে করতে, (ইন্দো) আনন্দদাতা (পবমান) পবিত্রাত্মা ও পাবক হে সন্ন্যাসী! (যত্র) যে (সোমে) পরমৈশ্বর্য্যময় পরমাত্মায় (ব্রহ্মা) চতুর্বেদজ্ঞাতা বিদ্বান্ (মহীয়তে) মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে সৎকার লাভ করেন, যেমন (গ্রাব্ণা) মেঘ দ্বারা সমস্ত জগতের আনন্দ হয়, তেমনই তুমি সকলকে (ইন্দ্রায়) সেই পরমৈশ্বর্য্যময় মোক্ষানন্দ দানের জন্য সর্বপ্রকার সাধন (পরি স্রব) সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। ॥৪॥

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্ ।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥৫॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ০৭]

অর্থঃ- হে (পবমান) অবিদ্যাদি ক্লেশনাশক, পবিত্রস্বরূপ (ইন্দো) সর্বানন্দদায়ক পরমাত্মা! (য়ত্র) এই- তোমার স্বরূপে (অজস্রম্) নিরন্তর ব্যাপক তোমার (জ্যোতিঃ) তেজ, (য়স্মিন্) যে (লোকে) জ্ঞান দ্বারা দর্শনযোগ্য তোমাতে (স্বঃ) নিত্য সুখ (হিতম্) অবস্থিত, (তস্মিন্) সেই (অমৃতে) জন্ম-মৃত্যু এবং (অক্ষিতে) নাশরহিত, (লোকে) জ্ঞান দ্বারা দর্শনযোগ্য স্বীয় স্বরূপে তুমি (মা) আমাকে (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য (ধেহি) কৃপা করে ধারণ করো এবং আমার প্রতি মাতার মতো কৃপা পূর্বক (পরি স্রব) আনন্দ বর্ষণ করো। ॥৫॥

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥৬॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ০৮]

অর্থঃ- হে (ইন্দো) আনন্দদাতা পরমাত্মন্! (য়ত্র) যে তোমাতে (বৈবস্বতঃ) সূর্যের প্রকাশ (রাজা) প্রকাশিত হচ্ছে, (য়ত্র) যে তোমাতে (দিবঃ) বিদ্যুৎ, অথবা কু-বাসনার (অবরোধনম্) অবরোধ বিদ্যমান, (য়ত্র) যে তোমাতে (অমূঃ) সেই কারণরূপ (যহ্বতীঃ) বৃহৎ ব্যাপক আকাশস্থ (আপঃ) প্রাণপ্রদ বায়ু বিদ্যমান, (তত্র) তোমার সেই আপন স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মোক্ষ লাভ (কৃধি) করাও। (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্যের জন্য (পরি স্রব) তুমি আমায় আর্দ্রভাবপূর্বক প্রাপ্ত হও॥৬॥

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥৭॥

[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ৯]

অর্থঃ- হে (ইন্দো) পরমাত্মন্! (য়ত্র) যে তোমাতে (অনুকামম্) ইচ্ছানুকূল স্বতন্ত্র (চরণম্) বিচরণ বিদ্যমান, (য়ত্র) যে (ত্রিনাকে) ত্রিবিধ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখরহিত, (ত্রিদিবে) তিন, [অর্থাৎ] সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও ভৌম্য অগ্নি [এই তিন] দ্বারা প্রকাশিত সুখস্বরূপ তোমাতে (দিবঃ) কামনাযোগ্য শুদ্ধ কামনাযুক্ত, (লোকাঃ) যথার্থ জ্ঞানযুক্ত (জ্যোতিষ্মন্তঃ) শুদ্ধ বিজ্ঞানযুক্ত, মুক্তি লাভ করা সিদ্ধপুরুষ বিচরণ করেন, (তত্র) তোমার সেই স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মোক্ষ প্রাপ্ত (কৃধি) করাও এবং (ইন্দ্রায়) সেই পরম আনন্দৈশ্বর্য্যের জন্য (পরি স্রব) [আমাকে] কৃপা পূর্বক প্রাপ্ত হও। ॥৭॥

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥৮॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ১০]

অর্থঃ- হে (ইন্দো) নিষ্কামানন্দদাতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা! (য়ত্র) যে তোমাতে (কামাঃ) সব কামনা (নিকামাঃ) ও অভিলাষ দূরে চলে যায় (চ) এবং (য়ত্র) যে তোমাতে (ব্রধ্নস্য) বৃহত্তম প্রকাশমান সূর্য্যের (বিষ্টপম্) বিশিষ্ট সুখ বিদ্যমান, (চ) এবং (য়ত্র) যে তোমাতে (স্বধা) [তোমার] নিজেরই [স্বরূপ] ধারণ (চ) ও যে তোমাতে (তৃপ্তিঃ) পূর্ণ তৃপ্তি বিদ্যমান, (তত্র) [তোমার] সেই আপন স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মুক্তি প্রাপ্ত (কৃধি) করাও এবং (ইন্দ্রায়) সর্ব দুঃখ বিনাশের জন্য তুমি আমার উপর (পরি স্রব) করুণা করো। ॥৮॥

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥৯॥
[ঋগ্বেদ ৯। ১১৩। ১১]

অর্থঃ- হে (ইন্দো) সর্বানন্দময় জগদীশ্বর! (য়ত্র) যে তোমাতে (আনন্দাঃ) সম্পূর্ণ সমৃদ্ধি, (চ) এবং (মোদাঃ) সম্পূর্ণ হর্ষ, (মুদঃ) সম্পূর্ণ প্রসন্নতা, (চ) এবং (প্রমুদঃ) প্রকৃষ্ট প্রসন্নতা (আসতে) স্থিত রয়েছে, (য়ত্র) যে তোমাতে (কামস্য) কামনাযুক্ত পুরুষের (কামাঃ) সব কামনা (আপ্তাঃ) পূর্ণ হয়, (তত্র) [তোমার] সেই স্বীয় স্বরূপে (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্যের জন্য (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) জন্ম-মৃত্যুর দুঃখরহিত মোক্ষ প্রদান করো, যাতে মোক্ষকালীন সময়ের মধ্যে সংসারে আর ফিরে আসতে না হয়, সেই মুক্তি (কৃধি) [আমাকে] প্রদান করো এবং একইভাবে সব জীবকে (পরি স্রব) সর্বদিক হতে প্রাপ্ত হও। ॥৯॥

যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূল্হমা সূর্যমজভর্ত্তন॥১০॥
[ঋগ্বেদ ১০। ৭২। ৭]

অর্থঃ- হে (দেবাঃ) পূর্ণ বিদ্বান্ (যতয়ঃ) সন্ন্যাসীগণ! তোমরা (যথা) যেরূপ (অত্র) এই (সমুদ্রে) আকাশে (গূল্হম্) গুপ্ত (আ সূর্যম্) স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ সূর্যাদির প্রকাশক যে পরমাত্মা বিদ্যমান, তাঁকে (আ অজভর্তন) চতুর্দিক থেকে স্বীয় আত্মায় ধারণ করো ও আনন্দিত হও, সেরূপ (য়ৎ) যে (ভুবনানি) সব ভুবনস্থ গৃহস্থাদি মনুষ্য আছে, তাদেরকে সর্বদা (অপিন্বত) বিদ্যা ও উপদেশ দান করতে থাকো, এটাই তোমাদের পরম ধর্ম। ॥১০॥

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু॥১১॥

[অথর্ববেদ ১৯। ৪১। ০১]

অর্থঃ- হে বিদ্বানগণ! যারা (ঋষয়ঃ) বেদার্থবিদ্যা প্রাপ্ত, (স্বর্বিদঃ) সুখ প্রাপ্ত, (অগ্রে) প্রথম (তপঃ) ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রমকে সম্পূর্ণ সেবন তথা যথাবিধি স্থিরতাপূর্বক প্রাপ্ত হয়ে (ভদ্রম্) কল্যাণ (ইচ্ছন্তঃ) কামনা করে, (দীক্ষাম্) সন্ন্যাসের দীক্ষাকে (উপনিষেদুঃ) ব্রহ্মচর্য দ্বারাই প্রাপ্ত হন, তাঁদেরকে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (উপসংনমন্তু) যথাবিধি সম্মান করুন। (ততঃ) তারপর (রাষ্ট্রম্) রাজ্য (বলম্) বল (চ) ও (ওজঃ) পরাক্রম (জাতম্) উৎপন্ন হোক, (তৎ) তা দ্বারা (অস্মৈ) এই সন্ন্যাসাশ্রম পালনের জন্য যত্ন করতে থাকুন। ॥১১॥

যে দেহধারী সে কখনও সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি হতে পৃথক থাকতে পারে না। যখন অশরীরী জীবাত্মা শুদ্ধ হয়ে মুক্তি অবস্থায় সর্বত্রব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত অবস্থান করে, তখন তার সাংসারিক সুখদুঃখ থাকে না। এজন্য-

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।। শত০ কা০ ১৪ [১৪.৬.৪.১]॥

পুত্রাদির মোহ; লাভ, ঐশ্বর্যজনিত ভোহ-সম্মান; লোকপ্রতিষ্ঠা থেকে পৃথক হয়ে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষুক হয়ে দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকেন।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তস্যাং সর্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ॥১॥ যজুর্বেদব্রাহ্মণে, [ন্যা০ বা০ ভা০ ৪.১.৬১]

প্রাজাপত্যং নিরুপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্ ।

আত্মন্যগ্নীন্সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ ॥২॥

যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ ।

তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩॥ মনু০ ৬ [৩৮,৩৯]

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করে তাতে যজ্ঞোপবীত শিখাদি চিহ্ন ত্যাগ করে, আহবনীয়াদি পাঁচ অগ্নিকে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান এই পঞ্চপ্রাণে আরোপণ করে ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসী হবে।।১-২।।

যিনি সর্বভূত=প্রাণিমাত্রকে অভয়দান করে গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে সন্নাসী হন সেই ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত ধর্মাদি বিদ্যার উপদেষ্টা সন্ন্যাসী প্রকাশময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লাভ প্রাপ্ত হন ।।৩।।

প্রশ্ন - সন্ন্যাসীদের ধর্ম কী?

উত্তর - পক্ষপাত রহিত ন্যায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্য বর্জন, ঈশ্বরের বেদোক্ত আজ্ঞা পালন, পরোপকার, সত্যভাষণাদি লক্ষণ সকল আশ্রমবাসীরই অর্থাৎ মানবমাত্রেরই একই রকম। তবে সন্ন্যাসীর বিশেষ ধর্ম হলো - মনু০ ৬ [৪৬, ৪৮-৪৯, ৫২, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭০-৭৩, ৭৫, ৮০,৯১, ৯২,৮১]

পথে গমনকালে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করে নিম্নে ভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখবে, সর্বদা বস্ত্রদ্বারা ছেঁকে জল পান করবে, নিরন্তর সত্য কথাই বলবে এবং সর্বদা মনে মনে বিচার করে সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জন করবে ॥১॥

কোন স্থানে উপদেশ অথবা কথোপকথন কালে কেউ সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হলে অথবা তার নিন্দা করলে, তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে তার কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করা সন্ন্যাসীর কর্তব্য। মুখের এক, নাসিকার দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্রে বিকীর্ণ বাণীকে কোন কারণে মিথ্যা কখনও বলবে না ॥২॥

স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মাতে স্থির নিরপেক্ষ থেকে মদ্য-মাংসাদি বর্জনপূর্বক আত্মারই সাহায্যে সুখার্থী হয়ে এই সংসারে ধর্মোন্নতি ও বিদ্যোন্নতিজনক উপদেশার্থ সর্বদা পর্যটন করতে থাকবে ।।৩।।

কেশ, নখ, দাঁড়ি ও গোঁফ কাটবে; সুন্দর পাত্র,দণ্ড ধারণ ও কুসুম্ভ প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধানপূর্বক নিশ্চিতাত্মা হয়ে ও কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে সর্বত্র বিচরণ করবে ॥৪॥

ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্মাচরণ হতে নিবৃত্ত করে রাগদ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক সকল প্রাণীর প্রতি নির্বৈর থেকে মাোক্ষের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে থাকবে ।।৫।।

কেউ সংসারে নিন্দা বা স্তুতি করলে সন্ন্যাসী সকল আশ্রমস্থ মনুষ্য ও সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য হয়ে স্বয়ং ধর্মাত্মা থাকবে এবং অপরকে ধর্মাত্মা করতে চেষ্টা করবে । মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানবে যে শুধুমাত্র দণ্ড, কমণ্ডলু এবং গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্নধারণ ধর্মের কারণ নয়। মানুষকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান দ্বারা তাদের উন্নতি করাই সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য ।।৬।।

যদো নির্মলী বৃক্ষের ফল পেষণ করে অপরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করলে জল পরিষ্কৃত হয় কিন্তু নিক্ষেপ না করে তার নাম মাত্র উচ্চারণ বা শ্রবণ দ্বারা জল পরিষ্কৃত হতে পারে না ॥৭॥

অতএব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর কর্তব্য এই যে, তিনি ওঙ্কার সহিত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা বিধিপূর্বক যথাশক্তি প্রাণায়াম করবেন। কিন্তু কখনো তিনটির কম প্রাণায়াম করা উচিত নয়। এটিই সন্ন্যাসীর পরম তপস্যা ।।৮।।

যেমন অগ্নিতে ধাতুদের উত্তপ্ত অথবা দ্রবীভূত করলে তাদের মল নষ্ট হয়ে যায় তেমন প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ ভস্মীভূত হয় ॥৯॥

অতএব সন্ন্যাসীগণ প্রতিদিন প্রাণায়াম দ্বারা আত্মা - অন্তকরণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ জীবের হর্ষ, শাোক এবং অবিদ্যাদি দোষ ভস্মীভূত করবেন ॥১০।।

এই ধ্যানযোগ দ্বারা অযোগী, অবিদ্বানদের পক্ষে দুর্জেয়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পদার্থে পরমাত্মার যে ব্যপ্তি এবং নিজ আত্মা অন্তর্যামী পরমাত্মার যে গতি তা দর্শন করবেন ।।১১।।

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীই প্রাণীদের প্রতি নির্বৈর ভাব, ইন্দ্রিয় বিষয় বর্জন, বেদোক্ত কর্ম এবং অত্যুগ্র তপশ্চর্যা দ্বারা সংসারে মাোক্ষপদ লাভ করতে ও করাতে পারেন, অন্য কেউ পারে না ।।১২॥

যখন সন্ন্যাসী সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থে নিস্পৃহ= নিরাকাঙ্খী এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য আচরণে পবিত্র থাকেন তখনই তিনি এই দেহে ও মরণান্তে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন ।।১৩॥

এজন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী যত্ন সহকারে দশ লক্ষণান্বিত ধর্ম পালন করবেন ।।১৪॥

দশ লক্ষণ বিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম পালন চার আশ্রমবাসীরই কর্তব্য। এই বেদোক্ত ধর্মানুসারে স্বয়ং চলা এবং অপরকেও বুঝিয়ে চালিত করা সন্ন্যাসীদের বিশেষ ধর্ম ॥১৫॥

সন্ন্যাসী এভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত সঙ্গদোষ পরিত্যাগ করে এবং হর্ষ-শাোকাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত হয়ে ব্রহ্মেই অবস্থিত হন। গৃহস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমীকে সর্বপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য নিশ্চয় করা এবং অধর্মাচরণ হতে নিবৃত্ত ও সকল সংশয় ছিন্ন করে সত্য ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করা সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্তব্য ।।১৬॥

প্রশ্ন- গৃহস্থও তো অধ্যাপন ও উপদেশ প্রদান করে থাকে, তবে সন্ন্যাসীর কী দরকার ?

উত্তর- সকল আশ্রমবাসীই সত্যোপদেশ দান করবে এবং শুনবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর যতঅবকাশ এবং পক্ষপাতশূন্যতা থাকে গৃহস্থের তত থাকে না। অবশ্য যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের মধ্যে পুরুষরা পুরুষদের এবং স্ত্রীরা স্ত্রীদের সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান করবে। সন্ন্যাসী ভ্রমণের অবকাশ যত পায় তত অবকাশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কখনো পায় না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করলে সন্ন্যাসী তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব সন্ন্যাসী হওয়া উচিত।

প্রশ্ন- সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য সাধু, বৈরাগী, গোঁসাই, খাখী প্রভৃতি সন্ন্যাস আশ্রমে পরিগণিত হবে কিনা?

উত্তর- না, কারণ তাদের মধ্যে সন্ন্যাসের একটি লক্ষণও নেই। তারা বেদবিরুদ্ধ পথে চলে আর বেদ থেকে নিজেদের সম্প্রদায়ের আচার্যদের বাক্যকেই বেশী মানে এবং তারা নিজ নিজ মতেরই প্রশংসা করে। মিথ্যা প্রপঞ্চে আবদ্ধ হয়ে স্বার্থের জন্য অপরকেও স্ব স্ব মতে আবদ্ধ করে। সংশোধনের কথা তো দূরে থাকুক, তার পরিবর্তে তারা সংসারকে বিভ্রান্ত করে অধোগতি লাভ করায় ও স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। একারণে এদের সন্ন্যাসাশ্রমে গণ্য করা যেতে পারে না। কিন্তু এরা যে পুরোদস্তুর স্বার্থাশ্রয়ী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এজন্য বিদ্যাভ্যাস, সুশিক্ষা গ্রহণ এবং বলবান হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম; সর্ববিধ সদানুষ্ঠানের জন্য গৃহস্থাশ্রম; বিচার, ধ্যান ও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থাশ্রম এবং বেদাদি সত্যাশাস্ত্রের প্রচার, ধর্মাচরণ গ্রহণ ও দুষ্ট ব্যবহার বর্জন, সত্যোপদেশ প্রদান ও সকলের সংশয় দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম। কিন্তু যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের মুখ্য কর্ম সত্যেপদেশ দান প্রভৃতি করেন না, তারা পতিত ও নরকগামী হন। তাই সত্যোপদেশ দান, সংশয় নিরাকরণ, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যাপন এবং যত্নপূর্বক বেদোক্ত ধর্মপ্রচার দ্বারা জগতের উন্নতি সাধন করা সন্ন্যাসীর কর্তব্য।

হে সন্ন্যাসী, আপনি স্বয়ং ধর্মপথে চলুন ও সমস্ত সংসারকে চালিত করুন যাতে আপনি নিজে এবং সর্ব জগৎ ইহলোক অর্থাৎ বর্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করুন।

সন্দর্ভ:

১। সংস্কারবিধি - ভগবৎপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী

২। সত্যার্থ প্রকাশ - ভগবৎপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে বানপ্রস্থ আশ্রমের কথা কোথায় আছে ?

বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশের সময় সাধারণত পঞ্চাশ বছরের পর, যখন সন্তানের সন্তান হয়ে যায় [মনুস্মৃতি ৬।১-৩, ২৭-২৯]। গৃহস্থাশ্রম উপভোগের পর প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে নিজের মানসিক ও আত্মিক শক্তি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা, গুরুকুলে থেকে পড়ানো এবং অপরের সেবা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত [অথর্ববেদ ১৯।৫।১, ১৯।৪১।১, ১৯।৪০।৩]। ঈশ্বর–ভক্তি, ধ্যান–যোগ এবং বেদাদি শাস্ত্রের মননে নিজের সময়কে বিশেষ রূপে লাগানোই এই সময়ের মূল প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি এইসময়ে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি ধারণ করা উচিত। নিজের জ্ঞান ও অনুভব দ্বারা অপরকে যথাশক্তি লাভ পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। যদি আগের দিনের মতো সকলে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বানপ্রস্থী হওয়ার নিয়ম মেনে নেয়, তাহলে গুরুকুল এবং উত্তম অপর সংস্থা চালোনো সহজ হবে। আজকালকার মতো বিদ্বান, অনুভব, ত্যাগী কার্যকর্তার অভাব এই সংস্থায় অনুভব হবে না। এভাবে শিক্ষা, সমাজের কাজ ভালোভাবে এবং সহজে চলতে থাকবে।

আসুন এবার বানপ্রস্থ আশ্রম বিষয়ে বেদ কী বলে জেনে নেই -

ব্রতেন॑ দী॒ক্ষামা॑প্নোতি দী॒ক্ষয়া॑প্নোতি॒ দক্ষি॑ণাম্। দক্ষি॑ণা শ্র॒দ্ধামা॑প্নোতি শ্র॒দ্ধয়া॑ স॒ত্যমা॑প্যতে॥১॥ [যজুর্বেদ ১৯। ৩০]

অর্থঃ যখন মানুষ ব্রহ্মচর্যাদি তথা সত্যভাষণাদি ব্রত, অর্থাৎ নিয়ম ধারণ করে, তখন সেই (ব্রতেন) ব্রতের দ্বারা উত্তম প্রতিষ্ঠারূপ (দীক্ষাম্) দীক্ষা (আপ্নোতি) লাভ করে। (দীক্ষয়া) ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমসমূহের নিয়ম পালন করে (দক্ষিণাম্) সসম্মানে

ধন ইত্যাদি (আপ্নোতি) লাভ করে। (দক্ষিণা) সেই সম্মান হতে (শ্রদ্ধাম্) সত্যধারণে প্রীতি (আপ্নোতি) লাভ করে এবং (শ্রদ্ধয়া) সত্যধার্মিক জনগণের সাথে প্রীতি দ্বারা (সত্যম্) মানুষের সত্যবিজ্ঞান বা সত্য পদার্থ (আপ্যতে) অর্জিত হয়, এইজন্য শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মচর্য ও গৃহাশ্রমের অনুষ্ঠান করে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ॥১॥

অ॒ভ্যা॑দ॑ধামি স॒মিধ॒মগ্নে॑ ব্রতপতে॒ ত্বয়ি॑। ব্র॒তং॑চ॑ শ্র॒দ্ধাং চো॑পৈ॑মী॒ন্ধে ত্বা॑ দীক্ষি॒তোঽ অ॒হম্॥২॥
[যজুর্বেদ ২০। ২৪]

অর্থঃ হে (ব্রতপতে অগ্নে) নিয়মপালকেশ্বর! (দীক্ষিতঃ) দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে (অহম্) আমি (ত্বয়ি) তোমাতে স্থির হয়ে (ব্রতম্) ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম ধারণ (চ) এবং এর সামগ্রী, (শ্রদ্ধাম্) সত্য ধারণা (চ) এবং তার উপায় (উপৈমি) প্রাপ্ত হই। এজন্য অগ্নিতে যেরূপ (সমিধম্) সমিধা (অভ্যাদধামি) ধারণ করি, সেরূপই বিদ্যা ও ব্রত ধারণ করে প্রজ্বলিত করি এবং সেরূপই (ত্বা) তোমাকে নিজের আত্মায় ধারণ করে সর্বদা (ঈন্ধে) প্রকাশিত করি। ॥২॥

আ ন॑য়ৈ॒তমা র॑ভস্ব সু॒কৃতাং॑ লো॒কমপি॑ গচ্ছতু প্রজা॒নন্। তী॒র্ত্বা তমাং॑সি ব॒হুধা ম॒হান্ত্য॒জো নাক॒মা ক্র॑মতাং তৃতীয়॑ম্ ॥৩॥
[অথর্ববেদ ৯। ৫। ১]

অর্থঃ হে গৃহস্থ! (প্রজানন্) প্রকৃষ্টরূপে জেনে তুমি (এতম্) এই বানপ্রস্থাশ্রম (আরভস্ব) আরম্ভ করো। (আনয়) তোমার নিজের মনকে গৃহাশ্রম থেকে এদিকে নিয়ে এসো। (সুকৃতাম্) পুণ্যাত্মাগণের (লোকমপি) দর্শনীয় বানপ্রস্থাশ্রমকেও (গচ্ছতু) প্রাপ্ত হও। (বহুধা) বিবিধ প্রকারের (মহান্তি) অতি গভীর (তমাংসি) অজ্ঞানতা, দুঃখ প্রভৃতি সাংসারিক মোহ হতে (তীর্ত্বা) উত্তীর্ণ হয়ে, অর্থাৎ তা থেকে পৃথক্ হয়ে (অজঃ) নিজের আত্মাকে অজর অমর জেনে (তৃতীয়ম্) তৃতীয় (নাকম্) দুঃখ রহিত বানপ্রস্থাশ্রমে (আক্রমতাম্) যথারীতি আরূঢ় হও। ॥৩॥

ভ॒দ্রমি॒চ্ছন্ত॒ ঋষ॑য়ঃ স্বর্বি॒দস্তপো॑ দী॒ক্ষামু॑প॒নিষে॑দু॒রগ্রে॑। ততো॑ রা॒ষ্ট্রং বল॒মোজ॑শ্চ জা॒তং তদ॑স্মৈ দে॒বা উ॑প॒সং॑নমন্তু ॥৪॥
[অথর্ববেদ ১৯। ৪১। ১]

অর্থঃ যে বিদ্বান্ মনুষ্যগণ! যেরূপ (স্বর্বিদঃ) সুখগ্রাহী (ঋষয়ঃ) বিদ্বানেরা (অগ্নে) প্রথমে (দীক্ষাম্) ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের দীক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করে (তপঃ) প্রাণায়াম ও বিদ্যাধ্যয়ন, জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি শুভ লক্ষণ (উপনিষেদঃ) প্রাপ্ত হয়ে তার অনুষ্ঠান করেন, সেরূপ এই (ভদ্রম্) কল্যাণকর বানপ্রস্থাশ্রম [প্রাপ্তির] (ইচ্ছন্তঃ) ইচ্ছা করো। যেরূপ রাজকুমার ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করে (ততঃ) তারপর (ওজঃ) পরাক্রম (চ) এবং (বলম্) বল প্রাপ্ত হয়ে (জাতম্) প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে (রাষ্ট্রম্) রাজ্যের ইচ্ছা ও রক্ষা করেন এবং (অস্মৈ) ন্যায়কারী ধার্মিক বিদ্বান্ রাজাকে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা নমস্কার করেন, (তৎ) সেরূপ সকলে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট তোমাকে (উপ সং নমন্তু) নিকটে পেয়ে নম্র হোক। ॥৪॥

মা নো॑ মে॒ধাং মা নো॑ দী॒ক্ষাং মা নো॑ হিংসিষ্ট যত্তপঃ॑। শি॒বা নঃ॒ শং স॒ন্ত্বায়ু॑ষে শি॒বা ভ॑বন্তু মা॒তরঃ॑ ॥ ৫।।
[অথর্ববেদ ১৯। ৪০। ৩]

অর্থঃ হে আত্মীয়গণ! (নঃ) বানপ্রস্থাশ্রমস্থ আমাদের (মেধাম্) প্রজ্ঞাকে (মা হিংসিষ্ট) নষ্ট কোরো না। (নঃ) আমাদের (দীক্ষাম্) দীক্ষা (মা) নষ্ট কোরো না এবং (নঃ) আমাদের (য়ৎ) যে (তপঃ) প্রাণায়ামাদি উত্তম তপ তাকেও তোমরা (মা) নষ্ট করো না। (নঃ) আমাদের দীক্ষা এবং (আয়ুষে) জীবনের জন্য সকল প্রজা (শিবাঃ) কল্যাণকারিণী (সন্তু) হোক। যেভাবে

আমাদের (মাতরঃ) মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতি (শিবাঃ) কল্যাণকারিণী হয়ে থাকেন, সেরূপ সকলে প্রসন্ন হয়ে আমাকে বানপ্রস্থাশ্রমের অনুমতিদাতা (ভবন্তু) হও। ॥৫॥

মানুষের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত করে গৃহস্থ, গৃহস্থ থেকে বানপ্রস্থী এবং বানপ্রস্থ সমাপ্ত করে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত । ক্রমান্বয়ে এটিই আশ্রম বিধান। মহর্ষি মনু বলেছেন -

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১॥
গৃহস্থস্তু যাদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥২॥
সংত্যজ্য গ্রাম্যমাহারাং সর্বং চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥৩॥
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৪॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্বকম ॥৫॥ মনু০ [৬।১-৫]

এভাবে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যপূর্বক গৃহাশ্রমের কর্তা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহাশ্রমে অবস্থান করে নিশ্চিতাত্মা হয়ে যথাবৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করে বনে বাস করবে॥ ১॥

কিন্তু গৃহস্থের যখন মাথার কেশ শ্বেত হবে ও ত্বক শিথিল হবে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র হবে, তখন গৃহী বনে গিয়ে বাস করবে॥২॥

যাবতীয় গ্রাম্য আহার্য, বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে স্ত্রীকে পুত্রদের কাছে রেখে অথবা নিজের সঙ্গে নিয়ে বনে বাস করবে ।।৩।।

সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র সহকারে গ্রাম থেকে বের হবে এবং দৃঢ়েন্দ্রিয় হয়ে অরণ্যে বাস করবে॥৪॥

নীবারাদি নানাবিধ অন্ন, সুন্দর শাক, মূল, ফল, কন্দাদি দ্বারা পূর্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে এবং তার মাধ্যমে অতিথি সেবা ও নিজের জীবন নির্বাহ করবে ।।৫।।

স্বাধ্যয়ে নিত্যযুক্ত স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ॥১॥
অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বনমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥২॥ মনু০ [৬।৮,২৬]

স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিত্য যুক্ত, জিতাত্মা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়-দমনশীল, বিদ্যাদি দাতা এবং সকলের প্রতি দয়ালু হবে, কারো কাছে থেকে কিছু গ্রহণ করবে না, সর্বদা এমন আচরণ করবে ॥১॥

শারীরিক সুখের জন্য অত্যধিক চেষ্টা করবে না, ব্রহ্মচারী থাকবে অর্থাৎ নিজ স্ত্রী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাথে বিষয়ভোগের চেষ্টা করবে না। ভূমিতে শয়ন করবে। নিজের আশ্রিত ও নিজ সামগ্রীর উপর মমতা করবে না, বৃক্ষমূলে বাস করবে ॥২॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১॥ মুণ্ডক০ ১।খ০ ২।ম০ ১১

যেসকল শান্ত, বিদ্বান্ বানপ্রস্থাশ্রমবাসী তপস্যা, ধর্মানুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা এবং ভিক্ষাচরণ সহকারে বনে বাস করেন, তাঁরা যেস্থানে অবিনাশী, হানি-লাভ রহিত, পূর্ণ পুরুষ পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নির্মলচিত্ত হয়ে প্রাণদ্বার দিয়ে সেই পরমাত্মাকে লাভ করে আনন্দিত হন॥১॥

অভ্যা দধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।

ব্রতং চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম ॥১॥ যর্জুবেদে, অধ্যায় ২০ ম০ ২৪॥

বানপ্রস্থের কর্তব্য - 'আমি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠানপূর্বক দীক্ষিত হয়ে ব্রত, সত্যাচরণ ও শ্রদ্ধাশীলতা লাভ করবো'- এই অভিলাষী হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবে। নানাবিধ তপশ্চর্যা, সৎসঙ্গ, যাোগাভ্যাস এবং সুবিচার দ্বারা জ্ঞান ও পবিত্রতা লাভ করবে।।১।।

পরে যখন সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হবে তখন স্ত্রীকে পুত্রদের কাছে পাঠাবে তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।

সন্দর্ভ:

১। সংস্কারবিধি - ভগবৎপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী

২। সত্যার্থ প্রকাশ - ভগবৎপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

কুন্তাপ সূক্ত - প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা প্রসঙ্গ

অথর্ববেদের ২০তম কাণ্ডের ১২৭ থেকে ১৩৬ সূক্ত পর্যন্ত ১০টি সূক্তকে বলা হয়ে থাকে কুন্তাপ সূক্ত। কুন্তাপ সূক্তে ১৪৭টি (১৪+১৬+২০+২০+২০+১৬+৬+৬+১৩+১৬) মন্ত্র রয়েছে। কুন্তাপসূক্তের উল্লেখ ও বিনিয়োগ শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১২.১৩৭, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ৩০.৫, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৮.৩.৭, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.৩০.৬-১০, বৈতান শ্রৌতসূত্র ৬.২.১৬, গোপথ ব্রাহ্মণ ২.৬.১২ ইত্যাদিতে বিদ্যমান। সেখানে এই সূক্তকে কুন্তাপ সূক্ত হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই কুন্তাপ সূক্তের প্রাচীনতা শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১২৭ -১২৮ সূক্তের মন্ত্র নারাশংসী, রৈভী, পারিক্ষিতী, কারব্যা, দিশাংকৃপ্তী, জনকল্পা, ইন্দ্রগাথা নামে সংজ্ঞায়িত। এরপরে ১২৯-১৩২ ঐতেশপ্রলাপ, ১৩৩ প্রবহ্লিকা, ১৩৪ আজিজ্ঞাসেন্যা, ১৩৫ প্রতিরাধ, অতিবাদ, ভূতচ্ছেদ্, ১৩৬ দেবনীথ, আহনস্য। সর্বমোট এই ১৪৭টি মন্ত্র মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস নামকরণ করেছেন।

কুন্তাপ সূক্তের নাম 'কুন্তাপ' কেন এই প্রশ্ন পাঠকের মনে হতেই পারে। আসুন আমরা 'কুন্তাপ' শব্দটির শাস্ত্রীয় নির্বচন দেখি -

১। কু = কুৎসিতমাত্রং (পাপ-তাপ-দুরিত-দুর্গুণাদিকং) তাপয়ন্তি দহন্তি ইতি কুন্তাপানি, তথাবিধানি সূক্তানি - কুন্তাপসূক্তানি । কর্মণ্যুপপদস্য তপ-ধাতোঃ 'অণ্', মুমাগমশ্ছান্দসঃ ।

অথবা,

২। কুম্-পৃথিবীং পার্থিববিকারান্ (পাপ-তাপ-দুঃখ-দোষ- দুরিতাদিকান্) তাপয়ন্তি দহন্তি ইতি কুন্তাপানি । কুন্তাপানি চ তানি সূক্তানি (মন্ত্রসমুদায়াঃ) চেতি 'কুন্তাপ-সূক্তানি' ।

অথবা,

৩। কুয়ং হ নাম কুৎসিতং ভবতি, তদ্যৎ তপতি তস্মাৎ কুন্তাপাঃ, তৎ কুন্তাপানাং কুন্তাপত্বম্ । তপ্যন্তেঽস্মৈ কুয়ানিতি, তপ্তকুয়ঃ স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" (গোপ.ব্রা. ২/৬/১২) । 'তপ' ধাতোঃ কর্মণ্যুপপদে 'অণ্' কুয়শব্দস্য ছান্দসে যলোপে মুমাগমে 'কুন্তাপঃ'।

গোপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী 'কুয়' অর্থ কুৎসিত, নিন্দিত, পাপাদি। কিংবা কু দ্বারা কেবল কুৎসিত পাপ-দুর্গুণাদি বা কুম্ দ্বারা পার্থিব - এই সকলকে যে মন্ত্রসমূহ 'তাপ' অর্থাৎ সন্তাপিত করে, দূর করে, ভস্মীভূত করে সেগুলোকেই কুন্তাপ বলে। সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সকলেই কুন্তাপসূক্তকে মূল সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই বিবেচনা করে । বেদভাষ্যকারদের মধ্যে আচার্য জয়দেব শর্মা মীমাংসালঙ্কার, পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদী, পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালঙ্কার তাঁদের অথর্ববেদ ভাষ্যানুবাদে কুন্তাপসূক্ত মূল সংহিতা অন্তর্গতরূপে স্বীকার করেছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী ও পণ্ডিত জগন্নাথ বেদালঙ্কার কুন্তাপসূক্তের সংস্কৃতভাষ্যও রচনা করেছেন ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'চতুর্বেদ-বিষয়-সূচী অনুযায়ী অনেকেই কুন্তাপসূক্তকে সংহিতার অন্তর্গত নন বলতে চান। লক্ষ্যণীয়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর নির্বাণ পরবর্তী গ্রন্থসমূহ দুই প্রকার - প্রথমত যেগুলো মহর্ষি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ও পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি এবং দ্বিতীয়ত মহর্ষি প্রণীত খসড়া বা কিছু লেখা যা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিলো না বা পরিত্যক্ত হয়েছিলো কিন্তু তার স্মৃতি ও কৃতি হিসেবে প্রকাশ হয়েছে। চতুর্বেদ-বিষয়-সূচী দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক এই গ্রন্থের সম্পাদনার ভূমিকায় বলেছেন, ' বেদভাষ্যবিধানকালেঽত্র নির্দিষ্টেষু বিষয়েষু ক্বচিৎ পরিবর্তনে সংশোধনে চ কৃতে '

অর্থাৎ বেদমন্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মহর্ষির সিদ্ধান্ত ভাষ্যরচনাকালে পৃথক দেখা যায়। সুতরাং আমরা এটা নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি মহর্ষি খসড়া রূপে প্রারম্ভিক সময়ে এই সূচি তৈরি করলেও তা চূড়ান্ত হিসেবে কখনোই মানেননি এবং না একে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোন পরিকল্পনা কোথাও দৃষ্ট হয়। যেমন গ্রন্থে মহানাম্নী আর্চিকের বিষয়নিরূপণ অনুপস্থিত তাই বলে এটিও কি বেদের বাইরে থাকবে? তাই শুধু একটি দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে কুন্তাপসুক্ত বেদান্তর্গত নয় এই সিদ্ধান্তে আসা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বৈদিক আস্তিক্যবাদের ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত। পণ্ডিত বিশ্বনাথ বেদালঙ্কার এজন্যই আলোচনা করেও সম্পূর্ণ কুন্তাপ সূক্তেরই উপাদেয় আধ্যাত্মিক ভাষ্য রচনা করেছেন। রাজারাম শাস্ত্রী ও পণ্ডিত সাতবলেকর স্বীয় জ্ঞান দৌর্বল্যে যথাক্রমে ১৩৩,১৩৬ ও ১৩৫-১৩৬ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। প্রফেসর রোথ, হিটনী, গ্রিফিট ইত্যাদি পাশ্চাত্য অনুবাদক নিরর্থক, অশ্লীল(?) ও অসম্বন্ধপ্রলাপমাত্র বলেছে যা সুধী প্রাজ্ঞজনের উপেক্ষণীয়। স্বামী হরিপ্রসাদ বৈদিক মুনি ও তার উপর ভিত্তি করে পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মার সিদ্ধান্তের খণ্ডন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি 'বেদমর্যাদা', মহাত্মা নারায়ণ স্বামী 'বেদরহস্য' এবং পণ্ডিত ব্রহ্মমুনি বিদ্যামার্তণ্ড 'অথর্ববেদ-মুনিভাষ্য-ভূমিকাভাগ' ইত্যাদি গ্রন্থে খণ্ডন করেছেন। কুন্তাপসূক্ত সম্পর্কে ৩টি ধারণা বিদ্যমান - দুরূহ, অস্পষ্ট ও প্রক্ষিপ্ত । দুরূহ ও অস্পষ্টতা বিষয়ে অধিকতর পাশ্চাত্য ও কতিপয় প্রাচ্য বিদ্বানদের যে মতামত তা ভিত্তিহীন এবং তাদের আর্ষগ্রন্থে অনভিজ্ঞতাই মূল কারণ। বেদব্যাখ্যাতার জন্য আর্ষগ্রন্থের স্বাধ্যায়, শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ও যোগাভ্যাস অত্যাবশ্যক। প্রক্ষিপ্ত বলার পূর্ব কিছু কারণ আমরা ইতোমধ্যে খণ্ডন করে এসেছি। অনেকেই সায়ণাচার্য পদপাঠ করেননি এজন্য একে প্রক্ষিপ্ত দায়ী করেন। এই দাবি অমূলক কেননা সায়ণাচার্য অঘমর্ষণ সূক্তের (ঋ০ ১০।১৯০) পদপাঠ প্রদান করেননি, অথচ বৈদিকদের সন্ধ্যার নিত্যপাঠ্য মন্ত্রসমুদায়ে এটি বিদ্যমান। তাতে কী এই সূক্ত প্রক্ষিপ্ত ঘোষিত হবে? কতিপয় পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি ১৯ বা ২০ কাণ্ড সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করেন, তাই বলে কি আমাদের শাস্ত্রীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করে ব্যক্তিমত গ্রহণ করতে হবে? আবার ঋগ্বেদীয় খিল হিসেবে প্রসিদ্ধ বালখিল্য সূক্ত খিল হিসেবে সম্পাদকগণ পরিশিষ্টে ভ্রান্তিপূর্বকস্থান দিলেও সেটিও প্রামাণিক ও মূল সংহিতার অন্তর্গত। কিন্তু

অথর্ববেদে এই ভ্রান্তিরও ন্যূনতম অবকাশ নেই কেননা, কুন্তাপ সূক্ত অথর্ববেদের সংহিতাপাঠের অন্তর্ভুক্তই, পাশাপাশি এরপরে সর্বমান্য ও অবিসংবাদিত আরো ৭টি সূক্ত (২০.১৩৭-১৪৩) বিদ্যমান। তাই এই সূক্ত প্রক্ষিপ্ত নয় তা প্রমাণিত।
কুন্তাপসূক্তের বিষয়বস্তু কী কী ?
সূক্ত ১২৭ উপাসক, রাজার মহত্ত্ব ও কর্তব্য, ত্রিতাপ দুঃখনিবারণ বর্ণনা করে। সূক্ত ১২৮ জ্ঞানী, নীচ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ব্যক্তি, পরমাত্মার সখ্যতা বর্ণনা করে। সূক্ত ১২৯-১৩২ অধ্যাত্ম জ্ঞান ও ত্রৈতসিদ্ধান্ত, ১৩০ জীবাত্মা বিজ্ঞান, ১৩১ সাংসারিক বিষয়ত্যাগ, ১৩২ যোগ ও বৈরাগ্য, ১৩৩ রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির পরিত্যাগে পরমেশ্বর ও জীবাত্মার ভূমিকা, ১৩৪ সর্বত্র দুর্গুণ পরিত্যাগ, ১৩৫ কূট অর্থাৎ গভীর প্রতীকাত্মক তত্ত্ব এবং ১৩৬ সাধ্বী, বিদুষী স্ত্রী ও তার বিপরীত স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।
বাংলাদেশ অগ্নিবীর

জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ বা অণু পরিমাণ বলতে কী বোঝায় ?

প্রশ্নঃ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ বা অণু পরিমাণ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তরঃ জীবাত্মা আসলে কেমন ? এটি কি সর্বব্যাপক ? ঋষি জীবাত্মার সূক্ষ্মতার স্পষ্টিকরণের জন্য উদাহরণ দিয়ে বলেছেন -

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহংকারসমন্বিতো য়ঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫.৮
পদার্থঃ (য়ঃ) যিনি [জীবাত্মা] (অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ) অঙ্গুষ্ঠমাত্র (সংকল্প অহংকার সমন্বিতঃ) সংকল্প এবং অহংকারযুক্ত (রবিতুল্যরূপঃ) সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ (আরাগ্রমাত্রঃ) সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম (অপি) এবং (অপরঃ) অপর [পরমাত্মা থেকে ভিন্ন] (বুদ্ধেঃ) বুদ্ধির (গুণেন) উৎকৃষ্ট গুণ [জ্ঞান] (চ) এবং (আত্মগুণেন) আত্মগুণ [চেতনা] (এব হি) দ্বারাই (দৃষ্টঃ) তিনি দৃষ্ট হন।
সরলার্থঃ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র, সংকল্প এবং অহংকারযুক্ত, সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ। তিনি সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন। বুদ্ধির উৎকৃষ্ট গুণ (জ্ঞান) এবং আত্মগুণ (চেতনা) দ্বারাই তাঁকে (জীবাত্মাকে) জানা যায়।
এই শ্রুতিতে জীবাত্মার স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলার অভিপ্রায় এই নয় যে, তিনি আঙ্গুলের ন্যায়! অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়পুরীতে অবস্থান করেন বলেই জীবাত্মাকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বলা হয়েছে। এই কারণে পুনরায় বলা হয়েছে, তিনি 'আরাগ্রমাত্র' অর্থাৎ সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আত্মার এই সূক্ষ্মতাকে কোনো জড় বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়। শুধু বোঝানোর সুবিধার্থে এই লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হয়েছে। জীবাত্মা সংকল্প (Determined will) এবং অহংকার (Ego) সমন্বিত, তিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জড় শরীরে চেতনা প্রদানকারী। যেরূপ সূর্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ জীবাত্মা স্বীয় চেতন-ধর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ দেহকে প্রকাশিত করেন। নিজের গুণানুসারে তিনি 'অপর' অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। বুদ্ধির উৎকৃষ্ট গুণ (জ্ঞান) ও আত্মগুণ (চেতনা) দ্বারাই, নিজের আত্মাকে সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ জানতে পারেন। এই বিষয়ে গীতায় (১৫।১০) বলা হয়েছে, "দেহ ত্যাগের সময় অথবা দেহে অবস্থানপূর্বক বিষয়-ভোগকালে

বা প্রকৃতির গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রূপে এই জীবকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাকে দর্শন করেন"।

এরপর ঋষি বলছেন -

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫.৯

পদার্থঃ (বালাগ্রশতভাগস্য) একটি কেশের অগ্রভাগের শতভাগকে (চ) পুনরায় [তার একটি ভাগকে] (শতধা) শতভাগ রূপে (কল্পিতস্য) কল্পনা করলে (ভাগঃ) যে সূক্ষ্ম এক ভাগ হয় (জীবঃ) জীবাত্মাকে (সঃ) সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম বলে (বিজ্ঞেয়ঃ) জানবে (চ) এবং (সঃ) তিনি (আনন্ত্যায়) পরমপদ [মোক্ষ] লাভের জন্য (কল্পতে) সমর্থ, যোগ্য॥৯॥

সরলার্থঃ একটি কেশের অগ্রভাগের শতভাগকে পুনরায় তার একটি ভাগকে শতভাগ রূপে কল্পনা করলে যে সূক্ষ্ম এক ভাগ হয়, জীবাত্মাকে সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম বলে জানবে এবং তিনি পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্তির যোগ্য॥৯॥

এই শ্রুতিতে জীবাত্মার অতি সূক্ষ্মতার নিরূপণ করে বলা হয়েছে— একটি কেশের অগ্রভাগকে দশ হাজার ভাগ করলে, তার একভাগ যে পরিমাণ সূক্ষ্ম হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম। ত্রস-রেণুর তুল্য পরিমাণ কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার টুকরো করা সম্ভব নয়। এজন্য এখানে শব্দার্থের প্রধানতা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নয়, বরং বাক্যের মুখ্য আশয় গ্রহণই অভীষ্ট। জীবাত্মা এতটা সূক্ষ্ম হয়েও অনন্ত সামর্থ্য বা পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্তির জন্য সমর্থ॥৯॥

বেদশাস্ত্রে জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হয়েছে, যথা— "বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নেব দৃশ্যতে। ততঃ পরিষ্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া॥ (অথর্ব০ ১০।৮।২৫)" অর্থাৎ জীবাত্মা কেশ থেকেও সূক্ষ্মতর অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। প্রকৃতিও দৃষ্টির অগোচর হওয়ার কারণে অব্যক্ত হয়ে আছে। জীবাত্মা ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে এদেরকে আলিঙ্গনকারী দেবতা হলেন পরমাত্মা; তিনিই আমার প্রীতির কারণ হন।

উপর্যুক্ত শ্রুতি পাঠের পর স্বভাবতই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, জীবাত্মা সাকার না কি নিরাকার? জীবাত্মার স্বরূপ বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন— "ঈশ্বরের উপাসনার্থে ভক্তদের পক্ষে তাঁর কোনো না কোনো প্রকারের আকার হওয়া উচিত, এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ বলাও যথার্থ নয়। কারণ এই যে, শরীরে যে জীব রয়েছেন, তিনিও আকার-রহিত— এরূপ সকলে স্বীকার করেন। আকার না থাকলেও আমরা একে অপরকে চিনতে পারি এবং মানুষ প্রত্যক্ষ রূপে কখনো কাউকে না দেখলেও কেবল গুণানুবাদ দ্বারাই [অদৃষ্ট] ব্যক্তির সম্বন্ধে সদ্ভাবনা ও পূজ্যবুদ্ধি পোষণ করে। এই ভাবের কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটেনা, এ কথা বলাও সঠিক নয়।" ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে পঞ্চাবয়ব দ্বারাও এই বিষয় প্রস্তুত করা যেতে পারে—

প্রতিজ্ঞা— আত্মা নিরাকার।

হেতু— চেতন হওয়ার কারণে।

উদাহরণ— যেমন, ঈশ্বর।

উপনয়— ঈশ্বর নিরাকার এবং চেতন, তদ্রূপ জীবও চেতন হওয়ার কারণে নিরাকার।

নিগমন— ঈশ্বরের ন্যায় চেতন হওয়ার কারণে জীবও নিরাকার।

এখন এই বিষয়কে শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বিচার করা যাক। যোগদর্শনের সূত্র অনুসারে— "ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোগ০ ২।১৮) যা কিছু দৃশ্য (প্রকৃতির বিকার বা কার্য), তা আত্মার ভোগ এবং অপবর্গের (মোক্ষের) সিদ্ধির জন্য। এজন্য ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা কখনো দৃশ্য হতে পারে না, নতুবা তিনি ভোগ্য হয়ে যাবেন। দৃশ্য মাত্র সাকারই হয়ে থাকে, অতএব আত্মা

সাকার নয়। যোগদর্শনে বলা আছে, "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ" (যোগ০ ২।২০) অর্থাৎ দ্রষ্টা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বথা শুদ্ধ (নির্বিকার)। এ বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশের দ্বাদশ সমুল্লাসে লিখেছেন— "দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকে, কখনো দৃশ্য হয় না। যদি দ্রষ্টা ও ভোক্তা জীবাত্মাকে সাকার মানা হয়, তাহলে তিনি দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং ভোগ্য হয়ে যাবেন"।
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী ?

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জীর অমর গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ' রচনা, মানুষ জাতি কিভাবে কষ্ট থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করে, শত বর্ষ পর্যন্ত সুখী জীবনযাপন করতে পারে? এই বিষয়ে ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

যে মানুষ আপন জীবনকালে এই অমর গ্রন্থ পাঠ করবেন সত্যের সাথে তার সাক্ষাৎকার হবে এবং অসংখ্য ভণ্ডের ভণ্ডামি থেকে মুক্ত হয়ে নিজ জীবন সুখময় করে তুলতে পারবেন। কখনোই কোন নতুন মত বা সম্প্রদায় চালানো তাঁর (স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) অভিপ্রায় ছিলো না, তিনি আজীবন বেদাদি সত্যশাস্ত্র, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে জৈমিনিমুনি পর্যন্ত ঈশ্বরাদি পদার্থকেই মেনেছেন। যে সৃষ্টির পূর্বে ছিলো, আজও আছে, প্রলয় বা অন্ত পর্যন্ত থাকবে, যাঁর কখনো অভাব হয়না, সে-ই কেবল সত্য। যাঁকে সকল আপ্ত পুরুষ অর্থাৎ যার কথা ও কাজ সত্যের ওপর ভিত্তি করে, যাঁকে পক্ষপাত ছাড়াই সব বিদ্বান ব্যক্তি তিন কালেই এক হিসেবে মানেন, বেদানুকূল হওয়ার কারণে তাঁকে সনাতন বলা হয়। মানুষ তাকেই বলে, যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা দ্বারা অপরের সুখ- দুঃখ, লাভ-ক্ষতি বুঝতে পারে। অন্যায়কারী যতই বলবান হোক না কেন তাকে ভয় পায় না, ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস রেখে অন্য প্রাণিকেও যত্ন করে, এবং ব্যক্তি যতই দুর্বল হোক না কেন ধর্ম পথে চলা ন্যায়কারী ব্যক্তিকে সদা সম্মান করে।

ঈশ্বর বা পরমেশ্বর কি? এই প্রশ্ন সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে জানার জন্য সবচেয়ে কম প্রয়াস করে থাকি। এবং ভণ্ড ধূর্ত লোকদের কথাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা পথভ্রষ্ট হই। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সদা সত্য হওয়ায়, এটি খোলামেলা আলোচনার বিষয়।

ঈশ্বর বহু পবিত্র গুণ-কর্ম ও স্বভাববিশিষ্ট, নিরাকার, সর্বব্যাপক, অজন্মা, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ন্যায়কারী, সকল সৃষ্টির কর্তা-ধর্তা, এবং সৎ চিৎ আনন্দযুক্ত। তাঁর দ্বারা নির্ধারিত কর্মফল ব্যবস্থা, তাঁর অনুশাসন থেকে, এর স্বয়ংক্রিয় সুপার কম্পিটারাইজড ব্যবস্থা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সব শক্তি এক হয়েও একে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই তিনি কখনো অন্যায় করেন না, তাঁর কোন কিছুরই ভয় নেই। এইজন্যই তিনি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি যাকে মানুষ বলা হয়, তাকে তার বুদ্ধি দিয়ে পাপ-পূণ্য কর্ম করার জন্য স্বতন্ত্র করে ছেড়ে দিয়েছেন।

যখনই কোন মানুষ পাপ বা পূণ্য কর্ম করার জন্য চিন্তা করে, তখন থেকে শুরু করে কর্ম পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেই দয়ালু ঈশ্বর তাঁর পক্ষ থেকে সাবধান করে। এবং তার অস্তিত্বের কথা অনুভব করান। মানুষ যেমন আর যতটুকু কর্ম করে। ঈশ্বর তাঁর সুপার কম্পিটারাইজড, নির্ধারিত কর্মফল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দ্বারা তার ফল শতগুণ নির্ধারিত করে। যতক্ষণ অব্দি জীব বিশেষ তার কর্মফল ভোগ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মফল স্থির থাকে।

বিশ্বের কোন মন্ত্র, কোন উপবাস, কোন কথা-কাহিনী, কোন যাত্রা, কোন নদীতে স্নান, কোন গাছ বা পাথরের পুজা, কোন ধূর্ত পাখন্ডীর ভণ্ডামি, কোন সদাব্রত, কোন দান, কোন শ্রাদ্ধ বা তর্পন, কোন প্রার্থনা, কোন চিৎকার, যত ইচ্ছা ইবাদত করুক না কেন, যত ইচ্ছা আপনি কোন কনফেস বাক্সের সামনে দাঁড়ান না কেন কর্মফল স্থির থাকে। মানে কোন পুজারী,

কোন মৌলভী, কোন পোপ, কোন ফাদার বা মাদার ইত্যাদি সবাই ঊনার সুপার কম্পিউটারাইজড স্বয়ংক্রিয় কর্মফল ব্যবস্থার অধীন। সবার একই ব্যবস্থা থেকে জন্ম হয়েছে, এবং উনার ব্যবস্থার মধ্যেই প্রত্যেকেই নিজ মৃত্যু প্রাপ্ত হবেন।
কিছুক্ষণ বসে শান্ত মনে চিন্তা করুন, সেই সুপারিশ, কার কাছে, কর্মফল স্থির থাকে। মানে কোন পুজারী, কোন মৌলভী, কোন পোপ, কোন ফাদার বা কোথায়, কিভাবে, কেউ তার নির্ধারিত কর্মফলের সুপারকম্পিউটারাইজড স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা স্পর্শ করতে পারে? পরমেশ্বর এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। যদি কেউ তাঁকে প্রভাবিত করতে সমর্থ বলে দাবি করে তাহলে তাকে পরমেশ্বরের চেয়ে বড় হতে হবে, মহান হতে হবে। তাহলে সে গমের বীজ থেকে ছোলা, আমের বীজ থেকে আমলকি উদ্ভিদ উৎপাদনে সক্ষম হবে। যদি কোন পাখন্ডী এরকম দাবি করে থাকে যে; সে ঈশ্বরীয় নির্ধারিত সুপারকম্পিউটারাইজড সয়ংক্রিয় কর্মফল ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারে। তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া খুব সহজ কাজ। প্রশ্ন করে দেখতে হবে যে, তাঁর ব্যবস্থা কি কেউ পরিবর্তন করতে পারে? এরকম কখনোই হয় না।
ধর্মকে বাহানা বানিয়ে এসব লোক আপনাকে সে তার নিজের ঠগ বিদ্যা দ্বারা ফাঁসাচ্ছে, আপনার লালস প্রবৃত্তিকে দেখে আপনাকে পথভ্রষ্ট করছে। সে অজানা জঙ্গলী লোক নিজ নারকীয় কষ্টের সাথে আপনাকেও তার সাথে নরকগামী করছে। বেদোক্ত ধর্ম ঈশ্বর দ্বারা প্রকাশিত হয় এটি সদা সত্য, সবার জন্য মান্য। দেখুন পাথরাদি ছোড়ার ভণ্ডামি চলছে ২৫০০ বছর ধরে, মুসলিম মত ১৪০০ বছর ধরতে, ঈশায়ী মত ২২০০ বছর ধরে চলছে। আর সৃষ্টির সাথে বেদোক্ত ধর্ম পরমপিতা পরমেশ্বর ম্যানুয়েলের মতো প্রকাশ করে, মানুষকে বলেছিলেন যে- তার কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কবে করতে হবে, কেন করতে হবে, আমি কে, আপনি কে, আপনার চারপাশে কি এই খেলা, কিভাবে এর উন্নতি করা যায়, আপনার সৃষ্টি রহস্য সব খোলা-মেলা ভাবে বলেছেন।
সেই পরমপিতা পরমেশ্বর বেদের মধ্যে সব প্রকারের ভূগোল, খগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থ, শারীরিক সূত্র, সূর্য বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ বিজ্ঞান, দূরসমাচার, মেটলর্জি, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান, এমনকি তাঁর সৃষ্টি যেমন অনন্ত, তদ্রূপ বেদের মধ্যে তিনি তাঁর অনন্ত জ্ঞান মানুষের জ্ঞান লাভের জন্য প্রকাশিত করে দিয়েছেন। চারটি বেদের মধ্যে কোনটিতেই কোন দেশ বা কালান্তরের ইতিহাস বা কাহিনী লিখিত হয়নি। বেদে সূর্য চন্দ্রাদি যা সৃষ্টির শুরুতে শ্বাশত প্রতীক। এর মাধ্যমে তিনি অবশ্যই উপদেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ সূর্যের দিকে তাকান এবং চিন্তা করুন যে, এই আকাশে অগ্নির প্রতীক সূর্য সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ছিলো, আপন সৌরমণ্ডলে স্বয়ং রাত-দিন জ্বলছে। এবং এক মুহুর্তও বিশ্রাম না নিয়ে শক্তি, তাপ ও আলো প্রদান করে ঈশ্বর দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। সূরণ্যের প্রতি বেদের এই নির্দেশ। আর সে বেদোক্ত আজ্ঞা পালন করতে করতে বলে- হে মানব! তুমিও আমার মতো সবসময় বেদোক্ত পরিশ্রম কর, আলস্য ত্যাগ করে কর্ম কর। আমরা এর অন্যথা চিন্তা করা বা বেদে ইতিহাস ইত্যাদি কল্পনা করা, সর্বদাই ন্যায়সংগত নয়। কারণ, বেদ কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয়। এটি পরমপিতা পরমাত্মার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য এক বিশেষ উপহার।
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা বেদবিদ্যার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, আধুনিক পতনশীল বিজ্ঞানকে সত্য মেনে এর অভ্যাস শুরু করে দিয়েছি। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা পরমপিতা পরমেশ্বর সৃষ্ট বেদোক্ত পথ থেক বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি। এখনো সময় আছে আমরা কল্যানকর বেদোক্ত পথে ফিরে আসতে পারি এবং মানবতার বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি।
দেখুন মহর্ষি কপিল মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর সাংখ্য শাস্ত্রে বলেছেন-
প্রশ্নঃ মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?
উত্তর- অথঃ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ।।১.১।।
অর্থঃ জীবনের উদ্দেশ্য হলো তিন প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি।
প্রশ্নঃ তিন প্রকারের দুঃখ কি?

উত্তরঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক।

প্রশ্নঃ আধ্যাত্মিক দুঃখ কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল দুঃখ শরীরে উৎপনজন হয়। যথাঃ ঈর্ষা, লোভ, মোহ, দ্বেষ, ক্লেশ, রোগসমূহ।

প্রশ্ন: আধিভৌতিক দুঃখ কাকে বলে?

উত্তর: যা অন্য প্রাণীর সংসর্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমনঃ সাপে কাটা বা সিংহ দ্বারা মারা গেলে বা মানুষের পরস্পর যুদ্ধ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে।

প্রশ্নঃ আধিদৈবিক দুঃখ কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল দুঃখ দৈবী শক্তি যেমন অগ্নি, বায়ু বা জলের আধিক্যের কারণে উৎপত্তি হয়, তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে।

প্রশ্ন: সময়ের বিচারে দুঃখ কত প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার- ভূত, বর্তমান, অনাগত (ভবিষ্যৎ)

প্রশ্ন: এই তিনটির জন্য পুরুষার্থ করা উচিত?

উত্তর: কেবল অনাগত (ভবিষ্যৎ) এর জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। কারণ, ভূত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ফলে তা নাশ হয়ে যায় আর বর্তমান তো পরক্ষণে ভূত হয়ে যায়।

অতএব এই দুটি স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই ভবিষ্যতের জন্যই পুরুষার্থ করা আবশ্যক। বর্তমানে পুরুষার্থ করলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুটিরই সংশোধন হয়ে যায়।

কবিবর মৈথিলীশরণ গুপ্ত বলেছেন —

তোমার ভূতও মহান এবং তোমার ভবিষ্যৎও মহান।

যদি তোমার যা বর্তমান তা সামলে নাও।।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

লেখক: শ্রী মনমোহন রায় গর্গ

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বৈদিক ঋষি তত্ত্ব

বেদের উপর ঐতিহাসিক আরোপকারী কতিপয় ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য বিদ্বান ঋষিদেরকেই মন্ত্রের রচয়িতা মানতেন। তাদের মতানুসারে যেই মন্ত্রের যে ঋষি নির্দিষ্ট, সেই ঋষিই উক্ত মন্ত্রের রচনা করেছেন। কিন্তু বেদজ্ঞ মনীষীদের প্রাচীন পরম্পরায় বেদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান তথা ঋষিদেরকে মন্ত্রের রচয়িতা নয়, বরং অর্থদ্রষ্টা মানা হত। এই মান্যতা নিরুক্ত-সম্মতও।১ তপস্যা এবং চিন্তন দ্বারা যে মানুষের হৃদয়ে কোন মন্ত্রের অর্থ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয় তথা সেই অর্থকে যিনি অধ্যাপন, উপদেশ আদি দ্বারা অন্যের মাঝে প্রচারিত করেন, তাঁকে সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও এই মতকে স্বীকার করেছেন। তিনি ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকার প্রশ্নোত্তর বিষয়ে নিজের কথার সমর্থনে নিরুক্তের প্রমাণ দিয়ে২ লিখেছেন-

"ঈশ্বর যে সময় সৃষ্টির প্রথমে বেদের প্রকাশ করেছিলেন, তখন থেকেই প্রাচীন ঋষিগণ বেদ মন্ত্রের অর্থের বিচার করতে শুরু করলেন। তারমধ্যে যে সকল মন্ত্রের অর্থ যেসব ঋষিগণ প্রকাশিত করলেন, তাঁদের নাম সেই সেই মন্ত্রের সাথে লেখা

হয়েছিলো। এই কারণে তাঁদের নাম ঋষি হয়েছে। আর যারা ঈশ্বরের ধ্যান এবং অনুগ্রহ দ্বারা অত্যন্ত প্রযত্নের সাথে বেদমন্ত্রের অর্থ যথাবৎ জ্ঞাত হয়ে সকল মনুষ্যদের জন্য পূর্ণ উপকার করেছেন, এজন্য বিদ্বানগণ বেদমন্ত্রের সাথে তাঁদের নাম স্মরণ রাখেন।"৩

বেদে এই ঋষিদের নামের সাথে তাদের পিতৃ-পিতামহের নাম বা গোত্র-নামও সাধারণত যুক্ত হয়েছিলো, অতএব ঋষিগণের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়াতে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকে না। তাঁরা সবাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এজন্য এটিও স্পষ্ট যে যখন সৃষ্টির শুরুতে বেদের প্রকাশ হয়েছিলো, তখন বেদ-মন্ত্রের সাথে ঋষি নাম যুক্ত ছিলো না। এই নামগুলি ঋষিদের কৃতিত্ব-স্মরণার্থ পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে। কোন মন্ত্রের একের অধিক ঋষিও রয়েছে। যথা, সামবেদে মন্ত্র ক্রমাংক ৯০ এর ঋষি বামদেব, অথবা কশ্যপ মারীচ, অথবা বৈবস্বত মনু; ক্রমাংক ৯২-৯৩ এর ঋষি বামদেব কাশ্যপ, অথবা অসিত দেবল; ক্রমাংক ১১০ এর প্রয়োগ ভার্গব, অথবা সৌভরি কাণ্ব; ক্রমাংক ১৫৪ এর শুনঃশেপ আজীগর্ত্তি অথবা বামদেব। ক্রমাংক ১৫৭ এর মেধাতিথি কাণ্ব এবং প্রিয়মেধ আঙ্গিরস; ক্রমাংক ২২০ এর বিশ্বামিত্র গাথিন অথবা জমদগ্নি। দুই বা তার অধিক ঋষিদের দর্শানোর জন্য সাধারণত 'বা' লেখা হয়, যথা- বামদেব কাশ্যপঃ অসিতো দেবলো বা (সাম০ ৯২-৯৩)।

এই 'বা' এর অভিপ্রায় সন্দেহ ব্যক্ত করার জন্য নয় যে, অমুক মন্ত্রের তো বামদেব ঋষি বা দেবল, বরং 'বা' সমুচ্চয় বা সংযোগবোধক। ঋগ্বেদে তো ৩০ মন্ত্রের এক সূক্ত ঋ০ ৯।৬৬ এর ঋষি '১০০', যদিও সেখানে সংখ্যা মাত্র লেখা হয়েছে, সেই শত ঋষিদের নাম দেয়া হয় নি। একাধিক ঋষি যখন কোন মন্ত্রের পৃথক-পৃথক রূপে কোন চমৎকার অর্থদর্শন করতেন, তখন বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট থেকে তাঁদের সেই মন্ত্রের ঋষি হওয়ার গৌরব দেয়া হতো।

কোন ঋষি কোন মন্ত্রের কি অর্থ দর্শন বা অর্থ অনুসন্ধান করেছেন, এর সম্পূর্ণ বিবরণ আজ আমাদের কাছে নেই। কতই না ভালো হতো, যদি আমরা জানতে পারতাম যে তারা কি চমৎকার অর্থ করেছিলেন, যার কারণে তাঁদের ঋষি বলা হয়েছে! সম্ভবত তারা মৌখিকভাবেই নিজেদের বেদার্থের প্রচার করতেন। যদি লিখিতও থাকতো তাহলেও আজ সেসব আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ নেই।

মন্ত্রের ঋষি আজকের মানবদের মাঝেও কেউ হতে পারেন, আজও বিদ্বানগণ সমাহিত হয়ে বিভিন্ন বেদ মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ দর্শন করতে পারেন। কিন্তু আজ তাদের সে সকল মন্ত্রের ঋষি বলার জন্য সুশৃঙ্খল ধারণা নেই। কোথাও কি কাউকে ঋষি বলা হয়? বরং আজকের মন্ত্রের অর্থ দর্শন ও প্রচারকারী ঋষিগণকে অনুবাদক, ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার বলা হয়।

অনেক ঋষি এমন রয়েছেন, যাঁদের নাম সেই বেদ মন্ত্রেই পঠিত হয়েছে যে মন্ত্রের তারা ঋষি। উদাহরণের জন্য সামবেদের এমন কতিপয় ঋষির নাম নিম্ন তালিকাতে দেয়া হয়েছে। [১ম ছবি]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রে, ঋষি মন্ত্র কর্তা না হয়ে যদি মন্ত্রদ্রষ্টা হয় তাহলে উত্তরবর্তী ঋষিদের নাম পূর্ববর্তী বেদ মন্ত্রে কিভাবে পঠিত হলো?

এর উত্তর হচ্ছে সেই ঋষিগণের বাস্তবিক নাম কোনো অন্য ছিলো। যে মন্ত্রসমূহের অর্থ তাঁরা দর্শন করেছেন সেখান থেকে কোনো মন্ত্রে পঠিত কোনো শব্দকে নিজেদের উপনাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই উপনামেই পরবর্তীতে তাঁরা পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছেন।

সামবেদের কোন মন্ত্র এমনও আছে যা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় কিন্তু সামবেদে সেই মন্ত্রের ঋষি ঋগ্বেদ থেকে ভিন্ন। উদাহরণার্থ নিম্ন তালিকা দ্রষ্টব্য৪ - [২য় ছবি]

এই ঋষিভেদ এই কারণে হয়েছে কারণ ঋগ্বেদে অর্থ দর্শন কোন অন্য ঋষি করেছেন এবং সামবেদে সেই মন্ত্রের অর্থ দর্শন কোন অন্য ঋষি। উভয়ের অর্থ দর্শন ভিন্ন। ঋগ্বেদ এবং সামবেদে যে মন্ত্রের ঋষি এক, সেই মন্ত্র উভয় বেদে অর্থ দর্শন এক ঋষিই করেছেন। ঋগ্বেদে ঋষি যে অর্থদর্শন করেছিলেন, সেই অর্থকে সামবেদের অধ্যয়নকারীগণও গ্রহণ করেছেন।

টীকাঃ

১. ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ । ঋষির্দর্শনাৎ, স্তোমান্ দদর্শত্যৌপমন্যবঃ। তদ্ য়দেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুভ্যানর্ষৎ তদ্ ঋষীণাং ঋষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। নিরু০ ২।১১

২. সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। নিরু০ ১।২০

৩. য়তো বেদানামীশ্বরোক্ত্যনন্তরং য়েন য়ৈষর্ষিণা য়স্য-য়স্য মন্ত্রস্যার্থো য়থাবদ্ বিদিতস্তস্মাৎ তস্য তস্যোপরি তত্তদৃষের্নামাভিলেখনং কৃতমস্তি। কুতঃ? তৈরীশ্বরধ্যানানুগ্রহাভ্যাং মহতা প্রয়ত্নেন মন্ত্রার্থস্য প্রকাশিতত্বাৎ, তৎকৃতমহোপকার স্মরণার্থ তন্নামলেখনং প্রতিমন্ত্রস্যোপরি কন্তু যোগ্যমস্ত্যঃ। ঋ০ ভা০ ভূ০, প্রশ্নোত্তরবিষয় ।

৪. এই তালিকাতে দেয়া স্থল ব্যতীত আরো অনেক স্থল রয়েছে যেখানে ঋষিভেদ পাওয়া যায়।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদ ও অহিংসার প্রকৃত স্বরূপ

সনাতন ধর্ম বিশ্বমানবতার ধর্ম ও একমাত্র ঐশ্বরিক সংবিধান বেদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত । বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রে সনাতন ধর্মের বিধিবিধান যে শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচার-প্রিয়াত্মনের ন্যায়দণ্ডে স্থাপিত হয়েছে তাতে কোন পক্ষপাত বা ভেদাভেদ নেই । এখানে কেউ জন্মগতভাবে বা জাতিগতভাবে অভিশপ্ত কিংবা অনন্তকাল শাস্তিভোগী নয় । বৈদিক সনাতন ধর্ম প্রকৃত ❝অধর্মস্তথহিত ❞ হিংসা অধর্ম এবং অহিতকর । অহিংসার শিক্ষা দেয় ❝অহিংসা পরম ধর্ম❞ সেখানে কোনো একক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক শাস্তির বিধান নেই বরং যারা কিনা মানবতা বিরোধী এবং রাক্ষস স্বভাববিশিষ্ট , ঠগ , লুণ্ঠনকারী , হিংসক , চোর , মদ্যপ , ব্যভিচারী প্রভৃতি দুষ্টজন তথা সমাজের ক্ষতি কারক ইত্যাদি ব্যক্তি সমূহের কিরূপ শাস্তির বিধি-বিধান স্পষ্টতঃভাবে বর্ণীত রয়েছে এবং নিরীহ প্রাণী হত্যা অযোগ্য , তাদের বধ না করতে , পাশপাশি অত্যাচার করতেও বারণ করা হয়েছে । বৈদিক সনাতন ধর্মে সমাজ ব্যবস্থা কেবল মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে এবং তাতে অনুপম যে মানবীয় ও নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ রয়েছে তা অতুলনীয় ।

বেদ আমাদের মানবতা এবং ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয় , একে অপরের সঙ্গে তথা সকল প্রাণীর প্রতি মিত্র ভাব রাখার শিক্ষা দেয় , সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দেয় , একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার শিক্ষা দেয় , অহিংসার শিক্ষা দেয় , ❝বসুধৈব কুটুম্বকম❞ আমরা এক জাতি , এক পরিবার ও এক মানবতার ধর্মের শিক্ষা দেয় । ❝ যুযোধ্যস্মদ্ দ্বেষাংসি❞ [ঋগ্বেদ-২.৬.৮] হে পরমেশ্বর ! আমাদের হৃদয় থেকে ঈর্ষা , দ্বেষ , বৈরী ভাবকে দূর করো ।

মানবসমাজের সাম্যতা সম্পর্কে বেদ আমাদের শিক্ষা দেয়-

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥
[ঋগ্বেদ ১০.১৯১.২]

বঙ্গানুবাদঃ— হে মনুষ্য ! তোমরা একসঙ্গে চল , একসঙ্গে মিলে আলোচনা কর , তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক । পূর্ব্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন তোমরাও সেই রূপ করো ।

🌻সিদ্ধান্ত হিসেবে আমরা পেলাম -
পরমেশ্বর আমাদের একসাথে চলতে উপদেশ দিচ্ছেন । নির্দেশ দিচ্ছেন পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু , অন্যায়কারী এবং স্বার্থপর না হয়ে জ্ঞান , ধীশক্তি ও ভালবাসা বৃদ্ধি/ প্রবলতর করার জন্য , একত্রে কাজ কর জ্ঞান ও কল্যান বৃদ্ধির জন্য । পুণ্যবান ব্যক্তির সত্যনিষ্ট ও নিঃস্বার্থ পথ অনুসরণ করা উচিৎ ।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্ত মেষাম্ । সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
[ঋগ্বেদ ১০.১৯১.৩]
বঙ্গানুবাদঃ— তোমাদের সকলের মত এক হোক , মিলন ভুমি এক হোক , মন এক হোক , সকলের চিত্ত সম্মিলিত হোক , তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে সংযুক্ত করেছি , তোমাদের সকলের জন্য অন্ন ও উপভোগ একই প্রকারের দিয়েছি ।

🌻সিদ্ধান্ত হিসেবে আমরা পেলাম -

পরমেশ্বর নির্দেশ দিচ্ছেন , তুমি অবশ্যই ভুল ও সঠিক নির্ণয় করবে পক্ষপাত্বিত দূষণ হতে মুক্ত হয়ে । তোমরা সকলে সংগঠিত হবে সকলের সুস্বাস্থ্য , জ্ঞান এবং মঙ্গল বৃদ্ধিলাভের জন্যে । তোমাদের মন অবশ্যই হতে হবে ঘৃণা বর্জিত এবং সকলের সমৃদ্ধি ও সুখকে নিজের সুখ ও সমৃদ্ধি বলে মনে করবে এবং সত্যের ভিত্তিতে তোমরা শুধু কাজ করে যাও সুখ শান্তি বৃদ্ধির জন্যে । তোমরা একত্রে কাজ কর মিথ্যাকে দূর করার জন্য এবং সত্যকে উদ্ঘাটন করার জন্য । কখনই একতা ও সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে সরে যাবে না ।

সমানীব আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি ॥
[ঋগ্বেদ ১০.১৯১.৪]
বঙ্গানুবাদঃ— তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হোক , তোমাদের হৃদয় সমান হোক , তোমাদের মন সমান হোক । এই ভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক ।
🌻সিদ্ধান্ত :-
পরমেশ্বর উপদেশ করছেন , তোমাদের প্রচেষ্টা হতে হবে উদ্যম পূর্ণ ও সকলের মঙ্গলের জন্য । তোমার আবেগ হবে সকলের জন্য এবং সকলকে সেই ভাবেই ভালবাসো যেভাবে তুমি নিজে নিজেকে ভালবাসো । তোমার ইচ্ছা , মীমাংসা , বিশ্লেষণ, বিশ্বাস , মিথ্যাচার , ধৈর্য , উৎসাহ , কেন্দ্রবিন্দু , সুখ , স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সকল কিছু হতে সত্যের প্রতি এবং সকলে মঙ্গলে প্রতি , এবং অবশ্যই অসত্য বর্জিত হয়ে । একে অপরের জ্ঞান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত একত্রে কাজ করে যাও ।

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ । অন্যো অন্যস্মৈ বলগু বদন্ত এত সধ্রীচীনাস্বঃ সংমনস্কৃণোমি ॥
[অথর্ববেদ ৩.৩০.৫]
বঙ্গানুবাদঃ- তোমরা জ্যেষ্ঠদের সন্মান করো । তোমরা বিচারশীল সাধক একই বন্ধনের নীচে আবদ্ধ হয়ে চলছো । তোমরা পৃথক হইও না । একে অন্যের সঙ্গে মনোহর কথাবার্তায় অগ্রসর হও । তোমাদেরকে একই পথের পথিক ও উত্তম মন বিশিষ্ট করেছি ।

সমানী প্রপা সহ বোরন্নভাগঃ সমানে যোক্তো সহ বো যুনজমি । সমঞ্চোহগ্নিং য়পর্যতারা নাভি মিবাভিতঃ ॥
[অথর্ববেদ ৩.৩০.৬]
বঙ্গানুবাদঃ- হে মানব ! তোমাদের পান একসঙ্গে হোক , আহার একসঙ্গে হোক । তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে একই বন্ধনে যুক্ত করেছি । সকলে মিলে পরমাত্মার পূজা কর । রথচক্রের কেন্দ্রের চারদিকে যেমন অর থাকে তোমরাও সেইভাবে থাক ।

সঘ্রীচীনান্বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশষ্টীস্তসংবননেন সর্বান্ ।
দেবা ইবাহ মৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্ত ॥
[অথর্ববেদ ৩.৩০.৭]
বঙ্গানুবাদঃ- তোমরা সৎভাবে একই পথে অগ্রসর হও , চিত্ত তোমাদের উন্নত হোক , পানাহার তোমাদের এক সঙ্গে হোক - আমি তোমাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই করেছি । অমৃত রসে আপ্লুত বিদ্বানগণদের ন্যায় প্রাতে ও সায়ংকালে তোমাদের চিত্ত প্রসন্ন হোক ।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা ।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥
[অথর্ববেদ – ৩।৩০।৩]
বঙ্গানুবাদঃ- হে মানব ! তোমরা ভাই ভাইকে এবং বোন বোনকে কখনও দ্বেষ কোরো না । তোমরা সকলে এক মতালম্বী এবং একব্রতী হয়ে কল্যাণকর রীতির মাধ্যমে একে অপরের শুভবাণী বলো ।

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভুতানি সমীক্ষন্তাম্ ।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভুতানি সমীক্ষে । মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥
[যজুর্বেদ ৩৬.১৮]
বঙ্গানুবাদঃ- হে দুঃখনাশক পরমাত্মা ! আমাকে সুখের সহিত বর্ধন কর , আমাকে সকল প্রাণী মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক , মিত্রের দৃষ্টিতে আমি সকল প্রাণীকে দেখি । মিত্রের দৃষ্টিতে যেন আমরা পরস্পরকে দেখি ।
মানুষ কখনই কোন কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয় , মায়া ও মমতার সহিত তাদের সাথে আচরণ করা উচিৎ । মানুষ সকল প্রাণীকে নিজের বন্ধু হিসেবে গণ্য করবে এবং প্রত্যেকের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে ।

তে অজ্যেষ্ঠা একনিষ্ঠাস উদ্ভিদো হমধ্যমাসেঃ মহসা বি বাবৃধুঃ । সুজাতাসো জনুষুঃ পৃশ্নি মাতরা দিবো মর্য্যা আনোঅচ্ছা জিগতন ॥
[ঋগ্বেদ ৫.৫৯.৬]
বঙ্গানুবাদঃ- মানবের মধ্যে কেহ বড় নয় , কেহ ছোট নয় , কেহ মধ্যম নয় তারা সকলেই উন্নতি লাভ করছে । জন্ম হতে তারা কুলীন । তারা জন্মভূমি সন্তান দিব্য মনুষ্য । তোমরা সত্য পথে আমার [ঈশ্বরের] নিকট আগমন করো ।
তাংরুতুদঃ স্যাদার্তোপি ন পরদ্রোহকর্মধীঃ । য়য়াস্যাদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েত্ ॥
[মনুস্মৃতি ২|১৬১]

১. (আর্তঃ অপি) স্বয়ং দুঃখী হয়েও ,
২. (অংরুতুদঃ) অপরকে পীড়া প্রদান করবে না ।
৩. (ন পরদ্রোহকর্মধীঃ) না অপরের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ অথবা ক্ষতিসাধনের চিন্তা মনের মধ্যে আনবে ।
৪. (অস্য যয়া বাচা উদ্বিজতে) যেই বচনের দ্বারা অপর কেউ উদ্বিগ্ন হয় ,
৫. (তাম্ অলোক্যাং ন উদীরয়েত্) সেরূপ অপ্রশংসনীয় বাণী এই সংসারে বলবে না ।
🌞অর্থাৎ , যারা আমদের পীড়া প্রদান করেন , তাদের প্রতি যেন আমরা ঈর্ষা-দ্বেষ বা ক্ষতিসাধনের কোনরূপ মনোভাব বা চিন্তাও যেন মনে না আনি । এবং কটু কথা যেনো পরিহার করি এবং প্রিয়ভাষী যেনো হই । ❝দুর্ণাম্নী সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসিঃ ❞ [অথর্ববেদ ৭.২৩.১] অপশব্দযুক্ত সমস্ত কটুক্তি আমরা নিজেদের হৃদয় থেকে যেন দূর করি । ❝ যুযোধ্যস্মদ্ দ্বেষাংসি❞ [ঋগ্বেদ-২.৬.৮] হে পরমেশ্বর ! আমাদের হৃদয় থেকে ঈর্ষা , দ্বেষ , বৈরী ভাবকে দূর করো ।

অনেক মানুষ রয়েছেন যারা কিনা না জেনে , বা না বুঝে , যারা আমাদের কষ্ট দেয় তাদের প্রতি আমাদের কি মনোভাব হওয়া উচিৎ

❓
✅বেদে পরমেশ্বর এই উপদেশই দিচ্ছেন প্রার্থনা মন্ত্রের শিক্ষা দ্বারা -

মা নো॑ বধায় হ॒ত্নবে॑ জিহীল্া॒নস্য॑ রীরধঃ ।
মা হ্ণা॒নস্য॑ ম॒ন্যবে॑ ॥
ঋগ্বেদ ১।২৫।২

অর্থাৎ , হে জগদীশ্বর ! যেসব মানব অজ্ঞানতার কারণে আমাদের অনাদর করে তাদের প্রতি হিংসা কিংবা হনন করার জন্য আপনি কখনো আমাদের প্রেরিত করবেন না । একইভাবে অপরাধ করার পরে আমাদের সম্মুখে লজ্জিত মানবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেও প্রবৃত্ত করবেন না ।

বেদ যেমন আমাদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপদেশ প্রদান করে ❝মনুর্ভব জনয়া দৈবং জনম্❞ [ঋগ্বেদ ১০.৫৩.৬] প্রকৃত মানুষ হও এবং অন্যকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোল । আবার বেদ প্রতিপাদিত কর্ম ত্যাগ করে , অবৈদিক কর্মে রত ব্যক্তি ' মনুষ্য ' সংজ্ঞাযোগ্য নয় । [ঋগ্বেদ ১০.২২.৮] সেটার উপদেশ ও দেয় । বেদের জ্ঞান অনুযায়ী যারা মানবতার , দেশের , নৈতিকতার বিরুদ্ধে সবাই শত্রু ও রাজাকে তার দণ্ডের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে । বেদ যেমন আধ্যাত্মিকশাস্ত্র তেমন রাজনীতিরও । আমাদের সমাজে কুচক্রী , নরাধাম পাপিষ্ঠ , অপকর্মকারী তথা মদ্যপ , ব্যাভিচারী ঠগ- লুণ্ঠনকারি রাক্ষস-স্বভাববিশিষ্ট অসুর ব্যক্তিগণের অভাব নেই । তাদের দণ্ড বা উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে ।

🌸রাক্ষস-স্বভাববিশিষ্ট অসুর ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্পর্কে - যজুর্বেদ ২।৩০ তে বলা হয়েছে -

য়ে রূ॒পাণি॑ প্রতিমু॒ঞ্চমা॑না॒ऽঅসু॑রাঃ॒ সন্তঃ॑ স্ব॒ধয়া॒ চর॑ন্তি ।
প॒রা॒পুরো॑ নি॒পুরো॒ য়ে ভর॑ন্ত্য॒গ্নিষ্টাँল্লো॒কাৎ প্র ণু॑দাত্য॒স্মাৎ ॥
[যজুর্বেদ ২.৩০]

🚫যে দুষ্ট মানব -

১। নিজের জ্ঞানানুকূল স্বীয় অন্তঃকরণে মথিত ভাবকে লুকিয়ে রেখে অন্যের সামনে বিপরীত ভাব প্রকাশ করে
২। ধর্মকে আচ্ছাদিত করে

৩। পৃথিবীতে যত্র-যত্র যাওয়া-আসা করে
৪। সংসারে নিজের সুখের জন্য অধর্ম করে , নীচ - দুষ্টস্বভাবদের সহায়তা করে ও অন্যায়পূর্বক অপরের দ্রব্য হরণ করে ।
৫। সেই দুষ্টদের পরমেশ্বর এই স্থান থেকে বা আমাদের দৃষ্টি থেকে দূরীভূত করুন ।

▶️উল্লেখ্য যে , অসুর কোন ভিন্ন জাতিবিশেষ নয় , বরং মানুষেরই অবস্থা-বিশেষ । বিভিন্ন মন্ত্রে অসুর শব্দটি যেমন প্রশংসাসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন মন্ত্রে যাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি নেই , সদাচার নেই , সংসারে নিজের সুখের জন্য অধর্ম করে , নীচ - দুষ্টস্বভাবদের সহায়তা করে ও অন্যায়পূর্বক অপরের দ্রব্য হরণ করে তারাই মূলত অসুর । অর্থাৎ , যেসব দুষ্ট মনুষ্য স্বীয় মন , বচন ও শরীর দ্বারা মিথ্যা আচরণ করে অন্যায়পূর্বক অন্য প্রাণিদের পীড়া দিয়ে স্বসুখের জন্য অপরের পদার্থ গ্রহণ করে নেয় তাদের উপর অত্যাচার করে । অতএব , সব মনুষ্যদের কর্ত্তব্য যে , এহেন দুষ্ট মনুষ্যদের দণ্ড প্রদান করা ।

💥কারা মূলত শাস্তি পাবার যোগ্য , কারা দণ্ড ভোগ করবে ? সে বিষয়ে বেদে সুস্পষ্ট বর্ণনা -

✔️
উপ প্রাগাদ্দেবো অগ্নী রক্ষোহামীবচাতনঃ ।
[অথর্ববেদ ১.২৮.১]
অর্থাৎ , দুরাচারী , পীড়াদাতাদের জ্ঞানী উপদেশ দিয়ে ও সৈনিক দণ্ড দ্বারা সংশোধন করেন ।

✔️
সনাদগ্নে মৃণসি য়াতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ অনু দহ সহমূরান্কয়াদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥
সামবেদ- ৮০
সরলার্থঃ হে অগ্রণী পরমাত্মা ! অথবা শত্রুসংহারক রাজা ! তুমি চিরকাল ধরে পীড়াদায়ক ঘাত-প্রতিঘাত , হিংসা , উপদ্রব প্রভৃতি দোষ সমূহকে এবং দুষ্টজনদের বিনষ্ট করে এসেছ । কাম , ক্রোধ , লোভ প্রভৃতি এবং ঠগ , লুণ্ঠনকারী , চোর প্রভৃতি রুক্ষ স্বভাবী তোমাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংগ্রামে জয় করতে পারে না । তুমি সুখ-নাশক দুর্বিচারী তথা দুষ্টজনদের সমূলে একে একে ভস্ম করে দাও । সেই দুষ্ট স্বভাব ও দুষ্টজন তোমার বিদ্বানগণের হিতকারী দণ্ডশক্তিরূপ বজ্র থেকে এবং শস্ত্রসমূহ থেকে পালাতে পারে না ।
ভাবার্থঃ হে ধর্মপালক , অধর্মবিধ্বংসক, সদ্গুণপ্রসারক জগদীশ্বর বা রাজা ! তোমার প্রশংসক আমি যখনই মানসিক কাম , ক্রোধ , লোভ , মোহ প্রভৃতি এবং বাহ্য ঠগ , লুণ্ঠনকারী , হিংসক , চোর , মদ্যপ , ব্যভিচারী প্রভৃতি দুষ্টজন দ্বারা পীড়িত হই ; তখনই তুমি আমার সহায়ক হয়ে তাদের সমূলে নষ্ট করে আমাকে রক্ষা করো । দুর্জনের যদি হৃদয় পরিবর্তন সম্ভব হয় ; তবে তার দুষ্ট স্বভাব তথা রুক্ষভাব নষ্ট করে তাকে শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত করে দাও যাতে সংসারে সৎ লোকের সমৃদ্ধি হয় এবং সর্বত্র সুখ ও সৌহার্দ্যের ধারা প্রবাহিত হয় ।

✔️
উত্ত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।

অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥১॥

সামবেদ- ১৯৪

সরলার্থঃ হে রাজা ! বীররস তোমাকে উৎসাহিত করে। হে বজ্রধারী , বিবিধ শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত , ধনুর্বেদে পারদর্শী রাজা ! তুমি প্রজাদের জন্য সব প্রকারের ধনধান্যাদি উৎপন্ন করো , প্রদান করো । ঈশ্বরবিরোধী , বেদবিরোধী , বিদ্যাবিরোধী , সত্যবিরোধী , ধর্মবিরোধী , ন্যায়বিরোধী এবং প্রজাবিরোধী চোর , ডাকাত প্রভৃতি তস্করকে দূর করো ।

✔

অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্।

দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্ ॥৯॥

সামবেদ- ১০৫

সরলার্থঃ হে সজ্জনের পালনকর্তা পরাক্রমশালী পরমাত্মা , বিদ্বান ও রাজা ! আপনি সেই পরিত্যাজ্য পাপপ্রবৃত্তিকে , কামক্রোধাদি ষড়রিপুকে অথবা বাহ্যিক শত্রুকে , চোরকে এবং খারাপ চিন্তনকারী দ্বেষকারীকে দূর থেকে দূরে নিক্ষেপ করে সরিয়ে দিয়ে আমাদের চলার পথ সুগম করুন ।

ভাবার্থঃ পাপচিন্তা বা পাপীরা , কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপু অথবা বাহ্য শত্রু , চৌর্যবৃত্তি অথবা চোরেরা , কুপ্রবৃত্তি অথবা কুপ্রবৃত্তিধারী মানুষেরা– যারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করে , তাদের আমরা পরমাত্মা , বিদ্বানগণের এবং রাজার সহায়তায় দূর করে দেই । সদ্বিচার ও সদ্বিচারশীল ব্যক্তিগণ আমাদের সহায়তাকারী হয়ে বিচরণ করেন ।

✔

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।

সনিং মেধাময়াসিষম্ ॥৭॥

সামবেদ- ১৭১

সরলার্থঃ অন্য জনগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট গুণ , কর্ম ও স্বভাবসম্পন্ন , পরমাত্মার প্রিয় , প্রজাদের পছন্দনীয় , রাষ্ট্রের ধনকে সুষ্ঠু বিভাগকারী , প্রজাদের সৎকর্মের পুরষ্কার প্রদানকারী এবং অসৎকর্মের যথাযোগ্য দণ্ড প্রদানকারী , রাষ্ট্রসভার অধ্যক্ষ রাজার নিকট আমি বিদ্যাপ্রচার এবং ধনের যাচঞা করি ।

✔

বয়মেনমিদা হ্যোপীপেমেহ বজ্রিণম্।

তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥১০॥

সামবেদ- ২৭২

সরলার্থঃ আমরা সকলেই দুষ্ট শত্রু তথা চোর , ডাকাত , দুষ্কৃতকারী প্রভৃতিদের প্রতি দণ্ডধারী এই নিজের সম্রাটকে বর্তমান কালে এবং অতীতকালে এই রাষ্ট্র যজ্ঞে কর প্রদান দ্বারা বৃদ্ধি করেছি । হে ভ্রাতা ! তোমরাও সেই সম্রাটের জন্য আজ রাষ্ট্ররূপ যজ্ঞে নিজের আমদানির অর্থ থেকে পৃথক করে প্রদেয় রাজকর প্রদান করো । হে অন্য প্রজাজন ! তোমরাও নিশ্চয়তা পূর্বক রাজ আজ্ঞা শোনার পর রাজাকে নিজ নিজ প্রদেয় অংশ প্রদান করে অলঙ্কৃত করো ।

ভাবার্থঃ সবল মানুষের দুর্জন ও দুর্গুণের বিনাশক তথা সজ্জন ও সদ্গুণের পোষক পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত । সেই ভাবেই দুষ্ট শত্রু , চোর , লম্পট , ডাকাত , ছিনতাইকারী প্রভৃতি তথা অশান্তি বৃদ্ধিকারীদের শাস্তিপ্রদানকারী এবং সজ্জনদের তথা শান্তিপ্রেমীদের রক্ষাকারী সম্রাটকেও কর প্রদান করে সম্মান করা উচিত ।

✔
য়দিন্দ্র শাসো অব্রতং চ্যাবয়া সদসস্পরি।
অস্মাকমংশুং মঘবন্পুরুস্পৃহং বসব্যে অধি বর্হয় ॥৬॥
সামবেদ- ২৯৮
সরলার্থঃ হে পাপ ও পাপীদের বিনাশক রাজা , যেহেতু আপনি শাসক , সেহেতু রাষ্ট্রসেবার নিমিত্ত সত্যাচরণরূপ ব্রত গ্রহণ করে না , এমন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপরিষদের সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করে দিন । হে ধন-সম্পদের অধিপতি ! আমাদের অতিশয় প্রিয় প্রদত্ত কর-রূপ অংশ দানকে রাষ্ট্রহিত কার্যে ব্যয় করুন ॥৬॥
ভাবার্থঃ সেই ব্যক্তিই রাষ্ট্রপরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য , যে রাষ্ট্রসেবার ব্রতে দীক্ষিত । প্রজাদেরকেও বর্ণাশ্রমের মর্যাদা পালনকারী এবং কর্মপরায়ণ হওয়া উচিত । প্রজাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাজাকে কর প্রদান করা এবং রাজারও উচিত করের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাদি সম্পদকে রাষ্ট্রহিত কার্যে ব্যয় করা ।
বেদ এমনই কিছু দণ্ড বিধান প্রদান করেছেন যার দ্বারা বিশ্ব শত্রু-মুক্ত এবং মানুষ পরস্পর মিত্রতা ভাব দ্বারা সুন্দর বিশ্ব গঠন করতে পারে ।

✅আমরা কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম -

১) আমাদের মধ্যে যেন দুঃখপ্রদানকারী পাপী বা চোর ডাকাত উৎপন্ন না হয় । [যজুর্বেদ ১।১]
২) দুষ্ট গুণ , দুষ্ট স্বভাব , বিদ্যার বিরোধী ছলযুক্ত , দান বা বিদ্যারহিত দুষ্ট প্রাণীদিগকে নির্মূল করণ এবং সন্তাপ প্রদান [যজুর্বেদ১।৭]
৩) পরমেশ্বর দোষনাশক , বিদ্বেষী , ছল-কপটযুক্ত , পাপী , কাম-ক্রোধাদিযুক্ত যারা ধর্মাত্মা ও ধর্মাত্মাদের সুখকামনাকারী আমাদের দুঃখ দেয় তাদেরকে শিক্ষা ও তাড়না প্রদানের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা । [যজুর্বেদ ১।৮]
৪) দু'ষ্টস্বভাবযুক্তদের ঘর থেকে পৃথকীকরণ এবং ধর্মরহিত শত্রুদের দূরীকরণ । [যজুর্বেদ১।১৩]
৫) চোর বা শত্রুদের বিনাশ , পবিত্রতা আদি গুণ রহিত, দুষ্ট স্বভাবযুক্ত তথা শুদ্ধি ত্যাগী , দান আদি ধর্ম রহিত তথা ডাকাতদের নাশের সদা প্রযত্ন করা উচিত । [যজুর্বেদ ১।১৬]
৬) দুঃখ এবং দুষ্টস্বভাবযুক্ত মনুষ্যদের বিনাশ , সৎসঙ্গরূপ যজ্ঞ । [যজুর্বেদ ১।১৯]
৭) সকলের উপকারী ধার্মিক সজ্জনদের বিরোধকারী অধর্মাত্মাদের বন্ধনপূর্বক শাস্তি প্রদান [যজু০ ১।২৫]
৮) উক্ত শত্রুদের বন্ধনের কারণ এবং সেই বন্ধনের স্বরুপ । যেমন: পাপীদের বন্ধনপূর্বক তাদের হৃদয়ে শুভ গুণ বা বিচার উৎপন্ন করার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা [যজু০ ১।২৬]
৯) শত্রুদের নাশকরণ মানে তাদের দোষসমূহের নাশ করা , পরসুখ সহ্য করতে পারে না এবং অপরকে দু্ঃখপ্রদান করে এমন শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । [যজু০ ১।২৯]
১০) সাক্ষাম তান্বাহুভিঃ শাশদানান্ [অথর্ববেদ ২০.৮৭.৪] আমরা সেই হিংসক শত্রুদের নিজের বাহুবল দ্বারা জয় করি ।

একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে , বেদে নিরীহ মানুষকে কোনভাবেই আঘাত বা তাদের ক্ষতি সাধনের কোনরুপ বর্ণনা নেই বরং যারা কিনা অবৈধিক কর্মাদিতে রত , সমাজের ক্ষতিকারক তাদের রাজদণ্ড দ্বারা তাদের সমূলে উৎপাঠিত করা কোন মানবতা বিরুদ্ধ নয় বরং মানবতার পরিপন্থী ।

✅যেমনটা আমরা বেদ উল্লেখ পাই -

✔
বা॒হূ মে॒ বল॑মিন্দ্রি॒য়ꣳ হস্তৌ॑ মে॒ কর্ম॑ বী॒র্য়ম্ ।
আ॒ত্মা ক্ষ॒ত্রমু॒রো॒ মম॑ ॥
[যজুর্বেদ ২০.৭]

ভাবার্থঃ হে মানবগণ ! আমার বল , ধন , বাহুদ্বয় , পরাক্রম, হৃদয় রয়েছে । আমি নিজে অনাদি জীবাত্মা ও সব রকমের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম ।

✔
মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন ।
গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥
[ঋগ্বেদ ১.৩৭.১২]
অনুবাদঃ হে বীর মানবগণ ! তোমার মধ্যে যে বল আছে তাতে তুমি পাহাড়ের মতো দৃঢ় শত্রুকেও টলাতে পারো ।

✔
অ॒ক॒র্মা দস্যু॑র॒ভি নো॑ অম॒ন্তু॒র॒ন্যব্র॑তো॒ অমা॑নুষঃ । ত্বং তস্যা॑মিত্রহ॒ন্বধ॑র্দা॒সস্য॑ দম্ভয় ॥
[ঋগ্বেদ ১০.২২.৮]
অনুবাদঃ হে মানব ! তুমি অন্যদের কষ্ট দেয়, সৎকর্ম করে না , দমন-নিপীড়ন করে এমন অমানুষদের নাশ করো ।

✔
উদ্বৃ॑হ॒ রক্ষঃ॑ স॒হমূ॑ল॒মিন্দ্র॒ বৃশ্চা মধ্য॒ং প্রত্যগ্র॑ং শৃণীহি। আ কী॑বতঃ সল॒লূক॑ং চকর্থ ব্রহ্ম॒দ্বিষে॒ তপু॑ষিং হে॒তিম॑স্য ॥
[ঋগ্বেদ ৩.৩০.১৭]
অনুবাদঃ হে বীর ! প্রাণঘাতী দুষ্টকে এক এক করে সমূলে বিনাশ করো , যত দূরেই থাকুক না কেন পাপী , দস্যুরা যেন রক্ষা না পায় , তাদের প্রতি জ্বালাময়ী অস্ত্র চালাও ।

✔
অতি॑ ধাবতাতিসরা॒ ইন্দ্র॑স্য॒ বচ॑সা হত। অবি॒ং বৃক॑ ইব মথ্নীত॒ স বো॒ জীব॒ন্মা মো॑চি প্রা॒ণম॒স্যাপি॑ নহ্যত ॥
[অথর্ববেদ ৫.৮.৪]
অনুবাদঃ হে বীরগণ ! শত্রুদের পরাভূত করো, তোমার হাত থেকে যেন তারা কোনভাবে ছাড়া না পায়, তাদের প্রতিহত করো ।

✔
পরিবৃতোব্রহ্মাণা বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ। মা মাপ্রাপন্নিষবো দৈব্যা যা মা মানুষীরবসৃষ্টাঃ বধায়॥
[অথর্ববেদ ১৭.১.২৮]
অনুবাদঃ আমি বেদ দ্বারা সুরক্ষিত , সূর্যের মতো তেজ ও কান্তিময় হবো । কোন প্রাকৃতিক বা মানবীয় আঘাত যেন আমার ক্ষতি করেত না পারে ।

✔
যদ্বদামি মধুমত্তদ্বদামি যদীক্ষে তদ্বনন্তি মা। ত্বিষীমানস্মি জূতিমানবান্যান্হন্মি দোধতঃ ॥
[অথর্ববেদ ১২.১.৫৮]
অনুবাদঃ যখন আমি কথা বলি আমি মধুরভাবে বলি, যখন আমি দেখি মানুষও আমাকে প্রেমভাবে দেখে । আমি তেজস্বী , পরাক্রমী । আবার আমিই আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রুদের ধূলিস্যাৎ করি ।
প্রতিদিনকার মানব জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন কিনা আমরা নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অন্য ব্যক্তির দ্বারা নানা রকম আক্রমণ কিংবা অপরাধের শিকার হই ।

🔆পবিত্র বেদ বলছে -

✔
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥
ঋগ্বেদ ১।৫০।১৩
অনুবাদঃ হে বিদ্বান ! যেভাবে এই অবিনাশী সূর্য উদিত হয় সেভাবে তুমি সম্পূর্ণ বল দ্বারা উত্থিত হও । যেভাবে তুমি ধার্মিক মানবের বিদ্বেষকারী শত্রুকে বিনাশ করো সেভাবেই আমিও শত্রুদের প্রতি আচরণ করবো । যে শত্রু আমাকে মারে তাকে আমিও মারবো , যে আমাকে মারবে না তাকে আমিও মারবো না ।

✔
ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥
ঋগ্বেদ ৪।৫০।২
অনুবাদঃ হে বৃহৎ পালক মানব ! যে হিংসক - আনন্দপ্রদাতা ধর্মাত্মাদের কম্পিতকারীদেরও কম্পিতকারী , প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত বিদ্যাদি উত্তম গুণের সিঞ্চনকারী , উত্তমগুণযুক্ত, অহিংসিত মানবদের বিনাশ করে এবং আমাদের চতুর্দিকে নাশ করে তার নিবারণ করুন । হে বৃহৎপালক ! যাকে রুদ্ধ করার মাধ্যমে বিদ্যা - আচরণের আপনি রক্ষা করেন ।

✔
উত হন্তি পূর্বাসিনং প্রত্যাদায়াপর ইত্বা।
উত পূর্বস্য নিঘ্নতো নি হন্ত্যপরঃ প্রতি ॥

অথর্ববেদ ১০।১।২৭
অনুবাদঃ অতি শ্রেষ্ঠ মানবই প্রথমে আঘাতকারীকে বাণ দ্বারা প্রত্যাঘাত করে । অতি শ্রেষ্ঠ মানবই প্রথমে আঘাতকারীকে নিরন্তর হনন করে ।

দেখুন বেদে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে প্রথমে আক্রমণ করবে তাকেই প্রতিহত করার জন্য । এছাড়াও এই মন্ত্রগুলোতে এটাও প্রার্থনা করা হয়েছে যারা আমাদেরকে আক্রমণ করে না এবং নিরীহ নিরপরাধ মানুষ তাদেরকে যেন আমরা ক্ষতি না করি । আরো লক্ষ করা যায় যে এই মন্ত্র গুলোতে মানুষকে বলা হয়েছে তারা যেন ধর্মের পালন এবং তার আচরণ করে অর্থাৎ এই মন্ত্রগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট যে বেদে নিরীহ মানুষের সাথে বা হিংসাত্মক মনোভাবের কোনরকম কোন বর্ণনা নেই বরং যদি কেউ আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে কিংবা প্রথমে আঘাত করে কিংবা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় প্রত্যাঘাতের ব্যবস্থা নেব ।

✅বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে [৩।১৫-১৮] বলা হয়েছে -
আত্মরক্ষার্থে আততায়ীকে বধ করবে ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নেই এমন বলা হয় । আততায়ী ৬ ধরনের । এ বিষয়েও বলা হয়েছে - অগ্নিদ [যে ঘরে আগুন দেয়] , বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র [হত্যার জন্য অস্ত্রধারণ করে] , ধনাপহারী [ধন অপহরণ করে] , ক্ষেত্রাপহারী [জমি দখল করে] ও দারাপহারী [স্ত্রী হরণ করে] এই ৬ প্রকার আততায়ী ।
বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হয়ে আসে , তা হলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করবে , তা ব্রহ্মঘাতী হবে না ।
স্বাধ্যায়সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হলে তাকে বধ করবে , তাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হবে না ; কেননা , আক্রান্তের ক্রোধ আততায়ীর ক্রোধকে পরাস্ত করে ।

💥আততায়ী শত্রুদের পরাজিতকারীদের সৎকারের নির্দেশ রয়েছে -

✔
নমো রুদ্রায়াততায়িনে
যজুর্বেদ ১৮।১৮
অনুবাদঃ শত্রুদের কাঁদায় এবং উত্তমভাবে বিস্তৃত শত্রুদের পরাজিতকারী মানবকে অন্ন প্রদান করবে এবং তাদের প্রতি আমাদের নমস্কার ।

✔
প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ।
ঋগ্বেদ ৮।৭৭।৩
অনুবাদঃ রাজা আততায়ী দস্যুদের দণ্ড প্রদান করবেন ।

✔
সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে ।
ঋগ্বেদ ১০।৯৫।৮
অনুবাদঃ আমরা একত্রে রাজশক্তির মাধ্যমে আততায়ীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করবো ।

✔

স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যা ন উপেষে অত্রৈঃ।
ঋগ্বেদ ১।১২৯।৮
অনুবাদঃ আততায়ী শত্রুদের আমরা সর্বতোভাবে বিনষ্ট করি ।

🌞অতঃ যারা কিনা সমাজ-বিরোধী , নৈতিকতা-বিরোধী , মানবতা-বিরোধী সমাজের ক্ষতি সাধন করে । তাদের বৈদিক রাজদণ্ড অনুযায়ী শাস্তি প্রদান এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত । পাশাপাশি এরূপ ঠগ , লুণ্ঠনকারী , মদ্যপ , ব্যাভিচারী ব্যক্তিদের সমাজ থেকে দূরীভূত করা উচিত । এবং আমাদের এরূপ কাজে নিজেদের বিরত রাখা অতীব আবশ্যক ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখতে কেমন ছিলেন ? – মহাভারতের আলোকে জানুন

“শ্রীকৃষ্ণ” এই নামটি শুনতে যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি এই নামধারীর দর্শনও চক্ষুদ্বয়কে আনন্দ দিতো। আর তাই তো হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধের বদলে সন্ধি ও শান্তির বার্তা নিয়ে আসবেন এমন সংবাদ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পেয়েছিলেন তখন তিনি পরম আনন্দে বলেছিলেন—

চক্ষুষ্মতাং বৈ স্পৃহয়ামি সঞ্জয় ! দ্রক্ষ্যন্তি যে বাসুদেবং সমীপে।
বিভ্রাজমানাং বপুষা পরেণ প্রকাশয়ন্তং প্রদিশা দিশশ্চ ॥৬২॥
[উদ্যোগপর্ব- ৬৬/৬২]
=> (ধৃতরাষ্ট্র): হে সঞ্জয়! যারা শ্রীকৃষ্ণকে অতি নিকট থেকে দর্শন করবেন আমি সেই দর্শনার্থীদের সৌভাগ্য কামনা করি। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমসুন্দর দেহ দ্বারা বিরাজিত এবং নিজের কান্তি দ্বারা তিনি দ্বিগ্বিদিক্ আলোকিত করবেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন —

সস্ত্রীপুরুষ বালঞ্চ নগরং মধুসূদনম্। উদীক্ষতাং মহাত্মানং ভামনুত্তমিব প্রজা॥১৭॥
[উদ্যোগপর্ব- ৮০/১৭]
=> (ধৃতরাষ্ট্র) : মানুষ যেমন সূর্যকে দর্শন করে তেমনি নগরের স্ত্রী,পুরুষ,বালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করুক।
তাই শ্রীকৃষ্ণ যেদিন হস্তিনাপুরে এসেছিলেন সেদিন একটিবার তাঁর দর্শন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সকল প্রজা গৃহ ছেড়ে রাজপথে ভিড় করেছিল।

ন চ কশ্চিদ্ গৃহে রাজংস্তদাসীদ্ভরতর্ষভ।

ন স্ত্রী ন বৃদ্ধো ন শিশুর্বাসুদেবদিদৃক্ষয়া॥৮॥ [উদ্যোগ পর্ব -৮২/৮]

=> শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখবার ইচ্ছায় বালক,বৃদ্ধ, স্ত্রী কেউই আর ঘরের ভিতর ছিল না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য এতো উৎসুক কেন ছিল সবাই? সত্য ও সৌন্দর্যের পূজারী যারা তাদের কাছে এপ্রশ্ন বাহুল্য মাত্র। যোগেশ্বরের রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা শ্রবণ করলে আমার পূর্বোক্ত কথার যথার্থতা উপলব্ধি করতে আপনাদের কষ্ট হবে না। শ্লোকাংশ ও শ্লোক উদ্ধৃত করা হলো:

- **“কৃষ্ণমায়ন্তং প্রসন্নাদিত্যাবর্চ্চসম্।”**

=> শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সূর্যের ন্যায় প্রসন্ন নির্মল তেজযুক্ত। [উদ্যোগ পর্ব - ৮৩/২]

- **“উদ্যন্মেঘস্বনঃ কালে প্রগৃহ্য বিপুলং ভুজম্।”**

=> শ্রীকৃষ্ণের স্বর ছিল সজল মেঘের ন্যায় অথচ গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত। তাঁর ভূজদ্বয় ছিল বিশাল।
[উদ্যোগ পর্ব - ৮৪/১৭]

- **“বাক্যমভ্যাদদে কৃষ্ণঃ সুদংষ্ট্রো দুন্দুভিস্বনঃ।”**

=> সুন্দরদন্তশালী ও দুন্দুভির ন্যায় মধুরধ্বনি যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে কথা বলতে শুরু করলেন।
[উদ্যোগ পর্ব - ৮৮/১]

- **“রাজীবনেত্রঃ”**

=> শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় ছিল পদ্মের ন্যায়।
[উদ্যোগপর্ব- ৮৪/১৮]

- **“অতসীপুষ্পসংকাশঃ পীতবাসা জনার্দনঃ।**

ব্যরাজত সভামধ্যে হেম্নীবোপহিতো মণিঃ” ॥৬৫॥

=>(নীল) অতসীপুষ্পের ন্যায় নীল বর্ণযুক্ত, পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত শ্রীকৃষ্ণ যেন সভামধ্যে স্বর্ণের উপরে সংস্থাপিত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।
[উদ্যোগ পর্ব — ৮৭/৬৫]

অবশ্য মহাভারতের আরেকটি স্থলে পাওয়া যায়—
“কৃষ্ণবর্ণশ্চ মে যস্মাত্তস্মাৎ কৃষ্ণোহহমর্জ্জুনম”
=> (শ্রীকৃষ্ণ) : "যেহেতু আমার কৃষ্ণবর্ণ সেহেতু আমি কৃষ্ণ।"

[শান্তিপর্ব - ৩২৮/২৬৫, স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বিধায় এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ শ্যাম বর্ণের।]

যার এমন শ্যাম গাত্রবর্ণ, স্নিগ্ধ অঙ্গকান্তি অথচ তা রৌদ্রজ্বোল, যার কণ্ঠ বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর,দৃপ্ত অথচ শ্রুতিমধুর, যার ব্যক্তিত্বের কাছে পর্বতমালাও ধূলিকণাসম অথচ সারল্য কোনো এক অনন্তকালের বাল্যবন্ধুর মতো, এমনকি চিত্তবিভ্রান্ত শত্রুকেও যিনি পরম স্নেহপূর্বক ধর্মমার্গে চলার উপদেশ দেন — সেই যোগেশ্বরের সাথে কোনো এক কল্পে বা জন্মান্তরে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হবে কি?

🏛️সন্দর্ভ — মহাভারত: হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

বাংলাদেশ অগ্নিবীর
সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক।

নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে বেদে কী বলা হয়েছে ?

বেদোক্ত কর্মের উত্তমতা বিষয়ে বলা হচ্ছে —
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ যজুর্বেদ ৪০.২
সরলার্থঃ মনুষ্য এই সংসারে ধর্মযুক্ত, বেদোক্ত নিষ্কাম কর্ম করেই শতবর্ষ জীবিত থাকার ইচ্ছা করবে। এইপ্রকারে ধর্মযুক্ত কর্মে প্রবৃত্তমান মনুষ্য তোমাতে অবৈদিক কাম্য কর্মের আবরণ থাকবে না। এই বেদোক্ত কর্ম ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই, যার দ্বারা মনুষ্য সেই কাম্য কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে পারে।

অর্থাৎ, মনুষ্যগণ আলস্য পরিত্যাগ করে সর্বদ্রষ্টা, ন্যায়াধীশ পরমাত্মা এবং পালনযোগ্য তাঁর আজ্ঞা মেনে চলে, শুভ কর্ম করে এবং অশুভ কর্মকে পরিত্যাগ করে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বিদ্যা ও সুশিক্ষা লাভ করে, উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা বীর্য বৃদ্ধি করে, অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করবে এবং যুক্ত আহার-বিহারের দ্বারা শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত করবে। যেমন যেমন মনুষ্য সুকর্মে চেষ্টা করে, সেরূপ পাপকর্ম থেকে তার বুদ্ধি নিবৃত্ত হতে থাকে। এর ফলস্বরূপ তার বিদ্যা, আয়ু ও সুশীলতা বৃদ্ধি পায়।

মহর্ষি দয়ানন্দ বলেছেন,
যারা এরূপে পরমেশ্বরের ওপর নির্ভর করে অলসভাবে বসে থাকে, তারা মহামূর্খ। কারণ পরমেশ্বর পুরুষার্থ করার যে আদেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তা লঙ্ঘন করে, সে কখনো সুখী হতে পারে না। যথা— **"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।** (যজু০ ৪০।২)" অর্থাৎ পরমেশ্বর আজ্ঞা দিচ্ছেন যে, মানুষ শতবর্ষ পর্যন্ত তথা আজীবন কর্ম করতে করতে জীবন-ধারণের ইচ্ছা করবে, কখনো অলস হবে না (**সত্যার্থ প্রকাশ, সপ্তম সমুল্লাস**)

বৈদিক কর্মের প্রধানতা— মনুষ্য এই সংসারে বৈদিক নিষ্কাম কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি) করতে করতেই শতবর্ষ জীবিত থাকার ইচ্ছা করবে। তাৎপর্য এই যে, মনুষ্য আলস্য পরিত্যাগ করে সর্বদ্রষ্টা, ন্যায়াধীশ পরমাত্মাকে ও পালনযোগ্য তাঁর আজ্ঞা মেনে শুভ কর্ম করে এবং অশুভ কর্মকে ত্যাগ করে, ব্রহ্মচর্য দ্বারা বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে, উপস্থেন্দ্রিয়ের (জননেন্দ্রিয়ের)

সংযম দ্বারা বীর্য বৃদ্ধি করে অল্পায়ুকে প্রতিহত করবে। উপযুক্ত আহার-বিহার দ্বারা শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত করবে। এভাবে বৈদিক (ধর্মযুক্ত) কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে মনুষ্য নিজের মনোরথ দ্বারা অবৈদিক (অধর্মযুক্ত) কর্মে লিপ্ত হয় না। মনুষ্য যখন বৈদিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন পাপকর্ম থেকে তার বুদ্ধি নিবৃত্ত হতে থাকে এবং তার বিদ্যা, আয়ু ও সুশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই বৈদিক কর্ম ছাড়া অন্য কোনো পথে মনুষ্য কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না॥২॥

যজুর্বেদ ৪০.১ শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, সংসারের ভোগ ত্যাগপূর্বক করা উচিত, নিজেকে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত করা অনুচিত। কারণ বিশ্বে যা কিছু আছে, তা মানুষের জন্য ঈশ্বরের দান, মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ঈশ্বরকে সবাইকে এই উপহার দিয়েছেন। তাই বলে এই সবকিছুকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা উচিত নয়। দানের ভাবনা, ত্যাগের ভাবনা নিয়ে ভোগ করা উচিত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, একজন মানুষ কর্ম করে যা লাভ করেছে, তা যদি অন্যদের দান করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়, তাহলে কেন সে কর্ম করবে? কেননা, কর্ম করা হয় প্রাপ্তির জন্য, হারানোর জন্য নয়। যদি সংসারে ত্যাগপূর্বক বাঁচতেই হয়, যদি সংসারে লিপ্ত না-ই হতে হয়, তাহলে সে কেন কর্ম করবে? কারণ কর্ম না করলে প্রাপ্তি হবে না, আর প্রাপ্তি না হলে লিপ্তও হতে হবে না। আর লিপ্ত না হলে নিজের জীবন ত্যাগপূর্ণ হবে। তাহলে কর্মের ত্যাগ কেন নয়? এর উত্তর হচ্ছে, উপনিষদ্ ত্যাগের উপদেশ দিয়েছে, কিন্তু কর্মকে ত্যাগ করার উপদেশ দেয়নি। এ কথাকে বোঝার জন্য কিছু বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন—

(ক) **কর্ম কখনো ত্যাগ করা যায় না—** প্রথমত এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে, একজন মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে কর্ম ছাড়া বাঁচতে পারবে না। কর্ম হলো সৃষ্টির প্রাণ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগতের সর্বত্রই কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। উদ্ভিদ বেড়ে ওঠছে, ফুল ফুটছে, ফুলের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ফল পরিপক্ব হচ্ছে, ছোট ছোট পিপীলিকা পর্যন্ত তাদের খাবার সংগ্রহ করছে। অর্থাৎ ছোট-বড় প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তা মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটছে। মানুষও প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ, তাই সে কর্মকে ত্যাগ করতে পারে না। আর কর্ম হচ্ছে প্রত্যেক জীবের স্বভাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— **"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥** (গীতা ৩।৫)" অর্থাৎ "কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করতে পারে না। কারণ সকলেই প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অস্বতন্ত্ররূপে কর্ম করতে বাধ্য হয়।" এজন্য কর্ম করতেই হবে, কর্ম করেই বাঁচতে হবে। কেউই কর্ম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না, কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। তাই উপনিষদ্ বলছে— **"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ"** = মানুষ কর্ম করেই বেঁচে থাকার ইচ্ছা করবে। কারণ কর্ম না করে বেঁচে থাকা অসম্ভব। একটি প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য আছে, যথা— **"আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ। নাস্তি উদ্যমসমো বন্ধুঃ যং কৃত্বা নাবসীদতি॥"** অর্থাৎ মনুষ্য শরীরে অবস্থিত 'আলস্য' এক বড় শত্রু। অন্যান্য শত্রু তো আমাদের শরীরের বাইরে থাকে, আমাদের থেকে পৃথক থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরেই অনেক বড় একটি শত্রু আছে, যার নাম 'আলস্য'। সেই সাথে আরও বলা হয়েছে, **"নাস্তি উদ্যমসমো বন্ধুঃ"** অর্থাৎ উদ্যম = পুরুষার্থের সমান আমাদের কোনো মিত্র নেই। যারা পুরুষার্থ না করে কেবল ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে অলসভাবে বসে থাকে, তারা জীবনে সফল হতে পারে না।

(খ) **যদি কর্ম করেই বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে কীভাবে কর্ম করতে হবে—** উপনিষদ্ বলেছে, যতদিন কোনো মানুষ বাঁচতে চায়, ততদিন পর্যন্ত তাকে কর্ম করতেই হবে। আমাদের হাতে শুধু কর্মই আছে, সেটি শুভ হোক কিংবা অশুভ। অশুভ কর্ম করলে অশুভ ফলই লাভ হয়; তাই অশুভ কর্ম করার অনুপ্রেরণা বেদ ও উপনিষদ্ থেকে পাওয়া যায় না। কর্ম যদি করতেই

হয়, তবে শুভ কর্ম করুন। আর সেই কর্ম হচ্ছে, **'বেদোক্ত নিষ্কাম কর্ম'** যা নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধন করে। শ্রুতিতে **'এবং'** শব্দটি অবধারণার্থে এসেছে, যা কর্মকে নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করতে বোধ করায়। এখন আমাদের জানা উচিত এই নিষ্কাম কর্ম ও সকাম কর্ম কী? কর্ম করা আলাদা বিষয় এবং সকাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম এগুলোর বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া আলাদা বিষয়। সকাম কর্ম হচ্ছে, যে কর্মের মাধ্যমে আমরা সাংসারিক সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ সাংসারিক ভৌতিক পদার্থ থেকে সুখ প্রাপ্তির অভিলাষী হয়ে কর্ম করাকে **সকাম কর্ম** বলা হয়। তা ধন হোক, অথবা সম্মান; পুত্র-পরিবার হোক, অথবা পদ-প্রতিষ্ঠা, যাই হোক না কেন, এদের মাধ্যমেই যদি আমাদের সুখ লাভের ইচ্ছা থাকে, তা-ই সকাম কর্ম। এর বিপরীতে যদি আমরা ফলের চিন্তা না করে, শুধু ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং তাঁর বেদোক্ত আজ্ঞা পালনের জন্য কর্ম করি, তখন সেই কর্মকে **নিষ্কাম কর্ম** বলা হয়। আমরা যে কর্ম করি, সেই কর্ম সকাম কর্মও হতে পারে, আবার নিষ্কাম কর্মও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি সৎসঙ্গ ভবনে, যজ্ঞশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, আপনার মনে যদি এমন ভাবনা থাকে, "আমি এই কক্ষ পরিষ্কার করছি, এখানে লোকজন আসবে, বসবে, তারা আনন্দিত হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে তাদের চিত্ত প্রসন্ন হবে।" তাদের প্রসন্ন করার জন্য আপনি মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। আপনার এই কর্ম নিষ্কাম কর্মের আওতাভুক্ত। এই কর্মই সকাম হয়ে যাবে, যদি আপনি মনে চিন্তা করেন, "আমাকে দেখে লোকেরা প্রশংসা করুক। তারা বলুক যে, আমি অনেক ভালো কাজ করেছি।" এই ভাবনা মনে আসা মাত্রই ওই কর্ম সকাম কর্মে পরিণত হয়ে যায়। একই কর্ম নিষ্কাম হতে পারে, যখন আমরা এর বিনিময়ে অন্যের থেকে কোনো কিছুর আশা না রাখি, মোক্ষ কামনা করি, বিবেক-বুদ্ধি কামনা করি। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে, "আমি এত সেবা করছি, এত পরোপকার করছি, এর বিনিময়ে লোকেরা আমাকে সম্মান করুক, আমার এই উপলব্ধি হয়ে যাক, আমি যেন এই পদ প্রাপ্ত হই", তবে এসব সকাম কর্ম বলে গণ্য হবে। ঈশ্বর আদেশ করেছেন— **"কুর্বন্-এব-ইহ কর্মাণি"** = হে মনুষ্য! তোমরা সেবা, দান, পরোপকার, অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম করবে। আমরা ঈশ্বরের এই আদেশ মেনে পরোপকার, সেবামূলক কার্য করলে, তা নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এই কর্মকেই যদি আমরা কোনো সাংসারিক বিষয় ভাবনায় সম্পাদন করি এবং পরিণামে ধন, মান, যশ ইত্যাদি পেতে ইচ্ছা পোষণ করি, তবে তা সকাম কর্মে পর্যবসিত হবে। এখন আপনি বলতে পারেন, কোনো ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম করে, তারও তো খাওয়ার জন্য অন্ন, পরিধানের জন্য বস্ত্র, বাসের জন্য গৃহ প্রয়োজন; সে এসব কামনা করবে না কি করবে না? কামনা করা মাত্র কর্ম সকাম অথবা কামনা পরিত্যাগ করা মাত্রই কর্ম নিষ্কাম হয়ে যায়, এমন কোনো কথা নেই। কর্মের সঙ্গে আমাদের ভাবনা সম্পৃক্ত হতে হয়। আমার ক্ষুধা লেগেছে, অন্যের কাছে খাদ্যদ্রব্য চাইলাম, তো এটি সকাম কর্ম হয়ে গেল? না। কিন্তু যখন আমি বলব "আমি আপনাকে পাঠদান করেছি, এর বিনিময়ে আমাকে কিছু খেতে দিন" তখন তা সকাম কর্ম হবে। আমি আপনাকে পড়িয়েছি, তাই আপনার কাছে খাদ্য চাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, এখন আমার প্রতি আপনারও কিছু কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু আপনি তা পালন করেননি— যা এ ধরনের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত, তা সকাম কর্ম। ভোজনের জন্য খাদ্যদ্রব্য চাওয়ার অধিকার ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরও রয়েছে। নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো ধার্মিক ব্যক্তির নিকট খাদ্য চাওয়া দোষাবহ নয়।

আপনি যখন কর্ম করবেন তখন পরীক্ষা করবেন যে, "আমি এই কর্ম আবেগের সাথে করছি? না কি অনিচ্ছাকৃতভাবে?" আপনি যে কর্মটি করছেন, তা নিষ্কাম কি না সেটি বোঝার মাপকাঠি হলো— এর মধ্যে ত্যাগের ভাবনা আছে কি না, এই কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন কি না। কেননা, সংসারের সকল বিবাদের কারণ 'আসক্তি'। একজন ব্যক্তি যত বেশি আসক্তি ও মোহে আবদ্ধ হয়, ততই সে তার স্বত্ব হারিয়ে ফেলে। কর্মের ফল তো ঈশ্বরের ন্যায়-ব্যবস্থা দ্বারা অবশ্যই লাভ করবে, তাহলে এই ফলের চিন্তা করে শ্রান্ত হওয়া বৃথা। এজন্য মানুষের উচিত, সদা নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত থাকা। যদি আপনি

কাউকে দান করেন, তাহলে তা কর্তব্য ভাবনা দ্বারা যথাসাধ্য দান করবেন, এটিই নিষ্কামতা। কিন্তু যদি দান করার পর তার ফলস্বরূপ নিজের প্রশংসা, খ্যাতি, সংবাদপত্রে নাম, সমাজে উঁচু আসন লাভের ইচ্ছা করেন, তাহলেই কর্মে সকামতা চলে আসে। সকামতা আসার কারণে ব্যক্তি তার কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কর্মফলে আসক্ত হওয়ার পরিণামস্বরূপ তিনি অধিক থেকে অধিক স্নেহ-সম্মান, যশ-কীর্তি প্রভৃতি পেতে চান। যদি তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী দান গ্রহীতাদের থেকে সেগুলো না পান, তাহলে তাদের প্রতি ক্রোধ ও অবহেলা করতে শুরু করেন, ভবিষ্যতে তাদের উপকার করা থেকে বিরত থাকেন।

এজন্য মানবজাতির প্রতি বেদের আদেশ হচ্ছে— মনুষ্য নিজের কৃতকর্মের ফল প্রভুকে সমর্পণ করে, সদা কর্তব্য-ভাব দ্বারা ধর্মযুক্ত কর্ম করবে। কর্ম করতে কখনো প্রমাদ করবে না, কখনো আলস্য করবে না।

(গ) **নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে শত বছর বেঁচে থাকার সংকল্প করবে—** সবাই বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না। বৃদ্ধ হওয়ার পরও জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, অসুস্থ হয়েও মানুষ বাঁচতে চায়। যখন বেঁচে থাকার ইচ্ছা এত প্রবল, তখন বাঁচতে হলে, একশ বছর বেঁচে থাকুন। যজুর্বেদে (৩৬।২৪) বলা হয়েছে— **"জীবেম শরদঃ শতম্"**; ঈশোপনিষদ্ বলেছে— **"জিজীবিষেৎ শতম্"**। একজন কর্মযোগীর মৃত্যু হলো একটি পাকা ফলের মতো, যা নিজেই জীবনের সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করে মাটিতে পতিত হয়। এই ধরনের মানুষ মৃত্যুবরণ করেন না, তাদের জীবন সম্পূর্ণ হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা বলেন, **"Soldiers never die, they whither away."** অর্থাৎ সৈনিকরা কখনো মারা যায় না, তারা দূরে কোথাও চলে যায়। অনুরূপভাবে, একশো বছর বয়সে মৃত্যু হওয়া মানে জীবনের পূর্ণ রস উপভোগের পর পরিপক্ক হয়ে মৃত্যু। উপর্যুক্ত শ্রুতির লক্ষ্য, এই ধরনের জীবন যেন প্রত্যেক মানুষ লাভ করতে পারে। বৈদিক আদর্শ হলো এমন একটি জীবন অতিবাহিত করা, যার মধ্যে কোনো ব্যক্তি যতটা সম্ভব বাঁচতে পারে এবং ধর্মযুক্ত কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে পারে। কেননা, যখন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, তখন সবাই যেন বলতে পারে যে, তাঁর জীবন ছিল এক আদর্শ কর্মযোগীর জীবন। তিনি যে কর্ম করেছেন, তা নিষ্কামভাবে, নির্লিপ্তভাবে এবং ত্যাগের ভাব দ্বারা করেছেন। যারা এইরকম জীবন যাপন করেন, তাদের জন্য এই উপনিষদ বলছে— **"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম করার সময় ত্যাগের ভাব দ্বারা কর্ম সম্পাদন করেন, তিনি মোহ-মায়ার জাল থেকে মুক্তি লাভ করেন, তিনি কর্মের আবরণে লিপ্ত হন না। আর মানুষের এজন্যও নিরন্তর কর্ম করতে থাকা উচিত, যাতে সে নির্মল থাকতে পারে। কারণ যে নদীতে নিরন্তর গতি নেই, সতত প্রবাহ নেই, সেই নদীর জল মলিন হয়, পানের অযোগ্য হয়। তদ্রূপ এই মানব জীবনেও যদি গতি না থাকে, প্রবাহ না থাকে; তাহলে শরীর অলস, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যার ফলে মানুষ শীঘ্রই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। যদি তিনি কোনোভাবে বেঁচেও থাকেন, তাহলে সমাজের জন্য ভারস্বরূপ ও নিন্দার পাত্র হন। অকর্মা হওয়ার ফলে তার মন ও মস্তিষ্ক কুচিন্তার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। অতএব, নিরন্তর কর্ম করার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য নিহিত। এতে করে যেমন মানুষের নিজের লাভ হয়, তেমনি সমাজেরও লাভ হয়। তাঁর সর্বত্রই স্নেহ, সম্মান, যশ, কীর্তি প্রাপ্তি হয়।

(ঘ) **সংসারে থাকাকালীন সংসার থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব?—** এবার প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের পক্ষে সংসারে বাস করা এবং এর জাল থেকে মুক্ত থাকা অর্থাৎ কাদায় বসবাস করা এবং এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, এটি সম্ভব কি না? এর উত্তর হচ্ছে— হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। মনে করুন, কোনো একটি ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চে চলছে। অভিনেতা সেই ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করছেন। যখন তিনি অভিনয় করছেন, তখন তিনি কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে ঘটে যাওয়ার ঘটনার সাথে একাত্ম নন। এভাবে যতক্ষণ না আমরা বাইরের ঘটনাগুলোর সাথে আমাদের একত্ব প্রতিষ্ঠা করি, ততক্ষণ ঘটনা আলাদা, আমরা

আলাদা। যদি সেই ঐতিহাসিক চরিত্র (ব্যক্তি) সত্যিই উপস্থিত থাকতেন, তাহলে বাইরের ঘটনা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারতেন না। বাহ্য-বিষয়সমূহ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারাই জীবনের শিল্প। এজন্যই উপনিষদ বলেছে, কর্ম করার সময় কর্মে লিপ্ত না হওয়ার উপায়ই হলো **"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"** এর পথ। একেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, "**পদ্মপত্রমিবাম্ভসা;** (গীতা০ ৫।১০)" অর্থাৎ যেরূপ পদ্মপত্র জলে থাকলেও জলের দ্বারা সিক্ত হয় না, তদ্রূপ এই সংসারে বাস করেও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা ।

সন্দর্ভঃ উপনিষদ্ সংগ্রহ - ১

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ত্রৈতবাদ নিয়ে মূর্খের আস্ফালন নিবারণ

মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজীর জ্ঞানের ওপর প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস কিছু অবোধ শিশুগণ করছেন । তাদের ন্যূন জ্ঞান দ্বারা তারা বিবিধ অপ্রামাণিক ও সাম্প্রদায়িক পুস্তক দ্বারা এহেন সিদ্ধান্ত প্রচার করে আত্মতুষ্টিতে ভোগে । আমরা প্রতিবারই তাদের সমুচিত খণ্ডন করে থাকি কিন্তু তৎপশ্চাতও তারা একই বুলি আওড়ে যান এবং নতুন নতুন অপপ্রচার তৈরী করেন । অবশ্য অপপ্রচার করাটাই অতীব স্বাভাবিক কারণ শাস্ত্রে অনধিকারী ও মূর্খদের যতই যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হোক না কেন তারা তা বুঝতে অক্ষম । তবে এদের মূর্খ না বলে অসম্পূর্ণ পাঠক কিংবা স্বল্প পড়ুয়া জ্ঞানপাপী বলাই শ্রেয় ।

ত্রৈতবাদ হচ্ছে একটি বেদভিত্তিক দর্শন । এটা কোনো কপলোকল্পিত দর্শন নয় , সম্পূর্ণ বেদাদি শাস্ত্রের আঁধারেই প্রতিষ্ঠিত । ত্রৈতবাদ বাস্তবিকতা , বুদ্ধিগ্রাহ্যতা , সত্য , সম্ভাব্যতা এবং বৈজ্ঞানিক যথার্থ আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই দর্শন অনুসারে , পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতি– এই তিনটি সত্তা অনাদি , নিত্য ও পৃথক । এদের মধ্যে পরমাত্মা এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ , প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং জীবাত্মা সাধারণ কারণ । এই দর্শন অনুসারে , পরমাত্মা এক , অদ্বিতীয় , চেতন , সর্বজ্ঞ , সর্বব্যাপী , আনন্দময় , একরস , বিকারশূন্য । অপরদিকে জীবাত্মা বহু , চেতন , একদেশী , অল্পজ্ঞ । আর প্রকৃতি অচেতন , সর্বব্যাপী নয় ।

✅ব্রহ্ম , জীবাত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিন সত্তাই অজন্মা বা অনাদি , এটিই বেদের সিদ্ধান্ত । জীবাত্মা ও ব্রহ্মে কিছু ভেদ পরিলক্ষিত হয় । যথাঃ

(১) ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ তথা সর্বজ্ঞ , কোন কিছুই তাঁর নিকট অজ্ঞাত নয় । কিন্তু ব্রহ্ম সন্নিধানে জীবাত্মা অল্পজ্ঞ । [ঋ০ ৮।১০১।১৪, ১০।৭১।৩ ; যজু০ ৩২।১০]
(২) ঈশ্বর অনন্ত সামর্থ্যবান তথা সকলের স্বামী , কিন্তু জীবাত্মা অনীশ (অন্ + ঈশ) বা অসমর্থ । [ঋগ্বেদ: ১০।৯০।২ ঋগ্: ১০।৮২।৩, ৬।৯।৩; ঋগ্বেদ: ১।১৬৪।৬ , ১০।৭৯।৬]

(৩) ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা , সর্বব্যাপী , কিন্তু জীব তার জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ । [ঋ০ ৮।২৪।২১; অথর্ব০ ১০।৮।২৪ ; যজু০ ৪০।৮, ১৭।৭১]
(৪) ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরাত্মা , সর্বান্তর্যামী , কিন্তু জীব কেবল একটি নির্দিষ্ট শরীরের আত্মা । [ঋ০১।৮৯।৫, ৮।৬৪।৩, ১০।৮৯।১০, ১।৩২।১৫]
(৫) ঈশ্বর অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান , আপ্তকাম [নিত্যতৃপ্ত] কিন্তু জীব অল্প ঐশ্বর্য্যবান , অনাপ্তকাম [অতৃপ্ত] । [ঋ০ ১০।৮২।৭ ,অথর্ব:২।৩৬।৩ যজুর্বেদ:৩৮।২০]
(৬) ঈশ্বর ❝অনীড়❞ নামে খ্যাত শ্বেতা০ ৫.১৪ । ❝নীড়❞ শব্দের অর্থ গৃহ , বাসস্থান , দেহ , আশ্রয় । ঈশ্বর সর্বঘটে বিরাজমান হওয়ায় , তাঁর কোন গৃহ বা বাসস্থানের প্রয়োজন নাই । তিনি- যজুর্বেদ৪০.৮ ❝অকায়ম্❞ অর্থাৎ তিনি কদাপি সূক্ষ্ম , স্থূল , কারণ দেহধারণ করেন না । কিন্তু জীব দেহধারণ করে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় । [কঠ০ ১।২।১৮ , গীতা০ ২।২৭ , ছান্দোগ্য০ ৬।১১।৩ , মুণ্ডক০ ৩।১।৯ , শ্বেতাশ্বতর০৫।৯ , ন্যায়০৩।১।১-৭,১২)]
(৭) যেরূপ জীব প্রকৃতির ফল ভোগের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ হন , সেরূপ কার্য কারণাত্মক জগতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মা , এই প্রকৃতির ফল ভোগ করেন না এবং এর বন্ধনেও লিপ্ত হন না । [যর্জুবেদ০ ২৩।৫৬, অর্থববেদ০ ১০।৮।৩০,ঋ০ ১।১৬৪।৪৪ , শ্বেতা০ ৪।৫ ,]
(৮) আর প্রকৃতি তো সর্বদা জড় , অচেতন , অসমর্থ এবং জীবের ভোগ্য সম্পাদনে নিযুক্তা । ভোক্তা জীবের ভোগের সামগ্রীযুক্ত ❝প্রকৃতি❞ –যা কারো দ্বারা কখনো উৎপন্ন না হওয়ার কারণে , অনাদি । [গীতা০ ১৩।২০ , অথর্ববেদ০ ৯।১৪।২০ , সাংখ্যদর্শন০ ১।৬১ ,ঋ০ ৬।৪৭।১৮ ,শ্বেতা০ ৪।১০]

1️⃣▶️**আক্ষেপ:** ত্রৈতবাদ হচ্ছে একটি দার্শনিক মতবাদ। যে মতবাদ দয়ানন্দ কর্তৃক প্রচারিত। এই দর্শনের মূল কথা গুলো হলো, ব্রহ্ম(ঈশ্বর, পরমাত্মা); জীবাত্মা; জগৎ তিনটা সত্ত্বাই অনাদি। এই তিন সত্ত্বাই স্বাধীন। কেও কারো অধীন নয়। কেও কারো অংশ নয়, তিনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বা।

💢✅**প্রত্যুত্তরঃ** প্রথম ত্রৈতবাদ হচ্ছে একটি বেদভিত্তিক দার্শন । যদিওবা তাদের কপোলকল্পিত মতবাদের পিছনে কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেই । ❝কেও কারো অধীন নয়❞ নূন্যতম ত্রৈত বোঝার মত মস্তিষ্ক এদের নেই । এদের মস্তিষ্ক বিদ্বেষ ও কূটকাচালিতে পরিপূর্ণ । প্রথমত এরা কেউ মূলগ্রন্থ পড়েনা । ঘুঁটে কুড়ানির মতো এখান ওখান থেকে বিক্ষিপ্ত রসদ যোগাড় করে জনসম্মুখে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের নামে অর্বাচীনত্ব প্রদর্শন করতে অধিক পছন্দ করে । ❝মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি❞ - মক্ষিকা যেমন কেবল মানবদেহের ক্ষতই খুঁজে বেড়ায় , তেমনি এই জ্ঞানপাপী ঠগবাজরাও কেবল নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিকৃত তথ্যই খুঁজে বেড়ায় । ত্রৈত সিদ্ধান্তে জীব তার কর্মে স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরীয় ব্যবস্থায় পরতন্ত্র । এই সম্পর্কে মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীর তাঁর সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে বলেছেন - জীব নিজ কর্তব্য কর্মে স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থায় পরতন্ত্র । ❝স্বতন্ত্রঃ কর্তা❞ এটা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র । যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন তিনিই কর্তা । কোন হত্যাকারী কোন শস্ত্র বিশেষ দ্বারা কাউকে হত্যা করে ধরা পড়লে হত্যাকারী দণ্ডভোগ করে , শস্ত্র দণ্ডভোগ করেনা , সেইরূপ পরাধীন জীব পাপপুণ্যেরও ভাগী হবে না । অতএব জীব নিজ সামর্থ্য অনুসারে কর্ম করতে স্বতন্ত্র , কিন্তু কোন পাপকর্ম করলে সে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র হয়ে পাপের ফল ভোগ করে । সুতরাং কর্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র , কিন্তু পাপের দুঃখরূপ ফলভোগ বিষয়ে সে পরতন্ত্র । অংশ নিয়ে আক্ষেপ সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিরূদ্ধ । কেননা স্পষ্টতঃভাবে যজুর্বেদ ৪০.৮ বলা হয়েছে ❝অব্রণম❞ তিনি এক অখণ্ড সত্তা , অচ্ছেদ্য , অভেদ্য , নিষ্কম্প ও অচল ।

এজন্য তার মধ্যে কনো অংশ-অংশী ভাব নেই , কেননা তার মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্র থাকতে পারে না । পরমাত্মাকে ❝ অব্রণম ❞ বলার অর্থ হচ্ছে , তিনি অচ্ছেদ্য অর্থাৎ যাঁকে ছেদন করা যায় না । যে-কোনো বিশাল বস্তুকে আমরা ছেদন করতে পারি , ভেঙে চুরমার করতে পারি , দ্বিখণ্ডিত করতে পারি । কিন্তু পরমাত্মা হলেন ❝অব্রণম ❞ অর্থাৎ ছেদনযোগ্য নয় । পরমাত্মাকে খণ্ড-খণ্ড করা যায় না । অখণ্ড পরমাত্মার কোনো অংশ নেই । পরমাত্মা হলেন অংশী , জীবাত্মা তাঁর অংশ- এই ধারণাকেও এখানে নিষেধ করে বলা হয়েছে , কখনোই পরমাত্মার ভেদন বা ছেদন হয় না, তাঁর মধ্যে কোনো ব্যাবধান থাকে না , ছিদ্র থাকে না। এজন্যই তাঁকে ❝অব্রণম ❞ বলা হয়েছে । মূলত পদার্থের বিকৃতি , প্রতিস্থাপন , সংযোজন-বিয়োজন ঘটে কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ চেতন সত্তা সর্বব্যাপী পরমাত্মার কোনো সংযোজন , বিয়োজন , খণ্ডায়ন , অংশায়ন , বিকৃতি , ছেদ , প্রতিস্থাপন ঘটে না । অতঃ ঈশ্বরের অংশ মানা সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিরুদ্ধ এবং কল্পনাপ্রসূত ।

🚫একটা বিষয় ক্লিয়ার করা আবশ্যক -

- ১। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ ও বেদানুকূল গ্রন্থ-বচনসমূক পরতঃ প্রমাণ বিরোধ দর্শনে বেদ সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সর্বমান্য ।

  ২। সনাতন ধর্মের প্রতিটি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত সূত্র [১] অনুযায়ী নির্ণীত হবে । শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত যেখানে স্পষ্ট সেখানে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা কপোলকল্পিত মতামত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় ।

  ৩। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম যেই করুক না কেন তা তামসিক , নিষিদ্ধ ও গর্হিত বলে বিবেচিত হবে ।

  ৪। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত সবার থাকা অতীব স্বাভাবিক । কিন্তু ধর্মীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন মতামত গ্রহণীয় নয় ।

2️⃣▶️আক্ষেপ: ত্রৈতবাদে জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন সত্ত্বা। স্বাধীন সত্ত্বা। কেও কারো অধীন না, কেও কারো অংশ না। এবার জীবাত্মার সাপেক্ষে ব্রহ্ম ও জগৎ আলাদা সত্ত্বা। ব্রহ্মের সাপেক্ষে জীবাত্মা ও জগৎ আলাদা সত্ত্বা। আবার জগতের সাপেক্ষে ব্রহ্ম ও জীবাত্মা আলাদা সত্ত্বা।
এবার ব্রহ্ম যেহেতু জীবাত্মা ও জগতের বিচারে আলাদা একটা সত্ত্বা এবং যেহেতু জীবাত্মা ও জগৎ তার কোনো অংশ নয়, যেহেতু জীবাত্মা ও জগৎ স্বাধীন, সেহেতু জীবাত্মা আর জগতের উপর ব্রহ্মর কোনো অধিকার নাই। কারণ জগৎ ও জীবাত্মা ঈশ্বর/ব্রহ্ম বহির্ভূত সত্ত্বা। অধিকার তখনই আসবে যখন কোনো কিছু কারো অধীনে হয়। যেহেতু জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্ম অধীন নয়, ব্রহ্মাংশও নয় সেহেতু জীবাত্মা ও জগতের উপর ব্রহ্মের কোনো অধিকার নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম কখনোই জীবাত্মাকে জগতের সাথে মিশিয়ে জীবকে সুখ দুঃখ দানের অধিকার রাখে না।
এখানে হয়তো কেও বলতে পারে ঈশ্বর ন্যায় বিচারক তাই সে জীবাত্মাকে তার কর্মফল দান করেন।
কিন্তু ঈশ্বরের সেই অধিকারও নাই। কারণ জীবাত্মা স্বাধীন সত্ত্বা। জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ না। সুতরাং জীবাত্মাকে জগতে প্রেরণ করে জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করালে ঈশ্বর অবশ্যই অনধিকার চর্চা করছে বলতে হবে। কারণ জীবাত্মা ও জগৎ তার অংশও না তার অধীনও না, ব্রহ্মের কোনো অধিকার নাই জীবাত্মা ও জগতের উপর হস্তক্ষেপ করার।

তারপরও ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেই যাচ্ছেন, জীবাত্মাকে জগতের সাথে জড়িয়ে সুখ দুঃখ দিচ্ছেন। এটা ঈশ্বরের অনধিকার চর্চা। এমন অনধিকার চর্চাকারী ঈশ্বর কদাপি ন্যায়কারী হতে পারে না।
ঈশ্বরের এমন করার পিছনে কারণ হিসেবে দুটো বিষয় থাকতে পরে :-
১. ত্রৈতবাদের ঈশ্বর/ব্রহ্মকে এটা করতেই হয়। না করে থাকতে পারেন না। তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জগৎ কোনো নিয়মে আবদ্ধ। এখন সেই নিয়মটাকেই সুপ্রিম মূল ঈশ্বর / ব্রহ্ম মানতে হবে। তাহলে পূর্বোক্ত ত্রৈতবাদের ব্রহ্ম / ঈশ্বর মূলত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নন। এই নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এবং এই নিয়মে আবদ্ধ জীবাত্মা, জগৎ ও পূর্বোক্ত ব্রহ্ম এই নিয়মরূপী ব্রহ্মের অংশ ও অধীন।
২. এই তিনটি সত্ত্বার মধ্যে ঈশ্বর/ ব্রহ্ম সত্ত্বাটি অধিকতর শক্তিমান তাই সে শক্তিমান হওয়ায় বাকি দুই তুলনামূলক দূর্বল সত্ত্বার উপর জুলুম করছেন। দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচার আরকি। তো সে হিসেবে ঈশ্বর অন্যায় কারী, অত্যাচারী একটা সত্ত্বা।

💢✅**প্রত্যুত্তরঃ** পরমেশ্বরে অনন্ত গুণ বিদ্যমান , অতএব গুণের ক্ষেত্রে তিনি সবার থেকে বড় । প্রকৃতিতে বিকার আসে , জীবও বদ্ধ-মুক্ত দশা লাভ করে , কিন্তু পরমেশ্বর সদা নির্বিকার- একরসে থাকেন । জীবের শরীর এবং প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনশীল । রূপান্তরের কারণে তারা নিত্য নতুন অবস্থায় আসার কারণে তারা পরমেশ্বর থেকে ছোট । প্রকৃতি সর্বদা অজ্ঞ , কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ । জীব প্রকৃতির ন্যায় অজ্ঞ নয় , আর না পরমেশ্বরের ন্যায় সর্বজ্ঞ , বরং অল্পজ্ঞ । অতঃ মধ্যবর্তী হওয়ার কারণে জীব মধ্যমস্থানীয় । প্রকৃতি জড় , অজ্ঞ এবং চেতনের অধীনস্থ ভোগ্য-রূপ হওয়ার কারণে সবার থেকে ছোট । ঈশ্বর ন্যায়কারী , তিনি সর্বজীবের কর্মফল ন্যায়পূর্বক দিয়ে থাকেন , এটা আর্ষ ত্রৈতবাদের সিদ্ধান্ত । কিন্তু ভ্রান্তবাদী মহাশয় পূর্ব কথার অনুরূপে বলছেন , জীব কর্মে স্বাধীন হওয়ায় ও সত্ত্বায় সতন্ত্র হওয়ায় ঈশ্বর নাকি জীবের ন্যায়বিচারও করার অধিকার রাখেন না । প্রজা বলছেন , হে রাজা আমি মানুষ হিসেবে স্বাধীন , আমি তোমা হতে উৎপন্ন হইনি । তাই তুমি আমার ন্যায়বিচার করতে পারো না । হে রাজন তুমি আমার বিচার করে , অনধিকার চর্চা করছো । কিন্তু মজার বিষয় কোনো অতি মূর্খ প্রজাও এমন করবেন না । বেদান্তিগণের দৃষ্টি অন্ধ পুরুষের ন্যায় অন্বয়ের দিকে পড়ে ব্যতিরেক ভাব হতে পৃথক হয়ে বিরুদ্ধ হয়েছে । মূর্খগণ স্বভাব ও গুণ কি তা সম্পর্কে অবগত নয় । তাদের আক্ষেপ ত্রৈতবাদে ঈশ্বর নিয়মে আবদ্ধ । পরন্তঃ তা নিতান্তই ভ্রান্ত । ন্যায় করা ঈশ্বরের একটি গুণ । স্বভাবের কার্য , নিয়মের হেতু অথবা কর্তব্যবশতঃ সম্পাদন হয় না । অগ্নি হতে সর্বদাই তাপ নির্গত হবে , এটাই তার গুণ/স্বভাব , এর জন্য কর্তব্যবোধের প্রয়োজন হতো না । ন্যায় করা ঈশ্বরের গুণ-স্বভাব । ন্যায়ের জন্য তিনি কারোর উপর বাধিত নন । ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান এ কথা সর্বমান্য । কিন্তু সর্বশক্তিমান হলেই যে অত্যাচারী হতে হবে এর কোনো ভিত্তিই নেই । ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এমনটা কখনোই হতে পারে না । কারণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমানের পাশাপাশি ন্যায়কারীও বটে । পাঠকগণের নিকট প্রশ্ন , আচার্য শিষ্যের শাসন করলে তা জুলুম করা হয় ? ন্যায়কারী পরমেশ্বর জীবের কর্মফল জীবকে দিলে সেটাকে জুলুম বলা যায় ? আর এখানে একটা কথা প্রকৃতি তো অচেতন , তবে তার উপর জুলুমই বা কীভাবে হতে পারে ?

পরমাত্মা সর্বজ্ঞানী , তিনি তার শিষ্যস্বরূপ জীবাত্মার ভোগের জন্য এই জগতকে সৃষ্টি করেন । এটা কী জীবাত্মার উপর জুলুম করা ? কদাপি নয় । পরমাত্মা এই জগতের সৃষ্টি করেন জীবাত্মার হিতের জন্য । জীবাত্মার ভোগের জন্য । জীবাত্মাকে অহেতুক শাস্তি দেওয়া ঈশ্বরের কর্ম নয় । শিক্ষক যেমন ছাত্রের হিতের জন্য তিরষ্কার করেন , তেমনি ঈশ্বর আমাদের হিতের জন্য আমাদের কর্মফল প্রদান করেন । আমরা এই ফল হতেই শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে শুভ কর্ম করি

। তারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ ভাবে এবং মনে করে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি হয়েছে এটা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেটা সুধী ও স্বাধ্যায় পাঠক মাত্রেই অবগত ।

“সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ” ঋ০ ১০।১৯০।৩ প্রবাহ দ্বারা অনাদি এ সৃষ্টির রচনা প্রত্যেক কল্পেই পূর্ববৎ সংঘটিত হয় । এই ক্রম অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকে । “ন হি প্রয়োজনমনভিসন্ধায় প্রেক্ষাবন্ত প্রবর্তন্তে” - বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্তি হয় না । প্রয়োজনের লক্ষণ হলো “য়মর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎপ্রয়োজনম্” অর্থাৎ , যেই অর্থকে লক্ষ্য করে কেউ প্রবৃত্ত হয় , সেই অর্থকে প্রয়োজন বলা হয় । একইভাবে , পরমেশ্বর কর্তৃক বার-বার সৃষ্টি রচনার পেছনেও কোনো না কোনো প্রয়োজন অবশ্যই আছে । সেই প্রয়োজন “ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ” যোগ০ ২।১৮ এই সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে । ভোগ ও অপবর্গের এই নির্দেশ “অকাম' ও 'নিত্যমুক্ত ” পরমেশ্বরের জন্য হতে পারে না । এতে স্পষ্ট হয় যে , জীবের উদ্দেশ্যেই বার-বার সৃষ্টির রচনা করা হয় । [গীতা ২.১৭-২৮] পড়লেই স্পষ্টতঃভাবে প্রমাণিত যে “হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥”-কঠ০১।২।১৮-১৯ অর্থাৎ হত্যাকারী যদি মনে করে সে আত্মাকে হত্যা করবে এবং যে নিহত হবে সে যদি মনে করে আত্মা নিহত হয়েছে , তবে সেই দুজনের কেউই আত্মার স্বরূপ জানে না । কারণ , আত্মা হত্যাও করে না , নিহতও হয় না । এই আত্মার জন্ম-মৃত্যু হয় না ; এই আত্মা কোনো কিছু হওয়ার জন্য হয়নি , কোনো কিছু এর থেকেও হয়নি । এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য , শাশ্বত, পুরাণ বৃহদারণ্যক: ৪।৪।২০ শরীর নিহত হলেও আত্মা নিহত হয় না ।

যদি সৃষ্টি প্রবাহ দ্বারা অনাদি হয় , তাহলে জীবাত্মার মুক্তিও প্রবাহ দ্বারা অনাদি বলে স্বীকার করতে হবে । জীবগণের মোক্ষে গমন করে আবর্তনের মাধ্যমেই এটি হওয়া সম্ভব । অনেকে বলতে পারেন- “মুক্তি থেকে ফিরে না আসলেও সংসারের উচ্ছেদ ঘটবে না” । কারণ আবশ্যকতা-অনুসারে নতুন জীবাত্মাগণের উৎপত্তি হতে থাকবে । কিন্তু তা কখনো হতে পারে না। কারণ তখন জীবাত্মা অনিত্য হয়ে পড়বে । পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি যা চান , তা-ই করতে পারেন । সর্বশক্তিমানের তাৎপর্য এটুকুই যে , পরমেশ্বরকে তাঁর নিজ কার্য সম্পাদনে অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না । জীবগণের ভোগ ও অপবর্গের ব্যবস্থা করা পরমেশ্বরের কাজ , জীবাত্মাদের সৃষ্টি করা নয় । যদি “ দুর্জনতোষন্যায়” দ্বারাও পরমেশ্বর কর্তৃক জীবগণের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় । তাহলে এই জীবগণের অনিত্য হওয়া স্বতসিদ্ধ । কারণ যার উৎপত্তি হয় , তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । আর যখন জীবাত্মাই থাকলো না , তাহলে তার মুক্তি নিত্য হবে কীভাবে ? তখন জীবগণের উৎপত্তির কারণ কী হবে ? জীবের না থাকার ফলে কেবল দুটি পদার্থ অবশিষ্ট রয়েছে- ঈশ্বর ও প্রকৃতি । সর্বব্যাপক , সর্বজ্ঞ , সর্বশক্তিমান এবং নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর থেকে একদেশী , অল্পজ্ঞ , অল্পশক্তিমান এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ জীবের উৎপত্তির কল্পনা কীভাবে করা সম্ভব ? একইভাবে জড় প্রকৃতি থেকে চেতন তত্ত্ব জীবের উৎপত্তিও অসম্ভব । অতএব , অবিনাশী জীবাত্মার উৎপত্তি সম্ভব নয় । মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্তিতেই এসব সমস্যার সমাধান নিহিত আছে ।

শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাহবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ । মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ঋ০ ৩।৫৫।৬

এই মন্ত্রে মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে- “দ্বিমাতা বৎস একঃ” এখানে “বৎস” পদ জীবের বাচক । ব্রহ্ম ও প্রকৃতি তার দুই মাতা , যারা তাকে ধারণ করে এবং তার পালন-পোষণ করেন । এইপ্রকার এই মন্ত্রেও ঈশ্বর , জীব ও প্রকৃতি- তিন সত্তার কাব্যাত্মক শৈলীতে বর্ণনা রয়েছে ।

[দ্বিমাতৃতয়া পরমাত্মপ্রকৃৎয়োনির্দেশঃ তদ্ভিন্না বৎসো জীব ইতি শ্রতম্। পরমাত্মপক্ষে- ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। ঋ০ ৮।৯৮।১১; গর্ভং মাতা সুধিতম্। ঋ০ ১০। ২৭।১৬; প্রকৃতিপক্ষে- মাতা প্রকৃত্যাখ্যা- সায়ণঃ; মাতা প্রকৃতিঃ ইত্যুদ্গীথঃ। "অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা” (ঋ০ ৩।৫৫।৪) ইতি অস্মিন্ মন্ত্রে অন্যা ব্রহ্মণো ভিন্না প্রকৃতিঃ। 'অন্যা ভিন্না ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ'- দয়ানন্দঃ।]

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হোকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা । অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা এয়ং য়দা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ শ্বেতা০ ১।৯
পদার্থঃ (জ্ঞাজ্ঞৌ) সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম এবং অল্পজ্ঞ জীব (দ্বৌ) এই দুই (অজৌ) জন্মরহিত বা অনাদি , এদের মধ্যে (ঈশানীশৌ) ব্রহ্ম সামর্থ্যবান এবং জীব অসমর্থ , তৃতীয় (হি) নিশ্চিতরূপে একা) এক (অজা) জন্মরহিত [অনাদি প্রকৃতি] যা (ভোতৃভাোগ্যার্থযুক্তা) ভোক্তা জীবের ভোগ্য র্থে যুক্তা অর্থাৎ ভোগ্য সিদ্ধিতে তৎপর (চ) এবং সেই (অনন্তঃ) অনন্ত [অসীম] (আত্মা) রমাত্মা (বিশ্বরূপঃ) বিশ্বরূপ [সমগ্র বিশ্বই যাঁর রূপ] (হি) নিশ্চিতরূপে (অকর্তা) তিনি কর্ম ও র্মফলের বন্ধনে লিপ্ত হন না (য়দা) যখন মানুষ (এয়ম) উক্ত তিন সত্তাকে [ব্রহ্ম, জীব ও কৃতিকে] (বিন্দতে) সম্যক্ জানেন , তখন তিনি (এতৎ) এই (ব্রহ্মম্) ব্রহ্মকে [প্রাপ্ত হন] ।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং য়ো বিদধাতি কামান ॥ (কঠ০ ২।২।১৩)
ব্রহ্ম প্রকৃত্যাদি নিত্যপদার্থের মধ্যে নিত্য এবং চেতন জীবগণের মধ্যে চেতনস্বরূপ । তিনি এক এবং এই বিবিধরূপ সৃষ্টির রচনা করেন । এখানে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন প্রকৃত্যাদি নিত্যপদার্থ বং ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন চেতন জীবকে স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হয়েছে ।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো য়ে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ (কঠ০ ১।৩।১)
এই শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আলোর ন্যায় ভিন্ন-ভিন্ন মানা হয়েছে এবং এই উভয়কেই হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট বলা হয়েছে বেদান্ত-দর্শনের “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ” ব্র০ সূ০ ১।২।১১ এই সূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতার প্রতিপাদন স্পষ্টভাবে করা হয়েছে ।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং য়ৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥
এই মন্ত্রে “'ঈশা” পদ দ্বারা পরমাত্মা , 'জগৎ' পদ দ্বারা চরাচর সংসার এবং “ভুঞ্জীথাঃ” পদ দ্বারা ভোগকারী জীবের বর্ণনা হওয়ার কারণে ত্রৈতবাদ স্পষ্ট । কারণ পরমাত্মা তো স্বয়ং ভোগ করেন না এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন যদি প্রকৃত্যাদির কোনো সত্তাই না থাকতো, তাহলে কাকে আচ্ছাদন করছেন ? এর কোনো সমাধান না হওয়ার কারণে প্রকৃতির এবং ভোক্তা জীবের এতে বর্ণনা স্পষ্ট ।

সমূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজা সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ (ছান্দো০ উ০ ৬।৮।৪)
অর্থাৎ সত্যস্বরূপ প্রকৃতি , জগতের মূলাধার এবং স্থিতির কারণ । এখানে মূল-প্রকৃতিকে “সৎ” বলা হয়েছে , যার কখনো অভাব হয় না । এই সমস্ত সংসার প্রকৃতির বিকার হওয়ার কারণে প্রলয়ের পর প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায় ।

য়তো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। য়েন জাতানি জীবন্তি ।
য়ৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব । তদ্ব্রহ্মেতি ॥ তৈত্তি০ উ০ ৩।১।১
এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে বেদান্তদর্শনের “জন্মাদ্যস্য য়তঃ” এই সূত্রে যে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হয়েছে , সেটিই এ উপনিষদে বলা হয়েছে। সেই পরব্রহ্ম এই সৃষ্টির উৎপত্তি , স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । তিনি জগতের উপাদান-কারণ নন বরং নিমিত্ত-কারণনা । যেমন ঘটের নির্মাণে কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ এবং মৃত্তিকা উপাদান-কারণ , তেমনি সৃষ্টি-রচনাতে ব্রহ্ম নিমিত্ত- কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান-কারণ । ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান-কারণ এজন্য নয় , কারণ সৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্মের জ্ঞানাদি গুণ নেই । কেননা , উপাদান-কারণের গুণ কার্যে অবশ্যই আসতো । এই শ্রুতিতে বলা হয়েছে , সেই ব্রহ্ম সকল ভূতগণকে রচনা করেন , এদের জীবিত রাখেন এবং প্রলয়কালে কারণরূপে লীন করেন ।

যোগদর্শনে (১।৩) বলা হয়েছে- “তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্॥ ” অর্থাৎ সেই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপে থাকে । এই সূত্রে “দুষ্টু” শব্দটি পরমাত্মারও বাচক । এটি সত্য যে , জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দ্রষ্টা । কিন্তু “ মুখ্যামুখ্যয়োমুখ্যে কায়সম্প্রত্যয়” এই নীতি অনুযায়ী মুখ্য দ্রষ্টা হলেন পরমেশ্বর । জীবাত্মা আনন্দের আকাঙ্ক্ষী। একমাত্র পরমেশ্বরই আনন্দের উৎস- “রসো বৈ সঃ । রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” । (তৈত্তি০ উপ০ ২।৭।২)"। ঋগ্বেদে (৭।১১।১) বর্ণিত হয়েছে- “ন ঋতে ত্বদমৃতা মাদয়ন্তে ” = হে পরমেশ্বর! তোমাকে ছাড়া মুক্ত আত্মাগণ আনন্দিত হয় না । এমন অবস্থায় মুক্তাত্মা সেই আনন্দদাতা প্রভুর পরম-আনন্দ অনুভব করেন । এটিই পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার অর্থ । পরমাত্মাতে অবস্থান করার পরও জীবের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে । কারণ মুক্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মে লয় (বিলীন) হয় না । অবিদ্যা নাশ হওয়ার পর এবং কর্মের বন্ধন অর্থাৎ সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার পর জীবাত্মা সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে এমনভাবে অবস্থান করেন , ঠিক যেভাবে সমস্ত পদার্থ আকাশের স্থিত থাকে ।

ঔপচারিকভাবে বলা হয়েছে - “ য়ত্র নান্যৎ পশ্যতি” (ছান্দো০ উ০ ৭।২৪।১), “ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্ বিভক্তং য়ৎ পশ্যেৎ” (বৃহদা০ ৪।৩।২৩) এবং “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” (বৃহদা০ ৪।৪।৬) ইত্যাদি বাক্যের এটিই তাৎপর্য । এগুলো আনন্দানুভূতির আধিক্যেই অতিশয় শব্দে বলা বচনমাত্র । তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩। ৬।১) বলা হয়েছে, “ আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ” অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম , এরূপ জানবে । এ থেকে স্পষ্ট যে , ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ । “ অ◌ঁকা◌ুমো ধীরো◌ঁ অ◌ুমৃতঃ◌ঁ স্বয়ম্◌ুভূ রসে◌ঁন তৃ◌ুপ্তো ন ” অথর্ববেদ -১০।৮।৪৪

শুধু তাই নয় , জীব মুক্তিতে ব্রহ্মের সাথে লয় হয়ে যায় না , আর না জীব ব্রহ্মের সমরূপ হতে পারে । যেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ (আনন্দো ব্রহ্ম; তৈত্তি০ উ০) এবং তাঁকে লাভ করে জীবও আনন্দিত হন (রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি; তৈত্তি০ উ০ ২।৭।২), তাহলে তো উভয়ই এক হয়ে গেল ! এটি বলা যুক্তিযুক্ত নয় । কারণ শুধুমাত্র একটি গুণ বা কিছু গুণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে দুটি পদার্থ এক হয়ে যায় না । চিনি ও লবণ সাদা রঙের হওয়ায় এ দুটি পদার্থ কখনো এক হতে পারে না । শুধু পদার্থ হওয়ায় জল ও দুধকে এক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না । তত্ত্বজ্ঞান তখনই অর্জিত হয় ,

যখন সাধর্য্যের পাশাপাশি বৈধর্য্যের জ্ঞানও থাকে । ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হলো- ❝ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ❞ । (যোগ০ ১।২৪) অর্থাৎ ক্লেশ , কর্ম , বিপাক ও আশয় থেকে অসম্পৃক্ত (সম্বন্ধহীন) চেতন-তত্ত্ব বিশেষকে ঈশ্বর বলা হয় । অন্যদিকে ❝ইচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্॥❞ (ন্যায়০ ১।১।১০) = ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ (চিহ্ন) । ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই নিজস্ব গুণ রয়েছে । গুণসমূহ গুণীর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ গুণ তার গুণী থেকে আলাদা হতে পারে না । ঈশ্বরের গুণাবলি ঈশ্বরের মধ্যে এবং জীবের গুণাবলি জীবের মধ্যে সর্বদাই থাকবে। অতএব স্বীয় স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঈশ্বর জীবের মতো এবং জীব ঈশ্বরের মতো হতে পারে না । ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) বলা হয়েছে যে , জীবাত্মা কখনো নিজের স্বরূপ ত্যাগ করেন না । অতঃ তিনি যা করেন , তা ❝স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে❞ স্বীয় স্বরূপে স্থিত হয়ে করেন ।

❌মূর্খগণ দাবি করছে , জীবাত্মা ও জগৎ তার অংশও না তার অধীনও না, ব্রহ্মের কোনো অধিকার নাই জীবাত্মা ও জগতের উপর হস্তক্ষেপ করার।

✅এয়ঃ কেশিনঃ ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্ । বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥

ঋ০ ১।১৬৪।৪৪

পদার্থঃ(ত্রয়ঃ) তিন (কেশিনঃ) প্রকাশময় পদার্থ [কেশি কাশানাব্দা প্রকাশানাব্দা ; নিরুক্ত ১২।২৬] তুথা) নিয়মানুসারে (বি চক্ষতে) বিবিধ কার্য করে থাকে (এষাম্) এদের মধ্যে থেকে (একঃ) একটি (সংবৎসরে) বাসযোগ্য সংসারে , অথবা সৃষ্টিকালে (বপতে) বীজ বপন করে । (একঃ) একটি (শচীভিঃ) শক্তি , কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা (বিশ্বম্) বিশ্বকে (অভি চষ্টে) দুই দিক থেকে দেখেন । (একস্য)একটির (ধাজিঃ) বেগ তো (দদৃশে) দেখা যায়, কিন্তু (ন রূপম্) রূপ দেখা যায় না ।

এই মন্ত্রে জীবদের কর্মফল প্রদানের জন্য প্রকৃতিতে বীজ বপন অথবা কারণরূপ প্রকৃতিকে র্যরূপ দানের জন্য ঈশ্বরের , নিজের কর্ম দ্বারা শুভ-অশুভ দুই প্রকার ফলের ভোক্তা-রূপে জীবের এবং কার্যরূপে দৃশ্যমান হলেও সূক্ষ্ম হওয়ায় কারণরূপে অদৃশ্য প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে ।

প্রকৃতি জড় ও অচেতন । অচেতন হওয়ার কারণে প্রকৃতি স্বয়ং পরিবর্তিত হতে পারে না । যেরূপ মৃত্তিকাখণ্ড কারো কর্ম ব্যতীত স্বয়ং কলসীতে পরিণত হতে পারে না , কারণ মৃত্তিকাতে এমন ক্ষমতা নেই । সেরূপ প্রকৃতির মধ্যেও এমন ক্ষমতা বা শক্তি নেই , যে সে স্বয়ং জগতে পরিণত হবে । প্রকৃতি জীবাত্মার ভোগ্য হওয়ার কারণে জীবাত্মার দ্বারাও জগৎ নির্মাণ সম্ভব নয় । কারণ ভোক্তা নিজে ভোগ্য হতে পারেন না । সুতরাং তাদের আরেকটি সত্তার (ঈশ্বর) উপর নির্ভরশীল হতেই হবে ।

অচেতন প্রকৃতি জীব এবং জগতের মূল কারণ হলে তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের যথাযথ সমন্বয় হতে পারে না । প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোন কার্যটি পুরুষার্থের পক্ষে সহায়ক হবে , কোন কার্যটি তদনুকূল হবে না , অচেতন প্রকৃতির পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । জীবাত্মাও অল্পজ্ঞ ও একদেশী বলে জগৎ নির্মানের কার্য তার দ্বারা সম্ভব নয় । সুতরাং জগৎ নির্মানের জন্য জীবাত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল ।

প্রকৃতি-পুরুষের (জীবাত্মা) সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি এবং বিয়োগের ফলে জগতের বিনাশ হয় । কিন্তু প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী । উদাহরণস্বরূপ- প্রকৃতি অচেতন , আর পুরুষ সচেতন । প্রকৃতি এবং পুরুষ বিরুদ্ধধর্মী হওয়ার

কারণে তাদের সংযোগ বা বিয়োগ তাদের স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে না । সুতরাং সচেতন , সর্ব-শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সাহায্যে এই সংযোগ বা বিয়োগ সম্ভব হয়েছে এরূপ স্বীকার করতে হবে । অতএব জীবাত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল । জীবাত্মা চেতন হওয়ায় তার সান্নিধাস্থিত অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা হয়ে থাকে । জীবের জ্ঞান সাপেক্ষ , জীব একদেশী , পরতঃ প্রকাশ ও অল্প সামর্থ্য বিশিষ্ট হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না । জীবাত্মা যাদের সাহায্যে কার্য করবে , সেই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় , বুদ্ধি , অহংকার এমনকি স্থুল শরীর গঠন করার সামর্থ্য তার নেই । বুদ্ধি , ইন্দ্রিয় , শরীর লাভ করেও এই সূক্ষ্ম শরীর , সূক্ষ্ম ভূত , সূর্য্য , বায়ু , সমুদ্র , পর্বত , পৃথিবী ও পৃথিবীর গর্ভস্ত সূবর্ণাদি সৃষ্টি করা তো দূরের কথা এদের সমন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলেও যোগজ সামর্থ্যের প্রয়োজন । জীব নির্গুন, চৈতন্য স্বরূপ ও সহোজা অর্থাৎ , অপরের সাহায্যে তার প্রকাশ ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে থাকে । বুদ্ধির সাহায্যে আদি গুরু পরমাত্মা থেকে ক্রম পূর্বক বিদ্যালাভ করে সামর্থ্য অনুযায়ী স্থুল ভূতের উপর কিয়ৎ পরিমানে কর্তৃত্ব করতে সমর্থ হয়ে থাকে ।

সর্বদা কর্তার সাথেই কর্মের সম্বন্ধ হয় ও ক্রিয়াও সর্বদা কর্তার ওপরেই প্রযুক্ত হয় । উদাহরণস্বরূপ- আপনি কাউকে ছুরি দিয়ে হত্যা করলেন । এখানে হত্যার জন্য দায়ী আপনি , কারণ ছুরি জড় পদার্থ । ছুরি কাউকে হত্যা করতে পারে না , যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে চালনা করে । আর হত্যার সম্বন্ধও হন্তারকের উপরেই প্রযুক্ত হয় , অস্ত্রের ওপরে নয় । অর্থাৎ হত্যাকরী হিসেবে আপনার নামই প্রযুক্ত হবে , কারণ আপনি কর্তা । কেউই বলবে না যে ছুরি অমুককে হত্যা করেছে ।

ন তস্য কার্য়ং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । শ্বেতা০ ৬।৮
পরামাত্মা থেকে কোনো তদ্রূপ কার্য এবং তার করণ অর্থাৎ সাধকতম অন্য কিছু অপেক্ষিত নেই। তাঁর তুল্য অথবা তাঁর চেয়ে অধিক [মহান] কেউ নেই । তাঁর সর্বোত্তম শক্তি অর্থাৎ তাঁর মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞান , অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া আছে , তা স্বাভাবিক- এরূপ শোনা যায় । যদি পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হতেন , তাহলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করতে পারতেন না । এজন্য তিনি ❝বিভু❞ তথাপি চেতন হওয়ায় তাঁর মধ্যে ক্রিয়াও আছে । যেরূপ পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনাদি , তাঁর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করাও সেইরূপ অনাদি । ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের যেমন আরম্ভ ও অন্ত নাই , সেইরূপ তাঁহার কর্তব্য কর্মের আরম্ভ ও অন্ত নাই । চক্ষুর প্রয়োজন কি ? তুমি বলবে ❝দর্শন❞ । তাহলে সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বরে সৃষ্টিবিজ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার প্রয়োজন কি ? তুমি উত্তরে অন্য কিছুই বলতে পারবে না । আর জগৎ সৃষ্টি দ্বারাই পরমেশ্বরের ন্যায়শীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হতে পারে । তাঁর অনন্ত সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি , স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা দ্বারাই স্বার্থক হয়ে থাকে । যেরূপ নেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেরূপ জগৎ সৃষ্টি করে সমস্ত জীবকে অসংখ্য পদার্থ প্রদান পূর্বক পরোপকার করা ঈশ্বরের ❝ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ❞স্বাভাবিক গুণ ।

3 **আক্ষেপ:** ত্রৈতবাদ মতে জীবাত্মা নিরাকার। জীবাত্মা একাধিক, বহু সংখ্যক। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা অবস্থিত। এবার এখানে সমস্যা হচ্ছে কোনো কিছু নিরাকার হলে একাধিক হওয়া সম্ভব কিভাবে!?
জীবাত্মা যদি একাধিক হয় তাহলে বলতে হবে প্রতিটা জীনাত্মা আলাদা। একটা জীবাত্মা আরেকটা জীবাত্মা থেকে আলাদা। আলাদা বললে বলতে হবে অবশ্যই জীবাত্মার একটা সীমানা বা বাউন্ডারি আছে। নয়তো বাউন্ডারী না থাকলে আলাদা জীবত্মা বলা যায় না।

আরো ভালো করে বুঝতে দুটি জীবাত্মা নিয়ে চিন্তা করুন। এখন যদি বলা হয় দুইটি জীবাত্মা। তাহলে জীবাত্মা দুটি একটা আরেকটার থেকে পৃথক। একটা আত্মা আরেকটা থেকে আলাদা। আত্মা দুটির অবশ্যই বাউন্ডারি আছে নয়তো তারা আলাদা থাকতে পারে না। বাউন্ডারি না থাকলে আত্মা দুটি একত্রে মিশে যেত। সুতরাং অবশ্যই তাদের বাউন্ডারি আছে ।নয়তো বাউন্ডারী না থাকলে আলাদা জীবত্মা বলা যায় না।

আরো ভালো করে বুঝতে দুটি জীবাত্মা নিয়ে চিন্তা করুন। এখন যদি বলা হয় দুইটি জীবাত্মা। তাহলে জীবাত্মা দুটি একটা আরেকটার থেকে পৃথক। একটা আত্মা আরেকটা থেকে আলাদা। আত্মা দুটির অবশ্যই বাউন্ডারি আছে নয়তো তারা আলাদা থাকতে পারে না। বাউন্ডারি না থাকলে আত্মা দুটি একত্রে মিশে যেত। সুতরাং অবশ্যই তাদের বাউন্ডারি আছে তাই তারা মিশে একাকার হয়ে যায় না। যার বাউন্ডারি বা সীমানা আছে সেটা কখনোই নিরাকার না। আর কোনোকিছু নিরাকার হলে সেটাকে একটা দুইটা এভাবে গণনা করা অসম্ভব। যেমনঃ জলকে কেও বলে না একটা জল, বয়ুকে কেও বলে না একটা বায়ু, আলোকে কেও বলে না একটা আলো। সুতরাং নিরাকরকে কখনোই গণনা করা যায় না। আর নিরাকরের কোনো সীমনা বা বাউন্ডারিও থাকে না। আর দুই পাত্রে রাখা একই ধর্মীয় নিরাকার কোনো কিছু একত্র করলে তারা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যেহেতু নিরাকারের কোনো সীমানা নাই। সুতরাং জীব আত্মাকে একাধিক বললে অবশ্যই মানতে হবে জীব আত্মা সাকার। এই তথাকথিত ত্রৈতবাদে এরূপ বেশ কিছু ফাঁক ফোকর দৃশ্যমান হয়। এমন ফাঁক ফোকর যুক্ত দর্শন কখনোই অপৌরুষেয় বেদের দর্শন হতে পারে না। এই ত্রৈতবাদ দয়ানন্দ সৃষ্ট মতবাদ বৈ কিছুই নয়।

💢✅**প্রত্যুত্তর:** আত্মা অপরিমেয় । [গীতা২।১৮] অপরিমেয় তাই সংখ্যা নেই । যেমন: এক ট্রাক বালু আছে এতে বালুর কণা অসীম । কিন্তু ট্রাকে বালুর কণার সংখ্যা নিদিষ্ট । আমার দ্বারা গণনা করা সম্ভব নয় বলে বলছি অসংখ্য । জীবাত্মার বিষয়টিও এমনই । জীবাত্মার অবস্থান মস্তিকে বৈদিক শাস্ত্র সমূহে শতাধিক প্রমাণ বিদ্যমান । জীবাত্মা যে বহু সেটাও শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত । জীবাত্মা' নিত্য (❝অমর্ত্য❞ ঋ০১।১৬৪।৩৮), অজন্মা (❝ন জায়তে❞ গীতা০ ২।২০), কর্মফলের ভোক্তা (❝পিপলং স্বাদন্তি❞ অথর্ব০ ৯।৯। ২০), চেতন এবং অনেক (❝পুরুষবহুত্বম্❞ (সাংখ্য০ ১।৫১), নিত্য, চেতন ও বহুসংখ্যক (❝নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চ.... বহুনাং❞....। শ্বেতা০ ৬।১৩) । ঈশ্বর ও জীবাত্মা পরস্পর অনাদিকাল থেকে স্বরূপত ভিন্ন-ভিন্ন সত্তা (❝ভেদব্যপদেশাচ্চ;❞ বেদান্ত০ ১।১।১৭) ।

💥বেদে স্পষ্টতঃভাবে বর্ণিত রয়েছে -

বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নেব দৃশ্যতে । ততঃ পরিস্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া ॥

(অথর্ব০ ১০।৮।২৫)

পদার্থঃ (একম্) এক জীবাত্মা (বালাদণীয়স্কম্) কেশ থেকেও সূক্ষ্মতর [বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ , ভাগো জীবঃ। শ্বেতা০ ৫।৯] (উত) এবং (একম্) এক প্রকৃতি (নৈব দৃশ্যতে) দৃষ্টির অগোচর হওয়ার কারণে অব্যক্ত হয়ে আছে । (ততঃ পরিস্বজীয়সী দেবতা) তার থেকেও সূক্ষ্মতর । এবং ব্যাপক যে পরমাত্মদেব (সা মম প্রিয়া) তিনিই আমার প্রিয় ।

প্রকৃতির পরমাণু অতি সূক্ষ্ম , জীবাত্মা তার থেকেও সূক্ষ্মতর , সেই জীবের থেকেও সূক্ষ্মতর হলেন পরমাত্মা । ❝ অণোরণীয়ান্ মতো মহীয়ানাত্মা ❞ শ্বেতা০৩.২০ অর্থাৎ , সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর মহান থেকেও মহত্তর সেই পরমাত্মা । ❝ য়স্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ । ❞শ্বেতা০৩.৯ অর্থাৎ , যার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নেই , যার থেকে সূক্ষ্ম ও মহান কিছুই নেই যিনি প্রকাশময় স্বরূপে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজমান , সেই এক ও অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত ।

য় আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো য়মাত্মা ন বেদ । য়স্য আত্মা শরীরম্ । য় আত্মানমন্তরো য়ময়তি সত আত্মান্তয়াম্যমৃতঃ ॥ (শত০ ব্রা০ ১৪।৬।৭। ৩০)
অর্থাৎ , যিনি আত্মায় অবস্থান করেন , অথচ আত্মা থেকে পৃথক , আত্মা যাঁকে জানে না , কিন্তু আত্মা যাঁর শরীর এবং যিনি আত্মার অভ্যন্তরে থেকে আত্মাকে শাসন করছেন , তিনিই তোমার পরমাত্মা ; ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত ।

এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ বর্ণনা করে বলা হয়েছে- অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যেও ব্যাপ্ত, অথচ জীবাত্মা থেকে পৃথক। এই জীবাত্মা তাঁকে জানে না। সেই পরমাত্মার নিবাস হওয়ার কারণে এই জীবাত্মা তাঁর শরীর। এতে স্পষ্ট যে, জীবাত্মা ব্যাপ্য এবং পরমাত্মা ব্যাপক, অতএব এই দুটি সত্তা পরস্পর থেকে ভিন্ন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈ তৎ॥
কঠো০ ২।১।১২
পদার্থঃ (ভূতভব্যস্য) ভূত ও ভবিষ্যতের [সর্বকালের] (ঈশানম্) স্বামী বা অধ্যক্ষ (অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ) অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়দেশে লভ্য (পুরুষঃ) সর্বত্র ব্যপ্ত পরমাত্মা (আত্মনি) প্রত্যেক জীবাত্মার (মধ্য) মধ্যে (তিষ্ঠতি) অবস্থিত (ততঃ) তাঁকে জানার পর কোনো পুরুষ (ন বিজুগুপ্সতে) নিন্দিত হয় না (এতৎ বৈ তৎ) ইনিই সেই ব্রহ্ম ।
সরলার্থঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়দেশে লভ্য পরমাত্মা প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে বিরাজমান , তিনি ভূত ও ভবিষ্যত অর্থাৎ সর্বকালের অধ্যক্ষ । তাঁকে জানার পর কোনো পুরুষ নিন্দিত হয় না ইনিই সেই ব্রহ্ম ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহংকারসমন্বিতো য়ঃ বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্০ ৫.৮
পদার্থঃ (য়ঃ) যিনি [জীবাত্মা] (অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ) অঙ্গুষ্ঠমাত্র (সংকল্প অহংকার সমন্বিতঃ) সংকল্প এবং অহংকারযুক্ত (রবিতুল্যরূপঃ) সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ (আরাগ্রমাত্রঃ) সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম (অপি) এবং (অপরঃ) অপর [পরমাত্মা থেকে ভিন্ন] (বুদ্ধেঃ) বুদ্ধির (গুণেন) উৎকৃষ্ট গুণ [জ্ঞান] (চ) এবং (আত্মগুণেন) আত্মগুণ [চেতনা] (এব হি) দ্বারাই (দৃষ্টঃ) তিনি দৃষ্ট হন ।
সরলার্থঃ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র , সংকল্প এবং অহংকারযুক্ত , সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ । তিনি সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন । বুদ্ধির উৎকৃষ্ট গুণ (জ্ঞান) এবং আত্মগুণ (চেতনা) দ্বারাই তাঁকে (জীবাত্মাকে) জানা যায় ।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়পুরীতে অবস্থান করেন বলেই জীবাত্মাকে ❝অঙ্গুষ্ঠমাত্র❞ বলা হয়েছে । এই কারণে পুনরায় বলা হয়েছে , তিনি ❝আরাগ্রমাত্র❞ অর্থাৎ সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম । আত্মার এই সূক্ষ্মতাকে কোনো জড় বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয় । শুধু বোঝানোর সুবিধার্থে এই লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হয়েছে । জীবাত্মা সংকল্প (Determined will) এবং অহংকার (Ego) সমন্বিত । তিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জড় শরীরে চেতনা প্রদানকারী । যেরূপ সূর্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে , তদ্রূপ জীবাত্মা স্বীয় চেতন-ধর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ দেহকে প্রকাশিত করেন । নিজের গুণানুসারে তিনি ❝অপর❞ অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন । বুদ্ধির উৎকৃষ্ট গুণ (জ্ঞান) ও আত্মগুণ (চেতনা) দ্বারাই, নিজের আত্মাকে সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ জানতে পারেন । এই বিষয়ে ❝গীতায় (১৫।১০)❞ বলা হয়েছে , দেহ ত্যাগের

সময় অথবা দেহে অবস্থানপূর্বক বিষয়-ভোগকালে বা প্রকৃতির গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রূপে এই জীবকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখতে পায় না , কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাকে দর্শন করেন ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্০ ৫.৯
পদার্থঃ (বালাগ্রশতভাগস্য) একটি কেশের অগ্রভাগের শতভাগকে (চ) পুনরায় [তার একটি ভাগকে] (শতধা) শতভাগ রূপে (কল্পিতস্য) কল্পনা করলে (ভাগঃ) যে সূক্ষ্ম এক ভাগ হয় (জীবঃ) জীবাত্মাকে (সঃ) সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম বলে (বিজ্ঞেয়ঃ) জানবে (চ) এবং (সঃ) তিনি (আনন্ত্যায়) পরমপদ [মোক্ষ] লাভের জন্য (কল্পতে) সমর্থ , যোগ্য ।
সরলার্থঃ একটি কেশের অগ্রভাগের শতভাগকে পুনরায় তার একটি ভাগকে শতভাগ রূপে কল্পনা করলে যে সূক্ষ্ম এক ভাগ হয় , জীবাত্মাকে সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম বলে জানবে এবং তিনি পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্তির যোগ্য ।

এই শ্রুতিতে জীবাত্মার অতি সূক্ষ্মতার নিরূপণ করে বলা হয়েছে— একটি কেশের অগ্রভাগকে ❝দশ হাজার ভাগ করলে❞ , তার একভাগ যে পরিমাণ সূক্ষ্ম হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম । ❝ত্রস-রেণুর তুল্য❞ পরিমাণ কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার টুকরো করা সম্ভব নয় । এজন্য এখানে শব্দার্থের প্রধানতা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নয় , বরং বাক্যের মুখ্য আশয় গ্রহণই অভীষ্ট । জীবাত্মা এতটা সূক্ষ্ম হয়েও অনন্ত সামর্থ্য বা পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্তির জন্য সমর্থ ।

💥ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে পঞ্চাবয়ব দ্বারাও এই বিষয় প্রস্তুত করা যেতে পারে –
প্রতিজ্ঞা— আত্মা নিরাকার ।
হেতু— চেতন হওয়ার কারণে ।
উদাহরণ— যেমন , ঈশ্বর ।
উপনয়— ঈশ্বর নিরাকার এবং চেতন , তদ্রূপ জীবও চেতন হওয়ার কারণে নিরাকার ।
নিগমন— ঈশ্বরের ন্যায় চেতন হওয়ার কারণে জীবও নিরাকার ।
এখন এই বিষয়কে শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বিচার করা যাক । যোগদর্শনের সূত্র অনুসারে— ❝ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্❞ (যোগ০ ২।১৮) যা কিছু দৃশ্য (প্রকৃতির বিকার বা কার্য) , তা আত্মার ভোগ এবং অপবর্গের (মোক্ষের) সিদ্ধির জন্য । এজন্য ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা কখনো দৃশ্য হতে পারে না , নতুবা তিনি ভোগ্য হয়ে যাবেন । দৃশ্য মাত্র সাকারই হয়ে থাকে , অতএব আত্মা সাকার নয় । যোগদর্শনে বলা আছে ❝দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ❞ (যোগ০ ২।২০) অর্থাৎ দ্রষ্টা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বথা শুদ্ধ (নির্বিকার) । এ বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশের দ্বাদশ সমুল্লাসে লিখেছেন— ❝দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকে, কখনো দৃশ্য হয় না । যদি দ্রষ্টা ও ভোক্তা জীবাত্মাকে সাকার মানা হয় , তাহলে তিনি দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং ভোগ্য হয়ে যাবেন❞ ।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
শ্বেতা০ ৬।১১
পদার্থঃ (দেবঃ) পরমদেব পরমেশ্বর (একঃ) এক (সর্বভূতেষু) [তিনি] সকল প্রাণীর মধ্যে (গূঢ়ঃ) গূঢ়ভাবে বিদ্যমান (সর্বব্যাপী) সর্বব্যাপক হয়ে (সর্বভূতান্তরাত্মা) সকল প্রাণীর আত্মার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে স্থিত (কর্মাধ্যক্ষঃ) সবার কর্মের

অধিষ্ঠাতা [যথাযোগ্য কর্মফল প্রদানকারী] (সর্বভূতাদিবাসঃ) সর্বভূতের আধার বা নিবাসস্থান (সাক্ষীঃ) সকল জীবের শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা (চেতা) চেতনস্বরূপ (কেবলঃ) অদ্বিতীয় (চ) এবং (নির্গুণঃ) গুণাতীত [সত্ত্ব , রজঃ , তমঃ- এই গুণত্রয় থেকে পৃথক] ।
সরলার্থঃ পরমদেব পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান , সর্বব্যাপক হয়ে সকল প্রাণীর আত্মার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে স্থিত এবং সবার কর্মের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যথাযোগ্য কর্মফল প্রদানকারী । তিনিই সর্বভূতের নিবাসস্থান , সকল জীবের শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা , চেতনস্বরূপ এবং গুণাতীত ।

এই শ্রুতিতে পরমাত্মার নিত্য স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে । তিনি এক , অদ্বিতীয় অর্থাৎ অনেক ঈশ্বর নেই । তিনি সর্বব্যাপী অর্থাৎ এমন কোনো স্থান নেই , যেখানে তিনি বিরাজ করেন না , সকল জীবের হৃদয়েই তিনি অবস্থিত । সকল জীবের কৃতকর্মের যথাযোগ্য কর্মফল তিনিই প্রদান করেন । তিনি চেতনস্বরূপ , জীবের ❝শুভ-অশুভ সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা❞ এবং গুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বন্ধন থেকে তিনি সদা মুক্ত । অতএব , যে সকল মানুষ সর্বদা এক ও অদ্বিতীয় , সর্বব্যাপী , সর্বসাক্ষী , সর্বনিয়ন্তা , কর্মফলদাতা , গুণাতীত সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন , তাঁরাই কৃতার্থ হন ।

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভিগুণেভিরাবৃতম্। তস্মিন্ য়দ্ য়ক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥
অথর্ববেদ ১০।৮।৪৩

এই মন্ত্রে ❝পুণ্ডরীক❞ পদ মানবদেহের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে । লোক ও সাহিত্যে এই পদের অর্থ কমল অথবা পুষ্পমাত্র প্রসিদ্ধ । পুষ্পকে মানবদেহের প্রতীক বা উপমান বলা হয় , তাকে সুন্দর তথা আকর্ষক বলার পাশাপাশি তার নশ্বরতারও সংকেত করা হয়েছে । তাৎপর্য এই যে , দেহের আকর্ষণে মানুষের নিজের স্বরূপকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় । ভ্রমরের ন্যায় তার রসের ভোগ করা তো ঠিক আছে , কিন্তু তার মধ্যে ডুবে হওয়া উচিত নয় । মন্ত্রে দেহের বিশেষতাকে বর্ণনা করেছে ❝নবদ্বারং❞ পদ (❝নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ। শ্বেতা০ ৩।১৮❞) । এই নয়টি দ্বার হচ্ছে- দুই চোখ , দুই কান , দুই নাসাছিদ্র , এক মুখ এবং দুই অধোদ্বার- পায়ু ও উপস্থ ।

শরীরকে ❝ত্রিভিগুণেভিরাবৃতম্❞ গুণত্রয় দ্বারা আবৃত বলা হয়েছে , অর্থাৎ দেহ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এর পরিণাম । দেহে এর অধিষ্ঠাতা- চেতন আত্মা নিবাস করে । এই চেতন জীব ছাড়াও আরো একটি ❝যক্ষ❞ এই দেহে ব্যাপ্ত । এই ❝যক্ষ❞ চেতন পরমাত্মা , যাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানীরাই জানতে পারেন । দেহ-পর্যায়ী ❝পুণ্ডরীক❞ পদ কার্যমাত্রের উপলক্ষণ , অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ সত্ত্ব-রজ- তমোরূপ মূল-প্রকৃতির পরিণাম । মূলত দেহ-প্রতীকে আত্মা (জীব-চেতন) এর ন্যায় অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই যক্ষ (পরমাত্ম-চেতন) ব্যাপ্ত । এভাবে এই মন্ত্রে জগতের মূল উপাদান ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির , তার ভোক্তারূপে জীবাত্মার এবং সবার নিয়ন্তারূপে পরমাত্মার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ।

❌নিরাকার বহু কী করে হতে পারে ?
✅কেন পারে না ? নিরাকারত্ব হলো একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য । একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি একাধিক বস্তুতে থাকতে পারে না ? জলই কি শুধু তরল ? তেল কি তরল নয় ? মধু কি তরল নয় ? এবং নিরাকার- নিরাকার মিক্স হওয়ার বিষয়ে ও যাদের শঙ্কা- মিক্স হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে উপাদান বিদ্যমান থাকা । যেমন লবণের মধ্যে যে উপাদানের আয়নিক বন্ধ থাকে , তা জলে সহজে ভেঙে গিয়ে মিশ্রণ তৈরি হয় । কিন্তু পাথরে এরকম আয়নিক বন্ধ থাকে না এবং উপাদানগুলো

কঠিন হওয়ায় জলে মিশ্রিত হয় না । তাই মিশ্রণ নিয়ে যে শঙ্কা সেটির মূলেই রয়েছে উপাদানের ব্যাপার । কিন্তু জীবাত্মার কী আলাদা কোনো উপাদান আছে ? যদি না থাকে তবে মিশ্রণের প্রসঙ্গ আসে না । জলের উপাদান H+, OH– লবণের উপাদান Na+, Cl–জলে লবণ যতই দ্রবীভূত হোক না কেন লবণের যে মূল উপাদান Na+, Cl– তা কিন্তু কখনোই জলে লুপ্ত হয়ে যায় না , সদাই বিদ্যমান থাকে । জলের আয়ন আর লবণের আয়ন দুইটাই তো আয়ন । কিন্তু দুইটাই ভিন্ন । কারণ এদের বৈশিষ্ট্য আলাদা । বৈশেষিকে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নামের দুইটা কথা আছে । আত্মা আর পরমাত্মার সাধর্ম্য বা একই ধর্ম হলো এই দুইটাই নিরাকার , সৎ , চিৎ । কিন্তু বৈধর্ম্য বা আলাদা ধর্ম হলো এদের একটা আনন্দস্বরূপ আরেকটা নয় , একটা একদেশি আরেকটা সর্বব্যাপী । এখন যদি কেউ বলে ঘনত্বে আর বিভিন্ন গুণে তে তো পার্থক্য আছেই ? তখন তেমনি ভাবে পরমাত্মার আর জীবাত্মার অন্যগুণে পার্থক্য আছে । এজন্য জল আর তেল একসাথে থাকলেও তরল হওয়ার পরও যেমন মেশে না , তেমনি আত্মা ও পরমাত্মা নিরাকার হওয়ার পরও অন্য বৈধর্ম্যের কারণে একত্রে মিশে যায় না । উভয়ে নিরাকার হলেও জীবাত্মা সর্বব্যাপী নয় ।

একদেশিত্ব নিরাকারত্বের বাধক নয় । জীবাত্মার কোনো উপাদান কারণ না থাকায় তা সর্বদা নিরাকার । আর নিরাকার হওয়ার পরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম । যেরকম ফোটন আকারবিহীন হওয়ার পরও কণারূপে গণ্য ।
এরূপ কোনো দ্রব্য নেই যাতে সগুণ-নিগুর্ণতা , অন্বয় , ব্যতিরেক , সাধ্য , বৈধ্য ও [বিশেষ্য বিশেষণ ভাব থাকে না । প্রতিটি জীবাত্মা সূক্ষ্ম দেহধারী হয় । এই সূক্ষ্ম দেহ অণুপরিমাণ ❝অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ॥সাংখ্য ৩।১৪ ।❞ এই দেহ সৃষ্টি থেকে প্রলয় অব্দি থাকে । এবং প্রলয় কালে যখন এই সূক্ষ্ম শরীর আবার প্রকৃতিতে পরিণত হয় তখন সেই জীবাত্মা স্বীয় স্থানেই থাকে অপরের সাথে মিলে যায় না । কারণ সূক্ষ্ম দেহ ব্যাতিত জীবাত্মার গতি হয় না এবং সে কোনো প্রকার ভোগও করতে পারে না । জীবাত্মার এই অবস্থাকে নাসদীয় সূক্তে অসৎ বা অব্যাক্ত অবস্থা বলা হয়েছে । আবার নব সৃষ্টির প্রারব্ধে পরমাত্মা পূর্ব কল্পের সংস্কার যুক্ত একটি সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মাকে প্রদান করলে সে আবার গতিপ্রাপ্ত হয় ও জীবন ধারণ করে ভোগ করে । তাই অসংখ্য জীবাত্মা নিরাকার হওয়া সত্ত্বেও লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়ে থাকায় ও শরীরহীন অবস্থায় অচল হওয়ায় একে অপরেরর সাথে সংমিশ্রিত হয় না ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই অনাদি , সৎ এবং চিৎ । এটিই উভয়ের সাধারণ ধর্ম । কিন্তু পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ , সর্বব্যাপক , নিরাকার , সর্বজ্ঞ , সৃষ্টিকর্তা , জীবের কর্মফলের সাক্ষী এবং কর্মফল-দাতা , বেদ-জ্ঞানের উপদেষ্টা , ন্যায়কারী, পরম-পবিত্র , সর্বশক্তিমান ইত্যাদি গুণযুক্ত । অপরদিকে জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) , কর্মে স্বতন্ত্র কিন্তু কর্মফল ভোগে পরতন্ত্র, অল্পজ্ঞ এবং ইচ্ছা , দ্বেষ , সুখ-দুঃখাদি গুণযুক্ত ; প্রতিটি শরীরে ভিন্ন-ভিন্ন জীবাত্মা বিদ্যমান ।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সাদৃশ্যবাচক সাধ্য ও বৈসাদৃশ্যবাচক বৈধ্য বর্ণনা -

(ক) জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চেতনস্বরূপ । উভয়েরই স্বভাব পবিত্র । উভয়ই অবিনাশী ও ধার্মিকতা আদি গুণযুক্ত । কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তি , স্থিতি ও প্রলয় করা , সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা , জীবদের পাপ-পুণ্যের ফল প্রদান ইত্যাদি ধর্মযুক্ত কর্ম পরমেশ্বরের । সন্তানোৎপত্তি, সন্তান পালন , শিল্পবিদ্যা আদি উত্তম-অধম সকল জাগতিক কর্ম জীবের। নিত্য-জ্ঞান , আনন্দ , অনন্ত বল আদি গুণ ঈশ্বরের । আর ইচ্ছা , দ্বেষ , প্রযত্ন , সুখ , দুঃখাদি যে জীবাত্মার গুণ , তা ঈশ্বরের গুণ থেকে ভিন্ন ।

(খ) জীবের স্বরূপত অল্পজ্ঞ , অল্প এবং সূক্ষ্ম । আর পরমেশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম , অনন্ত , সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক স্বরূপ । এজন্য জীব ও পরমেশ্বরের ❝ব্যাপ্য-ব্যাপক❞ সম্বন্ধ ।
(গ) জীব পরমেশ্বর থেকে স্কুল এবং পরমেশ্বর জীব থেকে সূক্ষ্ম হওয়ায় পরমেশ্বর ব্যাপক ও জীব ব্যাপ্য । জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে যেমন এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ রয়েছে , তেমনি সেবক-সেব্য , আধার-আধেয় , ভৃত্য-স্বামী , প্রজা-রাজা এবং পুত্র-পিতা ইত্যাদি সম্বন্ধ আছে ।
(ঘ) পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান-আনন্দ-বল-ক্রিয়া , নির্ভান্তিত্ব ও ব্যাপকতা জীব থেকে ভিন্ন এবং জীবের অল্প-জ্ঞান , অল্প-বল , অল্প-স্বরূপ , সভ্রান্তিত্ব ও পরিচ্ছিন্নতাদি গুণ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন । অতএব জীব ও পরমেশ্বর এক নয় ; কেননা এঁদের স্বরূপও (পরমেশ্বর অতিসূক্ষ্ম এবং জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা কিছু স্থূল হওয়ার কারণে) ভিন্ন ।

💥**প্রশ্ন** ব্রহ্ম ও জীবের কি সর্বদা একত্ব বা বহুত্ব থাকে❓ অথবা কখনো [ব্রহ্ম ও জীব] উভয়ে মিলে এক হয়ে যায় বা যায় না❓

✅**উত্তর:** সাধ্য-অন্বয়ভাব দ্বারা [জীব ও ব্রহ্মের] একতা হয়ে থাকে । যেমন- আকাশে ও মূর্ত-দ্রব্যে জড়ত্ব থাকায় এবং কখনো পৃথক না থাকায় একতা এবং আকাশের বিভূত্ব , সূক্ষ্মত্ব , অরূপত্ব , অনন্তত্ব আদি গুণ এবং মূর্ত-পদার্থের পরিচ্ছিন্নত্ব , দৃশ্যত্ব আদি বৈধ্যবশত ভেদ হয়ে থাকে , অর্থাৎ যেরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ আকাশ থেকে কখনো ভিন্ন থাকতে পারে না , কেননা ❝অন্বয়❞ অর্থাৎ অবকাশ ব্যতীত মূর্ত-দ্রব্য কখনো থাকতে পারে না এবং ❝ব্যতিরেক❞ অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় [আকাশ ও মূর্ত-দ্রব্যের মধ্যে] পার্থক্য আছে । সেরূপ ব্রহ্ম ব্যাপক হওয়ায় জীব ও পৃথিব্যাদি পদার্থ তাঁর থেকে পৃথক থাকতে পারে না , আবার স্বরূপতঃ একও হয় না । যেমন , গৃহ নির্মাণ করার পূর্ব ভিন্ন-ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা , কাষ্ঠ এবং লৌহ আদি পদার্থ আকাশেই থাকে । যখন গৃহ নির্মিত হয়ে যায় , তখনও আকাশেই বর্তমান থাকে এবং যখন তা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই গৃহের সকল অবয়ব ভিন্ন-ভিন্ন দেশকে প্রাপ্ত হয় , তখনও সেগুলো আকাশেই থাকে ; অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ থেকে ভিন্ন হতে পারে না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনো এক ছিল না , এক নেই , আর এক হবে না । এইপ্রকারে জীব ও সংসারের সমস্ত পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্য হওয়ায় তিন কালেই পরমাত্মা থেকে ভিন্ন থাকে না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনো এক হয় না ।

4️⃣▶️**আক্ষেপ:**ত্রৈতবাদ মতে, "ব্রহ্ম/পরমাত্মা/ঈশ্বর নিরাকার। সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। ঈশ্বর কদাপি সাকার হন না।"
উক্ত মত অনুযায়ী, ব্রহ্ম/পরমাত্মা নিরাকার এবং সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। জগতের সকল পদার্থ কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কি স্থূল কি সূক্ষ্ম , সকল কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট। সকল পদার্থের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরমাত্মা অনুপ্রবিষ্ট। এমন কোনো তিল পরিমাণ জায়গায়ও নাই যেখানে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ নাই।
এবার বিবেচনা করি একটা গাছ (বিবেচ্য বিষয় ত্রৈতবাদে ব্রহ্ম, প্রকৃতি/জগৎ, জীবাত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন সত্ত্বা। তাই গাছ ও ব্রহ্ম/পরমাত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটা সত্ত্বা)। গাছটার প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরমাত্মা অনুপ্রবিষ্ট। গাছের ভেতর বাহির সর্বত্র পরমাত্মা অনুপ্রবিষ্ট। গাছ টা বিবেচনায় আনলে গাছের বিন্দুমাত্র জায়গা খালি নাই যেখানে পরমাত্মা উপস্থিতি নাই। অর্থাৎ গাছের ভিতরে অণুতে পরমাণুতে এমনকি গাছের আত্মায়ও (জীবাত্মা) পরমাত্মা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন।
এবার গাছের ভিতরে পরমাত্মার অবস্থান বিচার করুন তো। গাছটার প্রতিটা অংশে পরমাত্মা থাকলে তাহলে গাছের ভিতর পরমাত্মার যে অংশ আছে তা গাছের মত আকারই ধারণ করে আছে। এখন বিবেচনায় গাছটার ভিতরের পরমাত্মার অংশ টা আনলে পরমাত্মার ঐ অংশ গাছের আকৃতি বিশিষ্ট।

সুতরাং এই ত্রৈতবাদ দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্ম সাকার রূপ ধারণে অক্ষম হলেও সাকার বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরজীবীর মত সাকার রূপ ধারন করতে পারে। এই মতবাদ মতে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর এতোটাই অক্ষম যে তার অন্য সাকার বস্তু ব্যাতীত সাকার হওয়ার উপায় নাই। আবার এই ঈশ্বরই জগতকে সাকার রূপে তৈরি করতেছেন অথচ তার নিজের সাকার হওয়ার ক্ষমতা নাই!

বলিহারি! এই ত্রৈতবাদ বালকের প্রলাপ ব্যাতীত ইহা আর কি হইতে পারে!

দ্বিতীয়ত,

ত্রৈতবাদে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। অথচ সর্বশক্তিমানের সংজ্ঞা শুনলে না হেসে পারা যায় না।

তাদের মতে সর্বশক্তিমান অর্থ যিনি সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের জন্য অন্য কারো সহায্য গ্রহন করেন না, এজন্য তিনি সর্বশক্তিমান।

বলিহারি! পাঠকগণই বিবেচনা করুন, এটা কি সর্বশক্তিমানের সংজ্ঞা নাকি অন্যের সাহায্য ব্যাতীত সৃষ্টিআদি কার্যকারীর সংজ্ঞা?

সর্বশক্তিমান বলতে তাকেই বুঝায়, সমস্ত শক্তি যার অধীনে। এখন জগতের যে সাকার হওয়ার শক্তি এটাও তার অধীনস্থ শক্তি হতে হবে। নয়তো ঈশ্বরের শক্তি সল্পতা আছে। তার সাকার হওয়ার শক্তি নাই। সে হিসেবে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না।

আর এক্ষেত্রে সাকার হতে অক্ষম ঈশ্বর হতে জগৎ একটা গুণে এগিয়ে থাকলো। এই গুণের বিচারে জগৎ ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

💯✅**প্রত্যুত্তর:** ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনন্ত । তারপরেও বেদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি - সৎ [ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬, ১।৬৯/১,১০।৮৫।১; যজুর্বেদ ৩২।৮৯, অথর্ববেদ ১০।৮।৬], চিৎ [ঋগ্বেদ ৪।৩১।১, ৬।৪।৩,১।৭২।১; যজুর্বেদ ৩৬।৫, অথর্ববেদ ১৮।৪।১৪], আনন্দ [ঋগ্বেদ ১০।১২১।১-১০, ৮।৪৩।১৪, যজুর্বেদ ২২।১০, অথর্ববেদ ২।১।৫, ৪।২।৪], অদ্বিতীয় [ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬, যজুর্বেদ ৩২।১, অথর্ববেদ ১৩।৪[২]।১৫-১৮], সর্বশক্তিমান [ঋগ্বেদ ৮।২৪।২১, ৮।৩২।১৫, ১০।৫৫।৬,৬।২৫।৫, ১।৫২।১২, ৫।৩৮।২, ২।৩৩।১০,১।৫৪।২; অথর্ববেদ ১০।৮।২৪; যজুর্বেদ ৪০।৮, ১৭।৭১], নিরাকার [ঋগ্বেদ ৪।১।১১, ৮।৬৯।১১ ৮।৭২।৩, ১।২৬।১৪; যজুর্বেদ ৩২।২-৪, ৪০।৮], নির্বিকার [ঋগ্বেদ ১০।১১১।৩, ৮।৪৭।৯; যজুর্বেদ ৩৪।৫৩, অথর্ববেদ ১০।৮।৪৪], সর্বব্যাপক [ঋগ্বেদ ১।৯৭।৬, ১।২২।১৭-২১, ১।১৫৪।১-২; যজুর্বেদ ৩২।৮, ৪০।১, ৪০।৮], অনাদি [যজুর্বেদ ৩২।২; ঋগ্বেদ ৮।২১।১; সামবেদ ৩৯৯, ৪০৮, ৭০৮; অথর্ববেদ ১০।৮।২২], নিত্য [ঋগ্বেদ ১০।৫৫।৬, ১।৬১।৬,৬।২৪।৭, ৬।৪।৩, ৪।৩২।১৩, ১।১৬৪।৩০; অথর্ববেদ ১০।৮।২২-২৩], জ্ঞানী তথা সর্বজ্ঞ [ঋগ্বেদ ৮।১০১।১৪, ১০।৭১।৩; যজুর্বেদ ৩২।১০], দুঃখরহিত [ঋগ্বেদ ৫।৫৪।৭], শুদ্ধ পবিত্র [ঋগ্বেদ ৮/৯৫/৭-৮, ৯।৩৫।৬, ৮।২৮/৫, অথর্ববেদ ১০।৮।৪০], সর্বেশ্বর [ঋগ্বেদ ১।৮৯।৫, ৮।৬৪।৩, ১০।৮৯/১০, ১।৩২।১৫, ১০।১২১।৩, ৮।৯৩।৩-৪, অথর্ববেদ ১৩।৩।৩], অজ [জন্ম নেই যার] [ঋগ্বেদ ১।৬৭।৩, ৬।৫০।১৪, ৭।৩৫।১৩; যজুর্বেদ ৩১।১৯, ৪০।৮, ৩৪।৫৩; অথর্ববেদ ১০।৮।৪], জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা তথা সর্বাধার [ঋগ্বেদ ১।৫৯।১; যজুর্বেদ ৩১।১১,১৩।৪; অথর্ববেদ ১০।৭।২৭, ১০।৮।৬, ১০।৭।১-৪৩, ৪।১১।৭], [ঋগ্বেদ ১।৯৬।৭, ৬।১৫।১৩], ন্যায়কারী [ঋগ্বেদ ১।৯০।৯, যজুর্বেদ ৩৬।৯, অথর্ববেদ ১৯।৯।৬], সম্বুদ্ধির ও গুণের প্রেরক [ঋগ্বেদ ১।৭৯।১০], ব্রহ্মতেজ প্রদানকারী [ঋগ্বেদ ৯।৪৩।৪], পতিতোদ্ধারক [ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৪৩], অন্নাদিভোগ্য প্রদাতা [ঋগ্বেদ ১।৮১।৬], তিনি অনুপম [ঋগ্বেদ ৭।৩২।২৩, ৮।৫২।২, ১০।১২।১০, ১০।৮।২৩, ৬।১৮।১২, ১৪৫২।১৩; সামবেদ ২৪২],

[ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৩৮, যজুর্বেদ ৩১।২], মোক্ষাভিলাষে । [ঋগ্বেদ ৮।৫২।৭] ঈশ্বর বল জ্ঞান ও ক্রিয়াসমূহের আধার [ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৩৯], [ঋগ্বেদ ১।৫১।৮], ধর্মকার্যের অধ্যক্ষ [ঋগ্বেদ ১।১।৬], দণ্ডদাতা [ঋগ্বেদ ১।৯৪/৯]

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥
পদার্থঃ (সঃ) সেই পরমাত্মা (অপাণিপাদঃ) হস্ত-পদাদি রহিত হয়েও (গ্রহীতা) নিজের অনন্ত শক্তি দ্বারা সবকিছু গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করেন [এবং] (জবনঃ) সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে সর্বাধিক বেগবান (অচক্ষুঃ) চক্ষু-রহিত হয়েও (পশ্যতি) যথাযথ দর্শন করেন (অকর্ণঃ) কর্ণ- রহিত হয়েও (শৃণোতি) সবই শ্রবণ করেন (সঃ) তিনি (বেদ্যং) সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় (বেত্তি) জানেন (চ) অথচ (তস্য) তাঁর (বেত্তা) জ্ঞাতা (ন অস্তি) কেউ নেই। [এজন্য জ্ঞানিগণ] (তম) তাঁকে (অগ্রগ্র্যম) সর্বাগ্রণী (মহান্তম) সর্বাপেক্ষা মহান (পুরুষম) পুরুষ (আহুঃ) বলেন ।

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টতঃভাবে পরমাত্মার ইন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ করা হয়েছে । পরমেশ্বর চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই গ্রহণ , দর্শন , শ্রবণাদি কার্য সিদ্ধ করতে পারেন , আর এটিই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা । “ সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ” ॥ (গীতা ১৩।১৫)” অর্থাৎ “সেই ব্রহ্ম চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণসমূহ প্রকাশিত করেন , অথচ তিনি স্বয়ং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত ।

তবে তার আকার নিরূপণ কীভাবে হবে ? পরমাত্মা যেমন চিত্রে দেখানো গাছের ভিতরে আছেন , তেমনি গাছের বাইরেও একই ভাবে আছেন , জগতের বাইরেও আছেন “য়ৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” তাই গাছের ভিতরে পরমাত্মাকে নিবন্ধ করার মতন হাস্যকর আর কিছু নেই । আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন । মন্ত্রে বলা হয়েছে “ স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা ” । এখানে স্পষ্টই পুরুষ ভিন্ন অপর বস্তুর কথা বলা হয়েছে , এবং সেই অপর বস্তুর কী “ভূমিম্ ” ভূবন । এখানেও ত্রৈতবাদের সিদ্ধি হচ্ছে ।

তাই পরমাত্মার সাথে “অক্ষম” বিশেষণ যুক্ত করে পরমাত্মার কপোলকল্পিত সাকার হওয়ার যুক্তি ধূলিসাৎ হলো । পরের লাইনেই তিনি বলেছেন নিরাকার পরমাত্মা সাকার জগৎ তৈরি করলো কীভাবে।? উত্তরও সহজ পরমাত্মা সাকার বস্তু প্রকৃতি থেকেই সাকার জগৎ তৈরি করেছেন । হে ঈশ্বর তুমি নিজেকে হত্যা করতে পারো না , এটা বলা যেমন মূর্খতা , তেমনি হে ঈশ্বর তুমি সাকার হতে পারো না, এটা বলাও তেমন মূর্খতা । উভয়ই পরমাত্মার নিষ্প্রয়োজন । যদি ঈশ্বর নিরাকার হন , তবে সৃষ্টি কী করে সাকার হয় ? এই প্রশ্ন তখন আসবে যদি ঈশ্বরই জগতের উপাদান হন , যেমন সোনার অলংকারের উপাদান সোনা , লোহার পেরেকের উপাদান লোহা । সোনা ও লোহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অলংকার ও পেরেকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় । যদি ঈশ্বরকে উপাদান কারণ মানা যায় , তো এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য । পরন্তুঃ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ “আদিঃ স সংয়োগনিমিত্তহেতুঃ শ্বেতা০ ৬।৫” উপাদান কারণ নয় । যদি মাটির কলসের নির্মাতা কুমার হন , তো কুমারের সাথে মাটির কলসের বৈশিষ্ট্য মিল থাকার আবশ্যকতা নেই । কুমারের স্বরূপ আর মাটির কলসির স্বরূপ আলাদা । অতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের ন্যায় কুযুক্তি খণ্ডিত হলো ।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তির বিশেষণ শুনে দেখছি শ্রীমান প্রলাপ বকছেন । তা তাদের জগত গুরু আচার্য বা এই জগতের কোনো জীব কী সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের ক্ষমতা রাখেন ? কেউই প্রকৃতিকে আবার ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন ?

কেউই পারবেন না । এমনকি মুক্তাত্মাও পারেন না । একমাত্র পরমাত্মাই এই কার্য সম্পাদন করতে পারেন । সর্বশক্তিমান মানে যথেচ্ছাচারী নন ঈশ্বর সদা একরস , অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব , শাশ্বত , বিকারহীন , সর্বব্যাপী , সর্বশক্তিমান, পূর্ণকাম , সর্বজ্ঞ , সর্বদ্রষ্টা , নিত্য , সর্বাধার আদি গুণ রয়েছে । বিকারশীল বস্তুর তথা জড়া প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে , কিন্তু পরমাত্মায় ভোগ ও তা থেকে জন্ম নেওয়া কাম থাকে না , বিকার আসে না ।

আর ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হবার সাথে তার সাকার হবার কোন সম্পর্ক নেই । ঈশ্বর সর্বশক্তিমান , তিনি কি আত্মহত্যা করতে পারেন ? তিনি কি এমন কোন পাথর তৈরী করতে পারেন যার ভার তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারেন না ? উত্তর হলো না , তিনি এগুলো করতে পারবেন না । কারণ এগুলো ঈশ্বরের শাশ্বত বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে । সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ সব ই করতে পারা নয় । ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এর অর্থ হলো ঈশ্বর বিনা সাহায্যে এবং বিনা ক্লেশে নিজ শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম অনুযায়ী মহাবিশ্ব পরিচালনা করতে পারেন । সর্বশক্তিমান অর্থ যদি সকল কিছু করতে পারার ক্ষমতা হয় তবে তাকে শুধুমাত্র সাকার কেন ? ব্যাভিচারী , হত্যাকারী , অন্যায়কারী , অজ্ঞানী হতে হবে । নয়তো শ্রীমান কূপমূণ্ডুকের দৃষ্টিতে পরমাত্মা সর্বশক্তিমান হতে পারেন না । কিন্তু এর উল্টোটাও বলা যেতে পারে , সামান্য কার্য সম্পাদন করতে যার স্বরূপের পরিবর্তন করতে হয় , নিরাকার হতে সাকার হতে হয় , সে কীভাবে সর্বশক্তিমান হতে পারে ? বস্তুতঃ ঈশ্বর কারোর কথা মতন চলতে বাধ্য নন ।

🌞অতঃ মায়াবাদীগণ যে সর্বদা ভ্রান্ত কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত এবং অবৈদিক মান্যতা বৃথা প্রদর্শন করার প্রয়াস করে তা সহজেই অনুমেয় । ছয় অনাদি পদার্থের সত্তা মেনে প্রকারান্তর দ্বারা ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত অন্য তত্ত্বের সত্তাকে স্বীকার করে নেন । বস্তুতঃ পূর্বাপর প্রসঙ্গকে না দেখে কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ সঠিকভাবে জানা যেতে পারে না । নবীন বেদান্তীদের মহাবাক্য নামে অভিহিত কিছু এরূপ বাক্য আছে , যার আধারে তারা জীব ও ব্রহ্মের একতার প্রতিপাদন করার প্রচেষ্টা করেন । বাস্তবে সেসব ভাবোদ্রেকে তাৎস্থ্যোপাধি , তৎসহ-চরিতোপাধি অথবা তাদাত্ম্যভাবে বলা বচনমাত্র । দর্শনে বুদ্ধি তত্ত্ব প্রধান হয় , কাব্যে রাগাত্মক তত্ত্ব । উপনিষদে রাগাত্মক তত্ত্বের প্রাধান্যের কারণে বর্ণন-শৈলীতে অলংকারের প্রাচুর্য থাকায় লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার প্রাচুর্য রয়েছে । পরিণামস্বরূপ দর্শন ও উপনিষদে বস্তুর উপস্থাপনা একে অন্যের থেকে ভিন্ন ।উপনিষদের নিজস্ব এক বিশিষ্ট শৈলী আছে । জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাবনার সংকেত অনেক স্থলে পাওয়া যায় । কিন্তু সেসব লৌকিক প্রয়োগের ন্যায় ব্রহ্মের অতিশয় মহত্ত্বকে অথবা ব্রহ্মানন্দে লীন জীবাত্মার ভাবাবেশকে ব্যক্ত করে । কাব্যাত্মক অভিব্যক্তির তরঙ্গে ঔপচারিকরূপে বিবৃত বাক্যসমূহকে যথাতথ্য গ্রহণ করে ওইরূপ সন্দর্ভকে আপাতত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান অর্থকে মেনে মধ্যকালীন আচার্যগণ তথাকথিত অদ্বৈতবাদের বিশাল ফাঁপা ভবন দাঁড় করিয়েছেন যেটা কিনা বৈদিক সিদ্ধান্ত নয় এবং কপোলকল্পিত ।

ক্রিয়াযোগ কী ?

■ক্রিয়াযোগ কী❓

তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হয়। - যোগদর্শন - সাধন পাদ সূত্র ১

১)অতপস্বী ব্যক্তির যোগ কখনো সিদ্ধ হয় না। প্রবাহের দ্বারা অনাদি কর্ম যুক্ত এবং ক্লেশের বাসনায় চিত্রিত বিষয়জালকে উপস্থিতকারী অশুদ্ধি, তপস্যা ছাড়া ছিন্ন-ভিন্ন হয় না। সেই তপস্যা সাধকদের দ্বারা এভাবে করা উচিৎ যাতে তার চিত্ত

প্রসন্নকারী হয়, দুঃখদায়ী যেন না হয়। এরকম যোগীরা মনে করেন। 'তপ' অর্থাৎ দ্বন্দকে সহন করা। যেমন সুখ- দুঃখ, হানি-লাভ ইত্যাদি।
২)'স্বাধ্যায়' অর্থাৎ প্রণব ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যায়ন করা।
৩)'ঈশ্বরপ্রণিধান' অর্থাৎ সকল কর্মকে এবং সকল ধন-সম্পত্তি শরীর ইত্যাদিকে পরম গুরু ঈশ্বরকে অর্পিত করে দেওয়া এবং তার কোনও লৌকিক ফলের ইচ্ছা না করা অর্থাৎ এটি আমি অর্পিত করছি এবং এর বদলে আমায় চাকুরী ইত্যাদি প্রদান করুন: এই ধরনের কামনা না করা।

■ক্রিয়াযোগ কেন❓

উক্ত ক্রিয়াযোগ সমাধির উৎপত্তি এবং অবিদ্যা ইত্যাদি ক্লেশকে নির্বল করার জন্য করা হয়। - যোগদর্শন - সাধন পাদ সূত্র ২

ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করলে অবিদ্যা ইত্যাদি ক্লেশ নির্বল হয় এবং সমাধির উৎপত্তি হয়। সেই সমাধির অভ্যাস করতে থাকলে বিবেকখ্যাতি (অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের পৃথকতার জ্ঞান) উৎপন্ন হয় এবং সেই নির্বল ক্লেশকে 'বিবেকখ্যাতি' রূপী অগ্নি দ্বারা দগ্ধবীজ-এর ন্যায় করা হয়। যখন ক্লেশ দগ্ধবীজ হয়ে যায় এবং চিত্তের ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) রূপী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যায় তখন সে প্রকৃতিতে বিলীন হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তাই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করা অত্যাবশ্যক।

নামের আগে ১০৮ কেন লেখা হয় ?

■নামের আগে ১০৮ কেন লেখা হয় ❓

বহু লোক এমন মনে করে যে, এই দেহে ১০৭ টি নাড়ি হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে (আমাদের উপনিষদ্ এমন বলে) যার দ্বারা যোগের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে যোগী পুরুষ এগুলি সিদ্ধ করেন তার সঙ্গে এই ১০৮ টি হয়ে যায়-১০৭+১=১০৮। কিন্তু এ একটি ভ্রান্তিই।

একটি অন্য দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। ১০৮ এ তিনটি বস্তু রয়েছে - ১+০+৮, এর মধ্যে ১ ঈশ্বরের প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বর এক। ০ প্রকৃতিকে বোঝায় যা জড়, যার মহত্ত্ব ঈশ্বর ও জীবের সঙ্গেই রয়েছে; এবং ৮ নং জীবাত্মার জন্য কারণ যোগের অষ্টাঙ্গের দ্বারাই সে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং আত্মার সাক্ষাৎকার করে নেয় অর্থাৎ এই তিন তত্ত্বকে জ্ঞাত হয়, তাকে সিদ্ধ পুরুষ বলা হয় অথবা তার নামের পূর্বে ১০৮ লেখে।

এখানেও খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন রয়েছে জীব (৮) কে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রকৃতির (০) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে প্রকৃতি। আত্মা যখন প্রকৃতিকে শূন্য মনে করে, তখন পরমপিতা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারে। যদি সে নিজে-নিজের মধ্যেই অভিমান করতে থাকে আর জড় প্রকৃতিতেই বিভ্রান্ত থাকবে তবে সে (৮) নীচের দিকে পতিত হতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সে ৮+১=৯ হয়ে যায় যা পূর্ণ সংখ্যা। ৯ নং পূর্ণতার প্রতীক, অবশিষ্ট সমস্ত সংখ্যা ৯ এর নীচেই থাকে। ১ ও ৯ এর ভিতরই সমস্ত সংখ্যা থাকে। যে ব্যক্তি এর রহস্যকে বোঝে না/জানেনা, সে

শূন্যের মতো জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়, অতএব নিজের অস্তিত্বের মহত্ত্ব বুঝে আমাদেরও আমাদের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে, ঈশ্বরে স্থিত হয়ে, ঈশ্বরের মতো আনন্দিত হয়।

যে সংখ্যার অংকের যোগফল ৯ হয় তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকে যে, সংখ্যাটির অংককে স্থান পালটে বিয়োগ করলে অবশিষ্ট ৯ই থাকে, যেমন- ৫৪-৪৫-৯, ৬৩-৪৫=১৮~১+৮=৯ ইত্যাদি।

এই ভাবনাকে জাগ্রত রাখার জন্য পৌরাণিকদের জপের মালাতেও ১০৮ টি দানা থাকে। ১০৮ নং সর্বদা সচেতন করতে থাকে যে, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরী করতে হয় তবে পূর্ণ হতে হবে আনন্দিত থাকতে হলে জড় পদার্থকে মধ্য থেকে সরিয়ে দিন। ১ ও ৮ চেতন এবং ০ জড়। যদিও একাগ্রতার জন্য মালায় জপ না করে মনে জপ করাই ভালো কেননা মালায় জপ করলে মন পরিপূর্ণ রূপে নির্বিষয় হয় না, বরং মালার গুটি পাল্টানোতেও মন নিবিষ্ট থাকে । ঈশ্বরের ধ্যানের সময় অন্য কোন কর্ম করা উচিত না ।
যে ব্যক্তি নিজের অহংকারে মত্ত থাকে তার স্থান কীভাবে হ্রাস হয়, নিম্নলিখিত সারণী থেকে বুঝতে পারি।

৮×২=১৬=১+৬=৭
৮×৩=২৪=২+৪=৬
৮×৪=৩২=৩+২=৫

এভাবে বিদ্বান্ গণ দেখতে পান যখন-যখন মায়ামোহতে আবদ্ধ হবে - ঈশ্বরের কৃপা থেকে পতিত হবে। পরমেশ্বর আমাদের (নং ৮ কে) যোগ্যতা প্রদান করেছেন যে, আমরা যদি নিজে-নিজেকে চেনার প্রচেষ্টা করি তবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারি কারণ পরমাত্মাও আমাদের মধ্যে বাস করেন। তিনি সর্বব্যাপক- প্রকৃতিতেও; কিন্তু প্রকৃতি জড়, আমরা চেতন। চেতনের (পরমাত্মা) দর্শন চেতনই (জীবাত্মা) করতে পারে। যখন-যখন যোগকে জানার প্রচেষ্টা করতে থাকবেন এর দর্শন স্পষ্ট হতে থাকবে। বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা সব সম্ভব হতে পারে। এটাই ১০৮ নম্বরের দর্শন (Philosophy) ।

■ মূল: মদন রহেজা

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

শিব কে ? ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুযায়ী আলোচনা

শিব যার অপর নাম মহেশ্বর তার প্রোক্ত ব্যাকরণের উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন -
১। মহাভারতের শান্তিপর্বের শিবসহস্রনামে -
বেদাৎ ষডঙ্গান্যধৃত্য [২৮৪.১৯২]
২। শ্লোকবদ্ধ পাণিনীয় শিক্ষার অন্তে '....মহেশ্বরাৎ'
৩। হৈমবৃহদ্বৃত্ত্যবচূর্ণি পৃষ্ঠা ৩ -

'ব্রাহ্মমৈশানমৈন্দ্রশ্চ..'

৪। ঋগ্বেদকল্পদ্রুম রচয়িতা কেশব যাবলাষ্টক তন্ত্রের উপশাস্ত্রনির্দেশক কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন -

"যস্মিন্ ব্যাকরণান্যষ্টৌ নিরূপ্যন্তে মহান্তি চ ॥১০॥

তত্রাদ্যং ব্রাহ্মমুদিতং দ্বিতীয়ং চান্দ্রমুচ্যতে ।

তৃতীয়ং যাম্যমাখ্যাতং চতুর্থং রৌদ্রমুচ্যতে ॥১১॥

বায়ব্যং পঞ্চমং প্রোক্তং ষষ্ঠং বারুণমুচ্যতে ।

সপ্তমং সৌম্যমাখ্যাতমষ্টমং বৈষ্ণবং তথা ॥১২॥"

এখানে রৌদ্র = রুদ্র = শিবপ্রোক্ত ব্যাকরণের উল্লেখ বিদ্যমান ।

৫। সারস্বতভাষ্যে - সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্ধম্বুকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ ।

৬। ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রপঞ্চে পূর্ব শ্লোকের [পুরুষোত্তম দেবের ভাষ্যব্যাখ্যা টীকা] পাঠান্তর নিম্নরূপ - সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে ততোম্বুকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ । [অনুবন্ধ ৩, পৃষ্ঠা ১২৬]

পরিচয়:

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুযায়ী শিবের মাতার নাম সুরভি ও পিতার নাম প্রজাপতি কশ্যপ । শিবের ১০ ভাইয়ের উল্লেখ আছে যারা ইতিহাসে একাদশ রুদ্র নামে উল্লেখিত । সম্ভবতঃ শিব তাদের সর্বজ্যেষ্ঠ । মহাভারতের অনুশাসন পর্বের অধ্যায় ১৭ মূলত শিবসহস্র নাম । এখানে ঐতিহাসিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্বমিশ্রণ ঘটেছে । শান্তিপর্বের অধ্যায় ২৮৪তেও শিবের ৬০০+ নাম পাওয়া যায়। মহাভারত কর্ণপর্ব ৩৪.১৩ অনুযায়ী ত্রিপুরদাহ করার কারণের শিবের নাম মহাদেব হয়। অনুশাসনপর্ব অধ্যায় ৮৪ শ্লোক ৬০-৭২ অনুযায়ী শিব দেবতাদের হিত কামনায় তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী অবিলুপ্তব্রহ্মচর্য ধারণ করেছিলেন। এজন্য শিবকে ব্রহ্মচারী, ঊর্ধ্বরেতা, ঊর্ধ্বলিঙ্গ ও ঊর্ধ্বশায়ী (উত্তানশায়ী) বলা হয়। যেহেতু শিব নিত্যব্রহ্মচর্য ধারণ করে সন্তান উৎপাদন করেননি তাই তাকে স্থাণু বলা হয় [অনু০ ১৬১.১১,১৫] । অনু০ ১৭.৩৭ অনুযায়ী আরেক নাম বিশালাক্ষ যা শিবের রাজনীতি বিষয়ে দীর্ঘদৃষ্টির পরিচায়ক । কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে এই নাম উল্লেখ করে নানা রাজনৈতিক মত উদ্ধৃত করেছেন । হেমচন্দ্র রচিত অভিধানচিন্তামণি কোষের স্বপোজ্ঞ টীকার শেষে উদ্ধৃত বচনে শিবকে 'গুহ্যগুরু' বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিবন অন্য কারো থেকে শুনে নন, বরং নিজে জ্ঞানার্জন করেছেন, নিরুক্তের ভাষায় তিনি সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন। মহাভারতের কুম্ভকোণম্ সংস্করণের শান্তিপর্বে (১৪২.৪৭) ৭জন বেদপারগদের মধ্যে শিবের নাম বিদ্যমান । এই পর্বেরই ২৮৪ অধ্যায়ে -

সাঙ্খ্যায় সাঙ্খ্যমুখ্যায় সাঙ্খ্যযোগপ্রবর্তিনে॥

গীতবাদিত্রতৎৎবজ্ঞো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ॥

শিল্পিকঃ শিল্পিনাংশ্রেষ্ঠঃ সর্বশিল্পপ্রবর্তকঃ।

বেদাৎষডঙ্গাদুদ্ধৃত্য সাঙ্খ্যযোগাচ্চ যুক্তিতঃ। ১১৪,১৪২,১৪৮,১৯২

অর্থাৎ, শিব সাংখ্যযোগের প্রবর্তক, গীতবাদ্য তত্ত্বজ্ঞ, শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ববিধ শিল্পের প্রবর্তক ছিলেন ।

মৎস্য পুরাণ ২৫২ অধ্যায়ে ১৮ প্রখ্যাত বাস্তুশাস্ত্রযজ্ঞ উপদেশকদের মধ্যে বিশালাক্ষ = শিবের গণনা করা হয়েছে । শান্তিপর্বের ৫৯.৮১-৮২ অনুসারে বিশালাক্ষ দশ হাজার অধ্যায়ের অর্থশাস্ত্র সংক্ষেপে করেছিলেন। শ্রী কবিরাজ সুরমচন্দজী '

আয়ুর্বেদের ইতিহাস' গ্রন্থের ৮৩-৮৯ অব্দি শিবপ্রোক্ত ১২ গ্রন্থ যেমন বৈশালাক্ষ অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, বাস্তুশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও ছন্দঃশাস্ত্র প্রমুখ । সুচরিত মিশ্র মীমাংসা শ্লোকবার্তিকের কাশিকা নাম্নী টীকার ১ম ভাগের ৯ম পৃষ্ঠায় মহেশ্বরপ্রোক্ত মীমাংসাশাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে স্নেহময়ী মায়ের বন্দনা - ২১টি বৈদিক প্রমাণ

ও মা ! তুমি রসময়ী, স্নেহময়ী আমাদের মত সন্তানগণের হিতের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দাও। হে মা ! তুমি ত্যাগময়ী, দয়াময়ী, ক্ষমাময়ী, সত্যময়ী, জ্ঞানময়ী, কর্মময়ী, ধর্মময়ী। বেদ তোমাকে 'আপঃ' 'সরস্বতী', 'উষা', 'অদিতি', 'অসুনীতি', 'পৃথিবী', বিদ্যুৎ', 'অম্বা', 'দেবী', ইত্যাদি শব্দে স্মরণ করেছে। তুমি হলে স্নেহময়ী এবং পরিশুদ্ধ জলের মতো বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ তথা পরিশুদ্ধ হওয়ার কারণে 'সরস্বতী' হও। তুমি প্রকাশময়ী প্রাকৃতিক উষার ন্যায় বুদ্ধি-চিন্তাশক্তির স্ফুরণের কারণে দেদীপ্যমান হওয়ার কারণে 'উষা' হও। তুমি আন্তরিক তথা বাহ্য শত্রুদের দ্বারা অখণ্ডিত এবং অপরাজেয় হওয়ার কারণে 'অদিতি' হও। তুমি নিজের ও নিজের সন্তানদের শরীরে প্রশস্ত প্রাণের নয়ন করার কারণে 'অসুনীতি' হও। তুমি বিস্তীর্ণ ভূমির ন্যায় বিশাল হৃদয়বতী হওয়ার কারণে 'পৃথিবী' হও। তুমি বিদ্যুতের মতো তেজোময় হওয়ার কারণে 'বিদ্যুৎ' হও। তুমি সময়ানুসার সদুপদেশ করার কারণে 'অম্বা' হও। তুমি দিব্য গুণের সাথে প্রকাশিত হওয়ার কারণে 'দেবী' হও। হে মা ! তোমার উপর আমরা গর্বিত, তোমার মতো হওয়ার জন্য আমরা যেন প্রচেষ্টা করি, শিক্ষার দ্বারা যেন প্রভাবিত হই।

(১)

আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু ।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥
ঋ০ ১০।১৭।১০

তাৎপর্যঃ জলের মতো শুদ্ধকারী মায়েরা আমাদের অন্তঃকরণগুলোকে শুদ্ধ করুক। ঘৃত এবং তেজের দ্বারা পবিত্রতা প্রদাত্রী তাঁরা আমাদেরকে শুদ্ধ ঘৃতের আহার করিয়ে তথা স্ব-তেজস্বিতার দ্বারা আমাদেরকে পবিত্র করুক। দিব্যগুণময়ী মায়েরা সব দোষ এবং পাপকে দূর করার ক্ষমতা রাখে। এঁদের সান্নিধ্যে থেকে শুদ্ধ-পবিত্র-প্রদীপ্ত হয়ে আমি বাইরের কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করি।

(২)

ইদমাপ: প্র বহতাবদ্যং চ মলং চ যৎ । যচ্চাভিদুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্ ।
আপো মা তস্মাদেনস: পবমানশ্চ মুঞ্চতু ॥
যজু০ ৬।১৭

তাৎপর্যঃ হে চিত্তকে শুদ্ধ করা জল-তুল্য মায়েরা। ! এই যে আমার ভিতরে নিন্দনীয় এবং মলিন প্রবৃত্তিগুলি রয়েছে, তাঁকে দূরে বহিয়ে দাও। আমি যদি কারও সাথে দ্রোহ করি, অসত্য ভাষণ বা এক অসত্য আচরণ করি এবং কোনো নির্ভয় সজ্জন

ব্যক্তির প্রতি অপশব্দ বলি বা তাঁকে অপমানিত করি, তাহলে সেই পাপ থেকে হে মায়েরা, তুমি এবং পবিত্রতাকারক পিতা আমাদিগকে মুক্ত করো ।

(৩)

মনো॑ মে তর্পয়ত॒ বাচং॑ মে তর্পয়ত প্রা॒ণং মে॑ তর্পয়ত॒ চক্ষু॑র্মে তর্পয়ত॒ শ্রোত্রং॑ মে তর্পয়ত॒াত্মান॑ং মে তর্পয়ত প্র॒জাং মে॑ তর্পয়ত প॒শূন্মে॑ তর্পয়ত গ॒ণান্মে॑ তর্পয়ত গ॒ণা মে॒ মা বি॒তৃষ॑ন্ ॥

যজু০ ৬।৩১

তাৎপর্যঃহে জলের মতো তৃপ্তিদায়ক মাতাগণ। আমার মনকে উত্তম সংকল্পে তৃপ্ত করো, আমার বাণীকে সত্য এবং মাধুর্যের দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার প্রাণকে প্রাণন-শক্তিতে তৃপ্ত করো, আমার চক্ষুকে ভদ্রদর্শনের দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার কানকে ভদ্র শ্রবণের দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার আত্মাকে আত্ম-বলের দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার প্রজাগণকে সদ্গুণের দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার পশুগুলিকে পুষ্টির দ্বারা তৃপ্ত করো, আমার পরিবার এবং সমাজের সদস্যগণকে পারস্পরিক সৌহার্দের দ্বারা তৃপ্ত করো - আমার পারিপার্শ্বিক সকলে যেন কোনো মতেই অতৃপ্ত না থাকে।

(৪)

ইদং ব আপো হৃদয়ময়ং বৎস ঋতাবরীঃ ।

ইহেত্থমেত শক্করীর্যত্রেদং বেশয়ামি বঃ ॥

অথর্ব০ ৩।১৩।৭

তাৎপর্যঃ হে সত্যাচরণময়ী এবং জলের সমান স্নেহময়ী মাতাগণ ! তোমার হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র, আমি হলাম তোমার সন্তান। হে শক্তিময়ী মাতাগণ ! আমি তোমার হৃদয়কে আমার নিজের দিকে প্রেরিত করছি, সেখানে তুমি পৌঁছাও এবং স্বস্নেহ প্রদান করোঁ।

(৫)

উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ ।

বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্ ॥

ঋ০ ৬।৬১।৭

তাৎপর্যঃ দুষ্টতা, অবিদ্যা, দুর্ব্যসন, দুরাচার ইত্যাদির প্রতি ভয়ভীত যে থাকে, আকাশে স্বর্ণিম রেখা টানা বিদ্যুতের সমান সোনালী চরিত্রের আভাকে যে বিকীর্ণ করে দেয়, যে পাপের নাশ এমনভাবে করে যেমনভাবে বিদ্যুৎ মেঘের হনন করে, সেই প্রেম রসময়ী বীরাঙ্গনা মা আমাদের কাছে এই আশা করে, যে আমাদের উৎকৃষ্ট স্তুতি হোক, আমাদের সর্বত্র যশোগান হোক।

(৬)

শিবা নঃ শন্তমা ভব সুমৃডীকা সরস্বতি ।

মা তে যুয়োম সন্দৃশঃ ॥

অথর্ব০ ৭।৬৮।২

তাৎপর্যঃ হে প্রেমরসময়ী মা ! তুমি আমাদের জন্য মঙ্গলকারিণী হও, তুমি আমাদের জন্য শান্তিবর্ষিকা হও, তুমি আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট সুখপ্রদাত্রী হও। আমরা যেন তোমার কৃপা দৃষ্টি থেকে কখনও বঞ্চিত না হই।

(৭)

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ ।

বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥

ঋ০ ১।১১৩।৬

তাৎপর্যঃ হে উষার ন্যায় প্রবোধদায়িনী মা ! তুমি তোমার প্রিয় সন্তানগণকে, তাঁদের রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক-পৃথক গঠনপ্রক্রিয়ায় নাও । কাউকে তুমি ক্ষত্রিয়ত্বের শিক্ষা দাও, কাউকে অন্ন উৎপাদনের, ধনোপার্জনের আদি বৈশ্যকর্মের শিক্ষা দাও। কাউকে তুমি যজ্ঞ করা-করানো আদি ব্রাহ্মণোচিত কর্মের পাঠ দান করো, কাউকে তুমি ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করা মানে সেবকের কর্ম শেখাও। এই প্রকারে বিভিন্ন রুচিযুক্ত মানবগণকে তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জ্ঞান দেওয়ার জন্য তুমি উপদেশ প্রদান করে থাকো।

(৮)

মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বি ভাহি ।

প্রশস্তিকৃদ্ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা নো জনে জনয় বিশ্ববারে ॥

ঋ০ ১।১১৩।১৯

তাৎপর্যঃ হে উষার মতো প্রাণদায়িনী মাতা। তুমি বিদ্বান সন্তানদের মাতা হও, সৈনিকদের ন্যায় রাষ্ট্রভূমির রক্ষক হও; দেবপূজা, দান এবং সংগঠনের কার্যের পতাকা হও। এরকমই মহা মহিমাময়ী তুমি সর্বত্র কীর্তির দ্বারা প্রকাশিত হও। আমাদেরকে প্রশস্তি প্রদান করো, জ্ঞান-প্রকাশের জন্য অন্ধকার থেকে আমাদের উদ্ধার করো। হে সবার বরণ করে নিজের শরণে নেওয়া মা ! মানবের মাঝে তুমি আমাদেরকে বিশেষ গুণের দ্বারা প্রসিদ্ধ করো ।

(৯)

মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্র যন্ধি ।

চিত্রং রয়িং যশসং ধেহ্যস্মে দেবি মর্তেষু মানুষি শ্রবস্যুম্ ॥

ঋ০ ৭।৭৫।২

তাৎপর্যঃ হে উষার মতো তেজস্বিনী মা ! আজ তুমি আমাদেরকে মহান সম্মার্গে চলার জন্য প্রবুদ্ধ করো। তুমি আমাদেরকে মহান সৌভাগ্যের জন্য নিয়ম-পরায়ণ করো । আমাদেরকে যশোময় অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রদান করো। হে দিব্যগুণময়ী মানুষী মা। তুমি মরণধর্মা মনুষ্যগণের মধ্যে আমাদেরকে কীর্তির ইচ্ছুক করে তোলো।

(১০)

অন্তিবামা দূরে অমিত্রমুচ্ছোর্বীং গব্যূতিমভয়ং কৃধী নঃ ।

যাবয় দ্বেষ আ ভরা বসূনি চোদয় রাধো গৃণতে মঘোনি ॥

ঋ০ ৭।৭৭।৪

তাৎপর্যঃ হে উষার মতো দিব্য প্রকাশে পরিপূর্ণ মা ! তোমার কাছে অনন্ত সুন্দর গুণসমূহের ভাণ্ডার বিদ্যমান। তুমি শত্রুকে আমাদের কাছ থেকে দূর করো, বিস্তৃত কর্তব্যমার্গকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করোঁ, আমাদেরকে অভয় প্রদান করো। বিদ্বেষ ভাবনাকে আমাদের থেকে পৃথক করো। হে প্রশস্ত ঐশ্বর্যযুক্তা মা ! আমাদের জন্য প্রশস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এসো, আমাদের মতো উপাসকদের জীবনে সফলতা লাভ করাও।

(১১)

অদিতির্নো দিবা পশুমদিতির্নক্তমদ্বয়াঃ ।

অদিতিঃ পাত্বংহসঃ সদাবৃধা ॥

ঋ০ ৮।১৮।৬

তাৎপর্যঃ অদীন = সমৃদ্ধশালিনী এবং বিঘ্নগুলো থেকে অক্ষত=অখণ্ডিত, মন ও কাজে এক রকম এমন মা দিনের বেলায় আমাদের দর্শন এবং বিবেককে অক্ষুন্ন রাখুন, রাত্রিতেও আমাদের দর্শন এবং বিবেককে অক্ষুন্ন রাখুন। সদা আমাদের উন্নতি করানো সেই মা আমাদেরকে বিনাশক পাপপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখুক।

(১২)

উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যা গমৎ ।

সা শন্তাতি ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥

ঋ০ ৮।১৮।৭

তাৎপর্যঃ মননশীল, অদীন, অখণ্ডিত সেই মা প্রতিদিন তাঁর রক্ষার ছত্রছায়ার সাথে আমাদেব নিকটে আসুক। সে আমাদেরকে শান্তিদায়ক সুখ প্রদান করুক, সে হিংসাবৃত্তি এবং হিংস্রকগণকে আমাদের কাছ থেকে দূর করুক।

(১৩)

অনেহো ন উরুব্রজ উরূচি বি প্রসর্তবে ।

কৃধি তোকায় জীবসে ॥

ঋ০ ৮।৬৭।১২

তাৎপর্যঃ হে বিশাল জ্ঞানরূপ গতিযুক্তা - হে মহান কর্মশীলা মা ! তুমি আমাদেরকে নিষ্পাপ করে তোলো, যার ফলে আমরা বিশিষ্ট উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারি। তুমি তোমার সন্তানগণকে উৎকৃষ্ট জীবন উপভোগকারী করে তোলো।

(১৪)

বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে ।

যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নি যচ্ছাৎ॥

অথর্ব০ ৭।৬।৪

তাৎপর্যঃ জাগতিক এবং পারমার্থিক শক্তি লাভের জন্য আমরা অদীন, অখণ্ডিত, অপরাজিত, পূজনীয় মাকে নিজের কথার দ্বারা অনুকূল করছি। উন্নতির অসীম আকাশ যাঁর ক্রোড়ে বিদ্যমান, সেই মা আমাদেরকে শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক এই তিনটি দুঃখের নিবারণ করা নিজের শরণ প্রদান করুক এবং শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা তিন ঋতুতে সুখকর ত্রিতল ঘর প্রদান করুক।

(১৫)

অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্র তিরা ন আয়ুঃ ।

রারন্ধি নঃ সূর্যস্য সন্দৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥

ঋ০ ১০।৫৯।৫

তাৎপর্যঃ হে প্রাণদায়িনী মা! তুমি আমাদের ভেতরে মনোবলকে ধারণ করাও, উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য আমাদের আয়ুকে অধিকাধিক বাড়াও। আমাদেরকে এমন যোগ্য করে তোলো যে আমরা সফলতার সূর্যের দর্শন করতে পারি। ঘৃত আদি পুষ্টিকর পদার্থের দ্বারা এবং তেজের দ্বারা তুমি আমাদের শরীরকে পরিপুষ্ট করো।

(১৬)

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্ ।

জ্যোক্পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তি ॥

ঋ০ ১০।৫৯।৬

তাৎপর্যঃ হে প্রাণদায়িনী মা ! যদি আমাদের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গুলি এবং প্রাণ-অপান আদি ক্ষীণ হয়ে গেছে, তো তুমি পুনরায় তাঁদের শক্তি আমাদেরকে প্রদান করো। পুনরায় আমাদের ভেতর উৎকৃষ্ট ভোগসমূহকে ভোগার শক্তি উৎপন্ন করো। তোমার ছত্রছায়াতে থেকে আমরা চিরকাল পর্যন্ত বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সূর্যের দর্শন করতে থাকি। হে অনুকূল মতিপ্রদাত্রী মা। তুমি আমাদেরকে সুখী কর, আমাদেরকে কল্যাণ প্রদান করো।

(১৭)

স্যো॒না পৃ॑থিবি নো ভবানৃক্ষ॒রা নি॒বেশ॑নী । যচ্ছা॑ ন॒: শর্म॑ স॒প্রথা॑: । অপ॑ ন॒: শোশু॑চদ॒ঘম্ ॥

যজু০ ৩৫।২১

তাৎপর্যঃ হে মা! তুমি হলে সাক্ষাৎ পৃথিবীস্বরূপা, পৃথিবীর সদৃশ বিস্তীর্ণহৃদয়া, উদার, ক্ষমাশীল, সমদর্শিনী, সর্বংসহা এবং পরোপকারিণী। তুমি আমাদের জন্য পৃথিবীর সমান সুখদায়িনী, অকণ্টক, ক্রুরতাদি-দোষরহিত তথা নিবাস প্রদান-কর্ত্রী হও। পৃথিবীর সমান কীর্তির দ্বারা প্রখ্যাত হয়ে তুমি আমাদেরকে সর্ববিধ কল্যাণ প্রদান কর। তুমি আমাদের পাপপ্রবৃত্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও।

(১৮)

প্রাগপা॒গুদ॑গধ॒রাক্স॒র্বত॑স্ত্বা॒ দিশ॒ আধা॑বন্তু । অম্ব॒ নিষ্প॑র॒ সম॒রীর্বিদাম্ ॥

যজু০ ৬।৩৬

তাৎপর্যঃ হে অম্বা = হে সদুপদেশ এবং সৎ পরামর্শের দ্বারা কৃতার্থ করা মা ! পূর্ব-পশ্চিম- উত্তর-দক্ষিণ সবদিকগুলি, দিগ্‌বাসিনী প্রজাসমূহ, দৌড়ে দৌড়ে তোমার নিকটে আসুক। হে মা! তুমি সেসব প্রজাদের পালন করো, নিস্তার করো, উদ্ধার করো। তারা সবাই তোমার নির্ভয় কোলে বিশ্রাম করে তোমার প্রেমকে জানুক।

(১৯)

মা সু ভি॑ষ্থা॒ মা সু রি॒ষোঽস্ব॑ ধৃষ্ণু বী॒রয়॑স্ব॒ সু । অ॒গ্নিশ্চে॒দং ক॑রিষ্যথঃ ॥

যজু০ ১১।৬৮

তাৎপর্যঃ হে মা! তুমি আমাদের মধ্যে বিভেদ হতে দিও না, তুমি আমাদেরকে হিংসার পাত্র হতে দিও না। তুমি আমাদের দ্বারা স্থিরতাপূর্বক বীরতার কর্ম করাও। তুমি এবং তোমার অগ্নিতুল্য সন্তান দুইজনে মিলে মহানকার্যগুলিকে পূর্ণ করবে।

(২০)

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্ ॥

ঋ০ ১।২২।১১

তাৎপর্যঃ কর্মকুশল, পুরুষার্থীগণের পত্নী, দিব্যগুণময়ী মাতাগণ অখণ্ডিত ডানাযুক্তা অর্থাৎ উন্নতির সমস্ত সাধনে সম্পন্ন হয়ে নিজের শুভকামনা, প্রীতি, রক্ষা, শাস্ত্র-শ্রবণ, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদির সাথে এবং মহান কল্যাণের সাথে আমাদের সমীপে এসে আমাদেরকে লাভান্বিত করতে থাকুক।

হে মাতাগণ ! আমরা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাতে অবনত। তোমার ত্যাগ, তপ, বাৎসল্য, পরোপকার, সন্তান নির্মাণের চিন্তা, লক্ষ্যের প্রতি জাগ্রত চেতনা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মপরায়ণতা, প্রশিক্ষণ-কুশলতা ইত্যাদির প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার জন্য আমরা শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার ঋণ থেকে আমরা কখনও মুক্ত হতে পারি না। আমরা তোমার চরণ-ধূলা মাথায় নেই, আমরা তোমাকে শত-শত প্রণাম অর্পণ করি। আমাদের মতো সন্তানদের জন্য বেদ ভগবানের যে নিম্নলিখিত আদেশ, তাকে আমরা সদা স্মরণে রাখব-

(২১) সীদ॒ ত্বং মা॒তুর॒স্যা উ॒পস্থে॒ বিশ্বা॑ন্যগ্নে ব॒য়ুনা॑নি বি॒দ্বান্ ।
মৈ॑না॒ং তপ॑সা॒ মার্চি॒ষা॒ঽভি শো॑চীর॒ন্তর॑স্যাং শু॒ক্রজ্যো॑তি॒র্বি ভা॑হি ॥
যজু০ ১২।১৫
তাৎপর্যঃ ওহে মায়ের কাছ থেকে বিদ্যা, সুশিক্ষা ইত্যাদির কামনা করা সন্তান ! তুই মায়ের কাছে বস, সববিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিদ্বান হ। তুই মাকে সন্তাপ দিয়ে এবং শোক-জ্বালা দিয়ে কখনও শোকাকুল করিস্ না। মায়ের সামীপ্যে থেকে শুদ্ধ মন এবং শুদ্ধ আচরণের জ্যোতিতে দেদীপ্যমান হ।
হে মাতাগণ! আমরা পুনরায় তোমাদেরকে প্রণাম করছি, তোমাদের বহুমূল্য আশীর্বাদকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করছি, আমাদের কাছ থেকে তোমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাকে পূর্ণ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি।
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

কেনোপনিষদে ত্রৈতবাদ

কেনোপনিষদে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ:-

ঈশ্বর- উপনিষদের প্রারম্ভে "ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে- এই ব্রহ্মই এই শরীরে দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, মনন-শক্তি, বাক্-শক্তি এবং প্রাণন-শক্তির দাতা (শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো য়দ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ)। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনন্ত হওয়ার কারণে অতীন্দ্রিয়। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁর সীমা জানতে পারে না (ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো)। তৃতীয় খণ্ডে আলংকারিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে ব্রহ্মের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এই খণ্ডে ব্রহ্মকে 'যক্ষ' নামে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি হৃদয়াকাশে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রকট হন। এভাবে উপনিষদের সর্বত্রই ব্রহ্মের মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

জীব- এই উপনিষদের অনেক স্থলে উপাস্য-উপাসক এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব দ্বারা ব্রহ্ম থেকে জীবের ভিন্নতার স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে-

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। (কেন০ ২।৫)"

=এই মনুষ্য-জন্মে এসে জীব যদি সেই ব্রহ্মকে জানতে পারে, তখনই তো তার জীবন সফল হয়, নতুবা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে তার মহা-দুঃখ লাভ হয়। এতে স্পষ্ট যে, জন্ম-জন্মান্তরে ব্রহ্ম জ্ঞাতা নয়, বরং ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন জীবাত্মাই জ্ঞাতা; আর জীব জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জেনে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। এই সংসারে বন্ধ ও মুক্ত হওয়া জীবাত্মা, ব্রহ্ম থেকে পৃথক। চতুর্থ খণ্ডে পাপ-প্রবৃত্তি থেকে জীবাত্মাকেই মুক্ত হতে বলা হয়েছে-

"য়ো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্মানম্। অনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠিতি প্রতিতিষ্ঠতি। (কেন০ ৪।৯)"

= যে বিদ্বান এই ব্রহ্মবিদ্যাকে জেনে পাপ-বাসনা থেকে মুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করে মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হন।

প্রকৃতি- এই উপনিষদের প্রথম খণ্ডে জীবের উপাস্য কে এবং কার উপাসনা করা উচিত নয়- এর বর্ণনায় 'ইদম্' শব্দ দ্বারা প্রকৃতি ও তার কার্যরূপকে নির্দেশ করা বলা হয়েছে- এই যে দৃশ্যমান অনাত্ম বাহ্য-জগৎ, যাকে মানুষ উপাসনা করে, সেটি ব্রহ্ম নয়। এখানে স্পষ্টত জড় প্রকৃতিকে ব্রহ্ম থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

মুণ্ডকোপনিষদে ত্রৈতবাদ

- **মুণ্ডকোপনিষদে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ:-**

ঈশ্বর- এই উপনিষদের প্রারম্ভেই 'পরা' ও 'অপরা' দুই প্রকারের বিদ্যার বর্ণনা করা হয়েছে। পরাবিদ্যা বলতে সেই বিদ্যাকেই বোঝায়, যার দ্বারা 'অক্ষর' অবিনাশী ঈশ্বরের জ্ঞান হয়- "অথ পরা য়য়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। সেই ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করে উপনিষৎকার ঋষি বলছেন-

"য়ত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং য়দ্ভূতয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥"

মুণ্ডক০ ১।১।৬

= তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নন, কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় নন, গোত্র রহিত, লাল-পীতাদি বর্ণ রহিত, চক্ষু, কর্ণাদি রহিত, হস্ত-পদ রহিত, সর্বত্র ব্যাপক এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বৃদ্ধি-ক্ষয় রহিত, অবিনাশী, সর্বব্যাপী, চরাচর সৃষ্টির কারণ সেই ব্রহ্মকে বিবেকী পুরুষ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সর্বত্র দর্শন করেন।

"দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রা হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

মুণ্ডক০ ২।১।২

= তিনি প্রকাশমান, মূর্তধর্মরহিত, সর্বত্র ব্যাপক। তিনি প্রত্যেক পদার্থের বাইরে ও ভেতরে বিদ্যমান। তিনি উৎপত্তিরহিত, প্রাণরহিত, মনরহিত; অতএব তিনি শুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেও পরম সূক্ষ্ম।

জীবাত্মা- এই উপনিষদে জীবাত্মার ক্ষেত্রে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ করে ব্রহ্মকে তার লক্ষ্য বলা হয়েছে- "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। এখানে জীব ও ব্রহ্মের উল্লেখ এক স্থানেই পাওয়া যায়। জীবাত্মাকে সাধক এবং ব্রহ্মকে সাধ্য বলা হয়েছে। জীবাত্মাকে এই উপনিষদে 'পশ্য' বলে তাকে দ্রষ্টা বলা হয়েছে-

"য়দা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ময়োনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

মুণ্ডক০ ৩।১।৩

= দ্রষ্টা জীব যখন প্রকাশস্বরূপ, বিশ্বের কর্তা, বেদোৎপাদক পরম-পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন ওই ব্রহ্মজ্ঞানী পুণ্য-পাপকে দূর (অপসারণ) করে নির্মল হয়ে পরম সমতা লাভ করেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥৮॥

মুণ্ডক০ ২।২।৮

=সেই পরমেশ্বরকে জানার পর জীবের হৃদয়স্থিত অবিদ্যার গ্রন্থি নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়।

এভাবে জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা স্পষ্ট।

প্রকৃতি- প্রকৃতিকে এই উপনিষদে 'অক্ষর' শব্দে অভিহিত করা হয়েছে এবং পরমাত্মাকে সেই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেও পরম সূক্ষ্ম বলা হয়েছে -

"দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

মুণ্ডক০ ২।১।২

=নিশ্চয়ই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ ও মূর্তি-রহিত। তিনি সর্বব্যাপক, জগতের প্রত্যেক পদার্থের বাইরে এবং অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত। তিনি জন্ম-রহিত, প্রাণের ক্রিয়া-রহিত এবং মন-রহিত।

অতএব, তিনি শুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম অব্যাকৃতরূপ প্রকৃতি থেকেও পরম সূক্ষ্ম।

তাছাড়া প্রকৃতির জন্য এই উপনিষদে 'বৃক্ষ' শব্দের উল্লেখও হয়েছে-

"দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

মুণ্ডক০ ৩।১।১

= অনাদিকাল থেকে একসাথে অবস্থানকারী এবং পরস্পর মৈত্রীভাবযুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপ দুটি পক্ষী একই সংসাররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছেন। এই উভয়ের মধ্যে এক জীবাত্মা এই সংসার-বৃক্ষের পরিপক্ক ফল (সুখ-দুঃখাত্মক কর্মফল) আস্বাদনপূর্বক ভোগ করে, অন্য পরমাত্মা ফল ভোগ না করে কেবল সাক্ষীরূপে জীবের কর্মকে দেখেন।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 'বৃক্ষ' শব্দের অর্থে লিখেছেন-
"য়ো বৃশ্চ্যতে ছিদ্যতে তং কার্যকারণাখ্যং বা" অর্থাৎ অনাদি মূলস্বরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্যযুক্ত বৃক্ষ, অর্থাৎ যা স্থূল হয়ে পুনরায় প্রলয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সেই প্রকৃতিই বৃক্ষ (স০ প্র০, ৮ম সমু০)।

তিন তত্ত্বকে একত্রে বর্ণন- এই উপনিষদে ঈশ্বর, জীবাত্মা এবং প্রকৃতির একত্রে উল্লেখ এবং এদের ভিন্নতার বর্ণনা পাওয়া যায়; যথা-

"দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং য়দা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

(মুণ্ডক০ ৩।১।১-২)

= "পরস্পর মৈত্রীভাবযুক্ত ঈশ্বর এবং জীবরূপ দুই পক্ষী অনাদিরূপ সংসাররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছেন। এই উভয়ের মধ্যে জীব সুখ- দুঃখাত্মক কর্মফল ভোগ করে, আর ঈশ্বর কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন। জীবাত্মা অজ্ঞানে নিমগ্ন থাকায় সংসার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, কিন্তু যখন ঈশ্বরকে নিজের থেকে পৃথকভাবে দেখেন, তখন তিনি শোকরহিত হয়ে যান।

এইপ্রকারে উক্ত শ্রুতিতে দুটি চেতন সত্তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যার মধ্যে একটি জীবাত্মা যিনি ভোক্তা এবং অন্যটি ঈশ্বর যিনি সাক্ষীরূপে জীবকে ফল ভোগ করতে দেখেন। এঁরা উভয়ই প্রকৃতির কার্যরূপ সংসার-বৃক্ষে বসে আছেন। এভাবে এই উপনিষদে "ত্রৈতবাদ" সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ঈশ্বর মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর নাকি অধীন ?

✅প্রশ্নঃ ঈশ্বর মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর নাকি অধীন ❓

■ উত্তরঃ ঈশ্বর কোনকিছুর অধীন নন বরং তিনি সকল কিছুর অধীশ্বর। তিনিই এই সমগ্র জগৎ তথা প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন এবং তাতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥
শ্বেতাশ্বতর ৪।১০

সরলার্থঃ মায়াকে প্রকৃতি বলে জানবে এবং মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলে জানবে। তাঁর একদেশস্থ পাঁচ অঙ্গভূত অর্থাৎ পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত ।

'মায়া' শব্দটির প্রকরণানুসারে অনেক প্রকার অর্থ হয়। নিঘণ্টু অনুসারে 'মায়া' বুদ্ধির একটি নাম। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যে ঋষি প্রকৃতিকেই 'মায়া' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করেছেন। মায়ার সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে— যে তত্ত্ব কোনো তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয় অর্থাৎ কেবল কারণ, তা-ই 'মায়া' বা 'মূল প্রকৃতি'। মায়া বা প্রকৃতিই জগতের উপাদান-কারণ, যার সহযোগে পরমাত্মা এই দৃশ্যমান জগৎ রচনা করেছেন। প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে স্বয়ং কিছু উৎপন্ন করতে পারে না, পরমাত্মাই প্রকৃতিতে গতির সঞ্চার করেন। মায়াপতি হওয়ার কারণেই পরমাত্মাকে 'মায়াধীশ' বলা হয়। কারণ ঈশ্বরের সত্তা এবং অসীম ক্ষমতা দ্বারাই জগতের সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথ নিয়মে চলছে। কেননা এই বিশাল পৃথিবী, সূর্যাদি লোকলোকান্তর সঠিক নিয়ম ব্যবস্থাতে চালিত করার কোনো সামর্থ্য জীবাত্মার নেই। সেই ঈশ্বরের একদেশস্থ পঞ্চমহাভূত দ্বারা এই জড়-জগৎ নির্মিত ও ব্যাপ্ত হয়েছে ।

এই শ্রুতিতে জগৎকে পরমাত্মার অঙ্গভূত বলা হয়েছে। বেদ বলছে এই জগৎ পরমাত্মারই মহিমা এবং তা পরমাত্মার এক পাদ। যথা— "এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ (ঋ০ ১০।৯০।৩)" অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) এই পরমাত্মার মহিমার সূচক। পরমাত্মা তো এর থেকেও অধিক মহান! 'মূল-প্রকৃতি' থেকে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' পর্যন্ত ওই পুরুষের এক পাদ। এঁর তিন পাদ প্রকাশ স্বরূপে অবিনাশী। পরের মন্ত্রে বলা হয়েছে—

“ত্রিপাদূর্ধ্বং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ” (ঋ০ ১০।৯০।৪) তিন পাদযুক্ত এই পুরুষই সবার ঊর্ধ্বে বিরাজমান, তাঁর এক পাদ জগৎরূপে প্রকট হয় ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

প্রার্থনা ও অভিশাপে কি আসলেই ফল হয় ?

✅প্রার্থনা ও অভিশাপে কি আসলেই ফল হয়❓

▪ উত্তর: ঈশ্বরের নিকট করা প্রার্থনাকে উর্দুতে দুয়া বলা হয় এবং কোন ব্যথিত হৃদয় থেকে নির্গত দীর্ঘশ্বাসকে শাপ বলা হয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, দুইয়েরই প্রভাব অবশ্যই পড়ে। শব্দের প্রভাব পড়ে। যেরূপ সৎ-সঙ্গের (যেখানে সত্য কথা শ্রবণকারী ভক্ত একত্রিত হন) প্রভাব পড়ে, সেরূপ কেউ দুঃখী হয়ে বাধ্য অবস্থায় কাউকে (যে দুঃখ দিয়েছে) এমন কথা বলে দেয় যার ফলে বক্তার মনের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায়, কিন্তু শ্রবণকারীও ভয়ভীত হয়ে যায় আর তাকে সত্য মনে করে - তাকে শাপ অথবা বদ্‌দোয়া বলা হয়। দুয়া 'প্রার্থনা' এবং বদ্‌দোয়া 'শাপ'কেই বলা হয়। শব্দ দুটো এজন্য ব্যাখ্যা করা হলো কেননা পারিপার্শ্বিক নানা কারণে সনাতনীরা দুটো শব্দের সঠিক সনাতনী প্রতিশব্দ জানেন না ।

মা-বাবা-গুরু-অতিথি আদিরা আশীর্বাদ প্রদান করেন আশিস প্রদান করেন যার ফলে মনে প্রসন্নতা অনুভূত হয় বক্তা ও শ্রবণকারীর উভয়ে- প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বলা হয় যে যেখানে ঔষধ কাজ করে না সেখানে প্রার্থনা কাজে লাগে। প্রার্থনার ফলে মন শান্ত হয় মানসিক স্থিতির বল প্রদান হয় এবং বহু রকমের মানসিক রোগ ঠিক হয়ে যায়। ঈশ্বরের নিকট করা প্রার্থনার প্রভাব তো অবশ্যই পড়ে, আর যদি সেই প্রার্থনা উচিত ধর্মপূর্বক এবং যথা সম্ভব পরিশ্রম করার পর করা হয় তখন ঈশ্বর তাকে অবশ্যই বর প্রদান করেন! একথা সত্য।
কাউকে অভিশাপ প্রদান করা হলে যে, তুমি মারা যাবে আর শীঘ্রই মারা যাবে! সেই মানুষ কী প্রকৃতই শীঘ্র মারা যাবে? এ নিঃসন্দেহে ভ্রান্তি! যে এরূপ অত্যন্ত কঠিন অভিশাপ পেয়েছে প্রকৃতই তার হৃদয় তো দুর্বল হয়েই যাবে কারণ সে এরূপ কু-কর্ম করেছে হয়তো যেরূপ সে অভিশাপ পেয়েছে। সেই ব্যক্তির মানসিক স্থিতি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে তার পাপ তাকে সদা দংশন করবে - সর্বদা তার এই শাপ মনে থাকবে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে আর হতে পারে এমতাবস্থায় তার অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর সে প্রকৃতই মারা যাবে। এ হল অভিশাপের প্রভাব। কিন্তু এখানে বোঝার বিষয় এই যে, তার মৃত্যু কী অভিশাপের প্রভাবে হল? না, এবং হ্যাঁও! যদি সেই ব্যক্তি কোন ভুল কাজ না করে থাকে আর ভ্রান্তির শিকার হয়ে কেউ তাকে অজ্ঞানতাপূর্বক শাপ দিয়ে থাকে তবে তার প্রভাব এরূপ প্রকৃত ব্যক্তিকে বিচলিত করতে পারে না! আর যদি প্রকৃতই সেই ব্যক্তি কু-কর্ম করে থাকে তবে তার উপর শাপের প্রভাব পড়বে এবং সে বিচলিত হয়ে যাবে আর মানসিক বল হ্রাস পাবে আর তার দুর্দশা হবে।
সৎ ব্যক্তি কাউকে ভয় পায় না। সে কেবল ঈশ্বরকে ভয় পায়; আর অসৎ ব্যক্তি সবাইকে ভয় পায় কারণ সে ঈশ্বরের কর্মফল ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখে না।
পরমপিতা পরমাত্মা সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ। যাচনা করতে হলে ঈশ্বরের কাছে করো। কুকর্ম থেকে দূরে থাকো! ঈশ্বর সর্বদা সবাইকে লক্ষ্য রাখেন, তার থেকে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না! কারোর কল্যাণ করার ক্ষমতা না থাকলে খারাপ

করবে না! কারোর জন্য খারাপ ভাববে না। কখনও এমন না হয় যা অন্যের জন্য খারাপ চিন্তা করা হয় তা নিজের সঙ্গে ঘটিত হয়! সবার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করো কাউকে অভিশাপ দিও না সবার জন্য ভদ্র কথা বলবে, অবশিষ্ট সমস্ত কিছু ঈশ্বরের ন্যায়-ব্যবস্থাকে সমর্পিত করো। সবার কর্মফল সেই পরমাত্মা প্রদান করেন। কাউকে অভিশাপ প্রদান করে, কু-বাক্য প্রদান করে নিজের ভিতর কেন নোংরা সংস্কারের বীজ বপন করবে? এতে দ্বেষ বৃদ্ধি পাবে – নিজের মনও দুঃখীই হবে! সবার কল্যাণে নিজের কল্যাণ। 'সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ' এই শ্লোকাংশের বিচার করুন এবং নিজের আচরণে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করতে থাকুন।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদভাষ্যের বিশেষত্ব

স্বামী দয়ানন্দের বেদভাষ্য

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্বেদ সংহিতার শুরু থেকে ৭ম মণ্ডলের, ৬১ সূক্তে ৬ মন্ত্র পর্যন্ত এবং বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিন যজুর্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ ভাষ্য করেছেন। তাঁর এই বেদভাষ্য পূর্ববর্তী ভাষ্য অপেক্ষা অনেক নতুন বিশেষত্ব রাখে, যার মধ্যে থেকে কিছু কিছু এখানে দেখানো উপযুক্ত হবে–

বৈদিক দেবের অর্থ অনুসন্ধান

বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনৌ, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, রুদ্র, সবিতা আদি পুংলিঙ্গবাচক দেবের তথা অদিতি, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী আদি স্ত্রীলিঙ্গবাচক দেবতাদের বারংবার বর্ণনা আছে। উবট, সায়ণ, মহীধর আদি পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ এদের পৃথক্-পৃথক্ স্বতন্ত্র দেব-দেবী বলে স্বীকার করতেন তথা এটি মানতেন যে বেদ বর্ণিত প্রত্যেক প্রাকৃতিক দেবতা উষা, সূর্য, পৃথিবী, আপঃ, নদী, ওষধি আদির এক-এক স্বতন্ত্র চেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, সেই চেতন দেবতার এই নাম দ্বারা বেদে স্তুতি করা হয়েছে। যে দেবতাদের প্রাকৃতিক স্বরূপ নিশ্চিত নয় তিনিই স্বতন্ত্র চেতন দেবতা, যজ্ঞে আবাহন করার পর এসব দেবতা হবি দ্বারা প্রসন্ন হয়ে যজমানকে পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন আদি প্রদান করতেন। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ প্রমাণসহ এটি ঘোষণা করেছেন বেদ অনেকেশ্বরবাদী নয়, বরং বেদের বিভিন্ন পুংলিঙ্গবাচী এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচী দেবতা পিতা এবং মাতার রূপে এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মারই গুণকর্ম বোধক বিভিন্ন নাম। বেদের বর্ণনশৈলীর এই বিস্ময় যে সেইসাথে ঐ দেবতা শরীরে আত্মা, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অপান, উদান, চক্ষু, শোত্র আদির; রাষ্ট্রে রাজা, সেনাপতি, ন্যায়াধীশ, গৃহপতি, আচার্য আদির এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল আদির বাচকও হয়। যেখানে যেমন প্রকরণ, সেখানে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করা উচিৎ।

এই দৃষ্টিকে ধ্যানে রেখে দয়ানন্দ-ভাষ্যে প্রসঙ্গ বা উচিৎ অনুসারে 'অগ্নি' এর অগ্রণী, বিজ্ঞানস্বরূপ, সর্ববিদ্যোপদেষ্টা, স্বয়ং প্রকাশমান, প্রকাশক পরমেশ্বর, বিদ্বান অধ্যাপক, উপদেশক, অগ্রনায়ক রাজা, বীর সেনাপতি, যজ্ঞাগ্নি, শিল্পে প্রয়োগ করার যোগ্য ভৌতিক অগ্নি আদি অর্থ করা হয়েছে। 'ইন্দ্র' কে ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর, শত্রু বিদারক রাজা, সভাসদ্-সেনা-ন্যায়াধীশ,

বিদ্যার্থীদের জড়তার বিচ্ছেদক গুরু, বায়ু, বিদ্যুৎ, সূর্য আদি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। ‘রুদ্র’ কে দুষ্টরোদক পরমাত্মা, জীবাত্মা, বৈদ্য, বায়ু, প্রাণ, শত্রু সংহারক সেনাপতি, ব্রহ্মচারী আদি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'অশ্বিনী' কে রাজা-অমাত্য, প্রাণ-অপান, জল-অগ্নি, বায়ু-বিদ্যুৎ, সূর্য-চন্দ্র, অধ্যাপক-উপদেশক, সভেশ সৈনেশ আদি অর্থ করা হয়েছে।

বৈদিক দেবীকেও স্বামী দয়ানন্দ ভৌতিক জগত এবং শরীরের সাথে সাথে সমাজেও প্রয়োগ করেছেন। সে অনুসারে তাঁর ভাষ্যে 'উষা' এর অর্থ প্রভাতবেলা বা সন্ধ্যা ছাড়াও 'উষার ন্যায় জ্ঞান দ্বারা সমস্ত রূপের প্রকাশিকা বিদুষী স্ত্রী' ও করেছেন।[১] এই প্রকার 'সরস্বতী' এর অর্থ বাণী এবং বেগবতী নদীর অতিরিক্ত বিদুষী কন্যা, প্রশস্তজ্ঞানবতী বিদুষী স্ত্রী, প্রশস্ত বিজ্ঞানযুক্ত পত্নী, শিক্ষিতা মাতা এবং বেদাদিশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানযুক্ত অধ্যাপিকাও করেছেন।[২] প্রচুর বৈদিক দেবতাগণকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অর্থে নিয়ে সম্পূর্ণ মন্ত্রকে সামাজিক বা রাষ্ট্রপরক অর্থের ব্যাখ্যা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীরই মহিমান্বিত কৃতিত্ব। এর পূর্ব ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐরূপ অর্থের সংকেত কোন কোন স্থলে দেয়া হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক দেবতার যে অর্থ করেছেন তা স্বয়ং বেদ দ্বারা তথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, আরণ্যক ও বেদাঙ্গ সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত।

বেদ মন্ত্রের বহুবিধ অর্থ

বেদ মন্ত্রের অধ্যাত্ম, অধিদৈবত, অধিযজ্ঞ আদি অর্থ করার পরম্পরা প্রথম থেকেই ছিলো। যাস্কাচার্য নিজের নিরুক্তে কোন এই প্রকারের মন্ত্র-ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ এই পরম্পরাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি মন্ত্রার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন পারমার্থিক অর্থ এবং ব্যাবহারিক অর্থ।[৩] এই দুটিতে পূর্বজ আচার্যগণ দ্বারা নির্ধারিত অধ্যাত্ম, অধিদৈবত, অধিযজ্ঞ, অধিভূত আদি সকল অর্থ-প্রক্রিয়া সমাবিষ্ট হয়। পরমেশ্বর তথা পরমেশ্বর-প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় অর্থ পারমার্থিক প্রক্রিয়াতে এবং শেষ সকল অর্থ ব্যাবহারিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

স্বামী দয়ানন্দ নিজের বেদভাষ্যে এক বেদ মন্ত্রের অনেক পক্ষে অর্থ যোজনা অনেক স্থলে করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম পাঁচ অগ্নিদেবতাক মন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি পরমেশ্বরপক্ষে তথা শিল্পাগ্নিপক্ষে করেছেন। 'ধূরসি ধূর্বন্তম্' যজু০ ১।৮ মন্ত্রেও অগ্নির অর্থ পরমেশ্বর তথা শিল্পসাধক অগ্নি দুটিই নিয়েছেন। বায়ুদেবতাকে ঋক০ ১।২।১-৩ এই তিন মন্ত্রের ব্যাখ্যা পরমেশ্বর তথা ভৌতিক বায়ু দুটি পক্ষেই করেছেন। ইন্দ্র দেবতার 'যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষম্' ঋক০ ১।৬।১ মন্ত্রকে পরমেশ্বর, আদিত্য এবং প্রাণ তিন পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো' ঋক০ ১।৩৫।২ আদি সবিতৃদেবতাক মন্ত্রের অর্থ পরমেশ্বর তথা সূর্য উভয় পক্ষে করেছেন। সূর্যপরক অর্থেও সূর্যের আকর্ষণশক্তির বর্ণনা করেছেন। 'অদিত্যাস্ত্বগসি' যজু০ ৪।৩০ আদি বরুণ দেবতা মন্ত্রের ব্যাখ্যা পরমেশ্বর, সূর্য তথা বায়ু তিন পক্ষে করেছেন। 'কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে' ঋক০ ১।৪৩।১ আদি রুদ্র দেবতার মন্ত্রকে পরমেশ্বর, জীবাত্মা তথা ভৌতিক বায়ু তিন পক্ষে করেছেন। ইন্দ্র দেবতার 'য়োগে য়োগে তবস্তরম্' ঋক০ ১।৩০।৭ আদি মন্ত্র ঈশ্বর তথা সেনাধ্যক্ষ দুটি পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসিদ্ধ মন্ত্র 'য়াং মেধাং দেবগণাঃ' যজু০ ৩২।১৪ এ অগ্নি পদ দ্বারা জগদীশ্বর তথা বিদ্বান্ অধ্যাপকের গ্রহণ করেছেন। 'অয়ং মিত্রো নমস্যঃ' ঋক০ ৩।৫৯।৪ আদি মন্ত্রে মিত্রের অর্থ ঈশ্বর তথা রাজা পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'পুরাং ভিন্দুর' ঋক০ ১।১১।৪ আদি ইন্দ্র বিষয়ক মন্ত্রের ব্যাখ্যা সূর্য এবং সেনাপতি উভয় পক্ষে করেছেন। সোম দেবতার 'ত্বম্ সোমাসি সৎপতিঃ' ঋক০ ১।৯১।৫ আদি মন্ত্র শ্লেষ দ্বারা পরমেশ্বর, গৃহস্বামী তথা সোম ওষধি তিন পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'বৃত্রখাদো বলংরুজঃ' ঋক০ ৩।৪৫।২ আদি ইন্দ্রদেবতাক মন্ত্রের অর্থযোজনা বিদ্যুৎ, সূর্য, বায়ু এবং রাজা পরক করা হয়েছে। ঐরূপ মন্ত্রের সংখ্যা দুই শত থেকেও অধিক যাতে শ্লেষালংকার

মেনে স্বামীজী একাধিক অর্থ করেছেন। মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা যতটুকু স্বামীজী নিজের বেদভাষ্যে করেছেন, তা অন্য কোন বেদভাষ্যকার করেননি।[৪]

ঐতিহাসিক অর্থের উপেক্ষা

বেদমন্ত্রে প্রযুক্ত নামকে কোন ঐতিহাসিক ঋষিদের, ঋষিকাদের, রাজাদের, রাণীদের, নদীর, নগর ইত্যাদি নাম মেনে নেয়ার প্রবৃত্তি বেদ ভাষ্যকারদের মধ্যে পাওয়া যায়। বেদার্থের ঐতিহাসিক সম্প্রদায় যাস্কাচার্য থেকেও প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ তিনি নিজের নিরুক্ত গ্রন্থে কোন প্রসঙ্গে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিজের সম্মতি তিনি তাদের বিরোধেই রেখেছেন।[৫]

আধুনিক যুগের বেদ বিচারক বিদেশী বিদ্বানদের তো আধারস্তম্ভ এটিই। অতএব বেদে পদে-পদে ইতিহাসের অন্বেষণ করার পূর্বাগ্রহ তারা বানিয়েছেন। বিদেশের বিদ্বানগণ বেদে লৌকিক ইতিহাস ভালোভাবেই মানতেন। কিন্তু আশ্চর্য তো তখন হতে হয় যখন বেদকে সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত ঈশ্বরীয় জ্ঞান মান্যকারী স্কন্দস্বামী, উবট, সায়ণ, মহীধর আদি ভারতীয় ভাষ্যকারগণও অনেক স্থলে বেদ মন্ত্রের ইতিহাসপরক ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ নিজের সুদীর্ঘ বেদভাষ্যে একটি স্থলেও ইতিহাস মানেননি। ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন বেদমন্ত্রে ইতিহাসের লেশমাত্রও নেই। অতএব সায়ণাচার্য আদি পণ্ডিতগণ যেখানে-কোথাও ইতিহাসের বর্ণনা করেছে তা ভ্রমমূলক।[৬]

নিজের বেদভাষ্যেও কোন কোন স্থলে স্বামী দয়ানন্দ সায়ণের ঐতিহাসিক অর্থের বিরোধ করেছেন। যথা, সায়ণ ঋ০ ১।৩১।১১ এ নহুষকে রাজা-বিশেষ, ঋ০ ১।১৮।১ এ কক্ষীবান ঔশিজকে আশিক নামের মাতার পুত্র কক্ষীবান ঋষি, ঋ০ ১।৩১।১৭ এ যযাতিকে এই নামের রাজা, ঋ০ ১।৩৬।১৮ এ তুর্বশ, যদু, উগ্রদেব, নববাস্তু, বৃহদ্রথ এবং তুর্বীতিকে রাজর্ষি-বিশেষ মেনেছেন। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ এই স্থলে নৈরুক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সায়ণের নাম নিয়ে তার ইতিহাসপরক অর্থের খণ্ডন করেছেন । স্বামীজীর যুক্তি হচ্ছে এই যে, রাজা নহুষ[৭] আদি তো বর্তমান কালের এবং বেদ তো সনাতন। অতএব সনাতন বেদে লৌকিক ইতিহাস না থাকার মান্যতা স্থাপন তো নিজের ঋগ্বেদভাষ্যের উপোদ্ঘাতে সায়ণও করেছেন।[৮] কিন্তু বেদভাষ্যে তিনি তার নির্বাহ করতে পারেন নি। কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ নিজের প্রতিজ্ঞার নির্বাহ বেদভাষ্যের সর্বত্র করেছেন। তিনি অগস্ত্য, অত্রি, অম্বরীষ কুৎস, কুশিক, ত্রসদস্যু, দিবোদাস, বসিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, শুনঃশেপ প্রভৃতি সমস্ত ঐতিহাসিক প্রতীত হওয়া নামের নিরুক্ত পদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যিকারে বেদে লৌকিক ইতিহাসের কল্পনা বেদকে জর্জরিত করে। বেদে ইতিহাস না মেনে যোগার্থের বল দ্বারা যে অর্থ করার পদ্ধতি মূলত সেটি দ্বারাই বেদের রহস্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। অন্যথা ঐতিহাসিক কাহিনী যেমন ভাষ্যকারগণ রচনা করে বেদের উপর রোপন করেছেন, ঐরূপ প্রত্যেক বেদ মন্ত্রের উপর বানানো যেতে পারে। বেদের ঐতিহাসিক সম্প্রদায়কে ব্যাপক ক্রিয়াত্মক উত্তর প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ একমাত্র স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্যই।

পূর্ব-বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র বেদার্থ

পূর্বকালে দর্শ, পৌর্ণমাস, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সোমযাগ আদি বিবিধ শ্রৌত যাগে, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ যজ্ঞে, জাতকর্মাদি বিভিন্ন সংস্কারে তথা অন্য অনেক বিধি-বিধানে বেদ মন্ত্রের বিনিয়োগ করা হয়েছিলো। সেসব বিনিয়োগের

পরীক্ষা করার দ্বারা জ্ঞাত হয় যে, তাতে কিছু বিনিয়োগ রূপসমৃদ্ধ অর্থাৎ মন্ত্রার্থ দ্বারা অনুমোদিত আর কিছু অরূপসমৃদ্ধ অর্থাৎ যেগুলি মন্ত্রার্থের বিরুদ্ধ অথবা মন্ত্রার্থের সাথে অসংবদ্ধ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারগণ রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ দ্বারাই যজ্ঞের পরিপূর্ণতা মানতেন।[৯]

তথাপি অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগও চলতে থাকল এবং তাকেই প্রামাণিকও মানা হলো। স্বামী দয়ানন্দ এটি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে পূর্বকৃত বিনিয়োগে যা যুক্তিসিদ্ধ, বেদাদি প্রমাণের অনুকূল এবং মন্ত্রার্থের অনুসৃত বিনিয়োগ সেটিই গ্রাহ্য হতে পারে।[১০] সেই সাথে তিনি এটিও মেনেছেন যে বেদ ব্যাখ্যার জন্য রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগেরও অনুসরণ করা অনিবার্য নয়, সেই বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র হয়েও বেদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অতএব তিনি ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের নিজের ভাষ্য পূর্ব-বিনিয়োগের অনুসরণ করা ছাড়াও লিখেছেন এবং ভূমিকাতে এটি নির্দেশ করে দিয়েছেন যে, আমি তো শব্দার্থতঃ ই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করবো। যারা অগ্নিহোত্র থেকে শুরু করে অশ্বমেধ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেতে চান, তারা ঐতরেয়, শতপথ, পূর্বমীমাংসা, শ্রৌতসূত্র আদি দেখতে পারেন। কিন্তু তাতে যে বেদ বিরুদ্ধ বিনিয়োগ রয়েছে, সেসব তারা যেন না মানেন।

স্বামী দয়ানন্দের বেদ ভাষ্য দ্বারা এটি স্পষ্ট যে পূর্ব-বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে করা তার বেদব্যাখ্যা মহোপকারক সিদ্ধ হয়েছে এবং তা দ্বারা পাঠকদের বেদে মানবোপযোগী বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কর্তব্যের জ্ঞান হয় এবং তাদের এই ভ্রান্তি হয়নি যে, বেদে কমকাণ্ডের অতিরিক্ত আর কিছু নেই। মহীধর পূর্ব বিনিয়োগ দ্বারা আবদ্ধ হয়ে তথা তার প্রামাণিকতা বা অপ্রামাণিকতার বিচার করা ছাড়াই নিজের যজুর্বেদভাষ্য করেছেন।

অতএব, অনেক স্থলে ওই ভাষ্য ভ্রান্ত হয়েছে, যথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে অগ্নীষোমীয় পশুপ্রয়োগের প্রকরণে অজ (ছাগল) এর বধ, অশ্বমেধ- প্রকরণে ২৩ অধ্যায়ে রাজমহিষীর অশ্বমেধ অশ্বের কাছে শয়ন (মন্ত্র ১৯-২১), রাজপত্নী তথা পুরোহিতদের মধ্যে অশ্লীল হাস্য-পরিহাস, রাজ পত্নীদের দ্বারা অশ্বের শরীরকে সূচীর দ্বারা সংস্কার (মন্ত্র ৩৩-৩৭) এবং অশ্বের পেট কর্তন করা (মন্ত্র ৩৯-৪২), ২৫ অধ্যায়ে অশ্বের কর্তিত অঙ্গের দেবতাদের জন্য হোম করা, ৩৫ অধ্যায়ে পিতৃমেধ-প্রকরণে গাভীর চর্বির হোম করা (মন্ত্র ২০) আদি[১১] স্থলে পূর্ব-বিনিয়োগের অনুসরণ না করে লেখা হয়েছে। মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্য অত্যন্ত চমৎকার, প্রামাণ্য তথা বেদের সত্য স্বরূপের প্রকাশক।

বেদে বিবিধ বিদ্যার আবিষ্কার

পূর্ব-ভাষ্যকারগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বেদে কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোন বিদ্যার আবিষ্কার করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ 'বেদে সকল বিদ্যা রয়েছে' এটি ঘোষণা করেছেন।[১২] তিনি নিজের 'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা' গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিবিদ্যা, পৃথিব্যাদিলোকভ্রমণ বিদ্যা, আকর্ষণানুকর্ষণবিদ্যা, প্রকাশ্যপ্রকাশকবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, উপাসনাবিদ্যা, মুক্তিবিদ্যা, নৌবিমানাদি নির্মাণচালন বিদ্যা, তারযন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রাজবিদ্যা, যজ্ঞবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বর্ণাশ্রম-বিদ্যা আদি বিবিধ বিদ্যার বৈদিক প্রমাণের সাথে প্রতিপাদন করেছেন তথা নিজের কৃত বেদভাষ্যেও এসবের প্রকাশ করেছেন।

কতিপয় অন্য বিশেষত্ব

স্বামী দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যে কিছু অন্য বিশেষত্ব পাওয়া যায়, যা অন্য বেদভাষ্যকারগণের ভাষ্যে পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসেবে, কিছু বিশেষত্ব নিচে লেখা হলো -

(ক) দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ মন্ত্রের অশ্লীল, পরমাত্মার স্বভাব এবং সৃষ্টিনিয়মের বিরুদ্ধ এবং লোকবিদ্বেষকারী অর্থ কোথাও করেননি।

(খ) তিনি বেদে মাংসভক্ষণ, পশুবলি, জড়পূজা, মৃতকশ্রাদ্ধ, জাদু-টোনা, অসম্ভব চমৎকার কাহিনী ইত্যাদি অস্বীকার করেছেন। যেসব ভাষ্যকারগণ এমন পক্ষের অর্থ নিজেদের বেদব্যাখ্যায় কল্পনা করেছেন, তিনি তাদের ভ্রান্ত বলেছেন।

(গ) নির্বচনশাস্ত্র তথা শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও তাঁর বিশেষ যোগদান রয়েছে, নিজের বেদভাষ্যে তথা উণাদি কোষের ব্যাখ্যাতে তিনি অনেক নতুন নির্বচন প্রস্তুত করেছেন।

(ঘ) তিনি বৈদিক শব্দকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। যথা 'দেব' শব্দে পরমেশ্বর, বিদ্বান্, মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি, জ্ঞানেন্দ্রিয় আদির গ্রহণ করেছেন।[১৩] যজ্ঞ দ্বারা কেবল অগ্নিহোত্রকে নয় বরং দেবপূজা, সংগতিকরণ, শিল্প, দান আদিকেও সম্মিলিত করেছেন।[১৪] ধনবাচক রৈ, রাধস্, রয়ি, ধন, বসু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সুবর্ণ আদি ধনের সাথে সাথে বিদ্যা, ধর্ম, আরোগ্য, চক্রবর্তী রাজ্য, মোক্ষ আদি ধনকেও গ্রহণ করেছেন।[১৫] রশ্মি আদি কিরণবাচী শব্দ দ্বারা কেবল ভৌতিক প্রকাশের কিরণকেই নয়, বরং বিদ্যা-বিজ্ঞানের তেজ এবং অন্তঃপ্রকাশক গুণেরও বোধ করায়।[১৬] 'রথ' শব্দের প্রায় সর্বত্রই ভূযান, জলযান এবং বিমান অর্থ হয়ে থাকে।[১৭] এমন নানাবিধ অর্থ বৃত্র, বৃক, নমুচি, নদী, ধনুষ্, ইষু আদি অন্য অনেক শব্দেরও আছে।[১৮]

(ঙ) তাঁর বেদভাষ্য মানবকে অভ্যুদয় তথা নিঃশ্রেয়স উভয়কে প্রাপ্তির জন্য উদ্বোধন দান করে। লৌকিক উৎকর্ষে তার ব্যাখ্যাদৃষ্টি অনুসারে কৃত বেদভাষ্য সমগ্র ভূমণ্ডলের ধর্ম পূর্ণ চক্রবর্তী রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, দিব্য উৎকর্ষে মোক্ষের পরমানন্দ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

এই প্রকার অনেক নতুনত্ব এবং বিশেষত্বের কারণে স্বামী দয়ানন্দের বেদভাষ্য অত্যন্ত উপাদেয়।

টীকাঃ

১. (উষঃ) উপর্বৎ সর্বরূপপ্রকাশিকে বিদুষি স্ত্রি। ঋ০ভা০ ৬।৪৯।৭, (উষঃ) উষর্বদ্ বিদ্যমানে বিদুষি। ঐ ১।১১৩।১২ (ঊসষঃ) প্রভাতবেলা ইব স্ত্রিয়ঃ। ঐ ১।১১৩।২০

২. (সরস্বতী) বিজ্ঞানাঢ্যা (বিদুষী কন্যা)। ঋ০ ভা০ ৬।৪৯।৭, প্রশস্তং সরো বিজ্ঞানং বিদ্যতে য়স্যাঃ সা (বিদুষী স্ত্রী)। য়০ ভা০ ১৯।৮৩, প্রশস্তজ্ঞানয়ুক্তা পত্নী। ঐ ১৯।৮২, বিদুষী শিক্ষিতা মাতা। ঐ ২০।৬৪, (সরস্বতীম্) বহুবিধং সরো বেদাদিশাস্ত্রবিজ্ঞানং বিদ্যতে য়স্যাস্তাং বিজ্ঞানয়ুক্তাম্ অধ্যাপিকা স্ত্রিয়ম্। ঐ ৯।২৭।

৩. অথাত্র য়স্য-য়স্য মন্ত্রস্য পারমার্থিকব্যবহারিকয়োর্দ্বয়োরর্থয়োঃ শ্লেষালঙ্কারাদিনা সপ্রমাণঃ সম্ভবোঽস্তি তস্য তস্য দৌ দ্বাবর্থৌ বিধাস্যেতে। ঋ০ ভা০ ভূ০, প্রতিজ্ঞাবিষয়

৪. অধিক বিস্তারের জন্য দ্রষ্টব্যঃ লেখকের গ্রন্থ 'বেদ ভাষ্যকারদের বেদার্থপ্রক্রিয়া, অধ্যায় ৪।

৫. দ্রষ্টব্যঃ নিরু০ ২।১৭, ১২।১, ১২।১০।

৬. নাত্র মন্ত্রভাগে হীতিহাসলেশোজ্যস্তীত্যবগন্তব্যম্। অতো য়চ্চ সায়ণাচার্য়াদিভিবৈদপ্রকাশাদিষু য়ত্রকুত্রেতিহাসবর্ণনং কৃতং তদ্ ভ্রমমূলমেবাস্তীতি গন্তব্যম্।- ঋ০ ভা০ ভূ০, বেদসংজ্ঞা বিচার বিষয়।

৭. নহুষস্যেত্যত্র সায়ণাচার্য়েণ নহুষনামকরাজবিশেষো গৃহীতঃ, তদসৎ। কস্যচিন্নহুষস্যেদানীংতনত্বাদ্ বেদানাং সনাতন ত্বাৎ তস্য গাথান্ন ন সম্ভবতি, নিঘণ্টৌ নহুষস্যেতি মনুষ্য নাম্নঃ প্রসিদ্ধেশ্চ। দ০ভা০, ঋ০ ১।৩১।১১

৮. ববরাদ্যনিত্যদর্শনং য়দুক্তং তস্য কিমুত্তরমিত্যাশঙ্ক্য উত্তরং সূত্রয়তি- পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ (জৈ০ সূ০ ১।১।৩১) ইতি। য়ৎ পরং ববরাদিকং তৎ শব্দসামান্যমেব ন তু মনুষ্যো ববরনামকোত্র বিবক্ষিতঃ ববরণ্বনিয়ুক্তস্য প্রবহণস্বভাবস্য দায়োস্ত্র বক্তুং শক্যত্বাৎ। -সায়ণ, ঋগভাষ্য, উপোদ্ঘাত, পূনা সংস্করণ পৃ০ ১৫

৯. এতদ্ বৈ য়শস্য সসৃদ্ধং য়ৎ রূপসমৃদ্ধং য়ৎ কর্ম ক্রিয়মাণম্ ঋগভিবদতি । ঐ০ বা০ ১।১৬, এতদ্ধৈ য়জ্ঞস্য সমৃদ্ধং য়ৎ রূপসমৃদ্ধং ক্রিয়মানম্ ঋগ্ য়জুর্বাভিবদতি। গো০ উ০ ২।৬

১০. তস্মাদ্ য়ুক্তিসিদ্ধো বেদাদিপ্রমাণানুকূলো মন্ত্রার্থানুসৃতস্ত দুক্তোঽপি বিনিয়োগঃ গৃহীতং য়োগ্যোঽস্তি।- ঋ০ ভা০ ভূ০ প্রতিজ্ঞা বিষয়।

১১. বিশেষ বিস্তারের জন্য দ্রষ্টব্য: আর্য সমাজ পানিপথ থেকে প্রকাশিত "ধর্ম এবং সংস্কৃতি" গ্রন্থে লেখকের লেখা 'স্বামী দয়ানন্দের যজুর্বেদ ভাষ্যের এক তুলনাত্মক দৃষ্টি'।

১২. বেদেষু সর্বা বিদ্যাঃ সন্তি আহোস্বিন্ন ? অত্রোচ্যতে, সর্বাঃ সন্তি মূলোদ্দেশ্যতঃ।- ঋ০ ভা০ ভূ০, ব্রহ্মাবিদ্যাবিষয়ের আরম্ভ।

১৩. দ্রষ্টব্য: ঋ০ ভা০ ভূ০, বেদবিষয়বিচার

১৪. ধাত্বার্থাদ্ য়জ্ঞার্থস্ত্রিধা ভবতি। বিদ্যাজ্ঞানধর্মানুষ্ঠানবৃদ্ধানাং দেবানাং বিদুষামৈহিকপারমার্থিকসুখসম্পাদনায় সৎকরণং, সম্যক পদার্থগুণসম্মেলবিরোধজ্ঞানসংগত্যা শিল্পবিদ্যাপ্রত্যক্ষীকরণং, নিত্যং বিদ্বৎসমাগমানুষ্ঠানং, শুভবিদ্যাসুখধর্মাদিগুণানাং নিত্যং দানকরণমিতি। য়জু০ ভাষ্য ১।২।

১৫.(রায়ঃ) বিদ্যাচক্রবর্তিরাজ্যশ্চিয়াদীনি ধনানি।- য়০ ভা০ ২।২৪, (রাধসঃ) বিদ্যাসুবর্ণচক্রবর্তিরাজ্যাদিধনস্য - ঋ০ ভা০ ১।২২।৭, (ধনানি) বিদ্যাধর্মচক্রবর্তিরাজ্যশ্রীপ্রসিদ্ধানি।- ঋ০ ভা০ ১।৪২।৬, (রয়িম্) ধর্মমোক্ষ বিদ্যাচক্রবর্তিরাজ্যারোগ্যাদিস্বরূপং ধনম্। বেদভাষ্য নমুনা-ঋ০ ১।১।৩, (বসু) সুখেষু বসন্তি য়েন তদ্ ধনং বিদ্যারোগ্যাদি সুবর্ণাদি বা।- ঋ০ ভা০ ১।১০।৬।

১৬. (রশ্মিভিঃ) প্রকাশকৈর্গুণৈঃ কিরণৈর্বা। (রশ্মিভিঃ) অন্তঃ প্রকাশকৈর্গুণৈঃ।- য়০ ভা০ ১।৩১

১৭. (রথে) ভূজলাকাশগমনা য়ানে।- ঋ০ ভা০ ১।৬।২
১৮. (বৃত্রং) মেঘমিব অবিদ্যাম।- ঋ০ ভা০ ৪।১৮।১১, প্রকাশাবরকং মেষমিব ধর্মাত্মাবরকং (দুষ্টং শত্রুম্)।- য়০ ভা০ ৩৩।২৬, (বৃকঃ) বৃকবদুৎকোচকশ্চোর ।- ঋ০ ভা০ ২।২৮।১০ (নমুচিম্) য়োঽয়র্মং ন মুচ্যতি তম্ (অধর্মাত্মমানং জনম্)।- ঋ০ ভা০ ২।১৪।৫ (নমুচেঃ) ন মুঞ্চতি পরপদার্থান্ দুষ্টাচারান্ বা যঃ স্তেনস্তস্য।- য়০ ভা০ ১০।১৪, (নদীনাম্) সরিতামিব বিদ্যমানানা বিদুষী নাম।- ঋ০ ভা০ ৩।৩৩।১২, (নদীভিঃ) সরিদ্ভিরিবনাড়ীভিঃ।- ঋ০ ভা০ ৫।৪১।১৯, (ধনুঃ) শস্ত্রাস্ত্রম।- য়০ ভা০ ২৯।৩৯, (ইষবঃ) শস্ত্রাস্ত্রাণিঃ।- য়০ ভা০ ১৬।৬৬

নিরাকারবাদীদের মন্দিরের কী প্রয়োজন ?

✅নিরাকারবাদীদের মন্দিরের কী প্রয়োজন ❓

▪ **উত্তর:** ভগবান্ সর্বত্র বাস করেন, সদা বিরাজমান। উপাসনালয় মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী স্থানবিশেষের নির্মাণ করেছেন, পরমপিতা পরমাত্মার বাস সর্বত্র। ঈশ্বর কণায়-কণায় সমাহিত আছেন কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপক।

লোক পূজা-পাঠ করতে মন্দিরে যায় তবে আপত্তিকর কোন কিছু নেই। পূজা-পাঠ তো যেখানে খুশি করা যেতে পারে, যে কোনও সময়ে করা যেতে পারে। এর জন্য কোন মন্দির বিশেষে অথবা কোন বিশেষ স্থানে যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেবল শ্রদ্ধা ও প্রেমের।

বাহ্যিক মন্দিরের থেকে কিছু শেখা উচিত। মন্দির হল আমাদের ভিতরে থাকা মন-মন্দিরের প্রতীক। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল আমাদের হৃদয় যেখানে তিনিও বিরাজ করেন, আমরা স্বয়ংও (আত্মা) বাস করি। এই মন মন্দিরের থেকে বৃহৎ আর কোন স্থান হতে পারে না। ঈশ্বর তো সর্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু আত্মা এই দেহেই বাস করে কারণ সে (আত্মা) একদেশী অণু পরিমাণ। অল্পজ্ঞতার কারণে আমরা ইশ্বরকে বাইরে অনুসন্ধানের চেষ্টা করি যা ব্যর্থই আমাদের জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে দেয়।

প্রভু-ভক্ত যে কোনও স্থানে যাক, মন্দির যাক অথবা মসজিদে, গির্জায় অথবা গুরুদ্বারে, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের মধ্যেই আছেন। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে তথাকথিত উপাসনালয়কে কী আসলেই উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নাকি অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোই সেখানে অন্যতম একটা লক্ষ্য । এজন্য যেখানে সর্বজীবের কল্যাণ কামনা করা হয় ও প্রকৃত সত্যের উপদেশ দেওয়া হয় সেটিই মন্দির, প্রকৃত উপাসনালয় । আমরা যেখানে সেখানে আমাদের পরমপ্রিয় প্রভুও থাকেন।

মন্দিরে অবশ্যই যাওয়া উচিত। সেখানকার পরিবেশ দেখা উচিত। সেখানকার পবিত্রতা দর্শন করা উচিত। যেসব মহাপুরুষদের মূর্তি রয়েছে, তাঁদের বিষয়ে - তাঁদের জীবনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এইভাবে যে মন্দিরে যাবেন, হোক তা শংকর ভগবানের মন্দির অথবা মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র মহারাজের, অথবা যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, এই মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিন্তা করুন এবং সেরূপই হওয়ার প্রচেষ্টা করুন। মহাপুরুষদের জীবন থেকেই আমরা নিজের

জীবনকে সেই অনুরূপ করার প্রচেষ্টা করবেন তবে কিছুটা হলেও নিজেদের জীবনকে সংশোধন করতে পারি। ভগবান্ রাম্, ভগবান্ কৃষ্ণ উভয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির এমন প্রতীক যাদের উপর গর্ববোধ করা যায়। অতএব তাদের মন্দির থেকে আমরা উচ্চ প্রকারের মহাত্মা হবার প্রেরণা লাভ করি। শিশুদেরও সঙ্গে নিয়ে যান যাতে তারাও আমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে জানতে পারে।

নিজের ঘরে এমন মহাপুরুষদের চিত্র অবশ্যই লাগানো উচিত। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের আদর্শ। যার মধ্যে উপনিষদে বর্ণিত গুরুর ন্যায় গুণাবলী বিদ্যমান থাকে তাকে ভগবান বলা যেতে পারে। তবে তেমন গুণাবলীযুক্ত মানব দুর্লভ ।

ভগবান্ যে কেউই হতে পারে কিন্তু পরমেশ্বর এক। না কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে আর না কেউ তার থেকে মহান্ হতে পারে। ঈশ্বর সর্বোপরি।

মন্দির থেকে বহু বিষয় শেখা যেতে পারে-

১. পবিত্রতা – দেহ-মন দ্বারা নিষ্কলুষ থাকা মানব-জীবনের জন্য পরম কল্যাণময়।
২. সমর্পণ- সমর্পণভাবনা দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের দয়া-কৃপার সুপাত্র হতে ।
৩. নিয়ম – নিয়মপূর্বক পূজা-পাঠ করলে জীবন অনুশাসিত হয় যার ফলে ব্যক্তি মহান্ হয় - যশ ও কীর্তিযুক্ত হয়।
৪. প্রসাদ- বণ্টন করে প্রদত্ত নৈবেদ্য আহার করাকে প্রসাদ বলা হয় সাধারণত । মূর্তি জড় পদার্থ, খেতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের নির্মিত মূর্তির অর্থাৎ সমস্ত জীবের সঙ্গে মিলেমিশে-বণ্টন করেই ভোজন করুন। এর ফলে নিজেদের মধ্যে মিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকে - সুখ ও শান্তি লাভ হয়। বৈদিক যজ্ঞের স্বিষ্টকৃতের অবশিষ্ট যাকে যজ্ঞাবশিষ্টান্ন বলা তা আমাদের সকলের জন্য প্রসাদস্বরূপ । নৈমিত্তিক পঞ্চমহাযজ্ঞ করুন ।
৫. স্বচ্ছতা – মন্দির স্বচ্ছ হয়, এর থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, আমাদের নিজ দেহ ও মনকে স্বচ্ছ রাখা উচিত যেখানে প্রভু স্বয়ং বাস করেন। পান-আহার শুদ্ধ হওয়া উচিত। মানবের ভোজনের যোগ্য বস্তুই আহার করুন। মাংস-মাছ খেয়ে এই প্রভু মন্দিরকে অশুদ্ধ করবেন না। এই হত্যার থেকে বড় আর কোন পাপ নেই।
৬. জ্যোতি - মন্দিরে যজ্ঞবেদিতে জ্যোতি জ্বালানো হয় যাতে কিরণ প্রদান হয়, নিজ মনমন্দিরে জ্ঞানের জ্যোতি জ্বালানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে সেই জ্ঞান রূপী জ্যোতির দ্বারা আত্মা-পরমাত্মার সাক্ষাৎ হতে পারে। আধ্যাত্মিক জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয় বেদাধ্যয়ন দ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা, আপ্ত পুরুষের বচন দ্বারা, তথা স্বাধ্যায় দ্বারা। যার আত্মা সজাগ হয় সে পরমেশ্বরের আনন্দ লাভ করে।
৭. সুগন্ধ - ধূপ-আগরবাতি মন্দিরে জ্বালানো হয়, এই কারণে যে, পরিবেশ সুগন্ধিত হয়। যদিও উচিত যজ্ঞের মাধ্যমেই এই কাজটি করা কেননা এটিই শাস্ত্রানুমোদিত । এর থেকেও শিক্ষা লাভ হয় যে, নিজের জীবনে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সুগন্ধ দ্বারা এইভাবে সুগন্ধিত পরিবেশ উৎপন্ন করো যে, সবাই এই সুগন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকে!
৮. ভজন-কীর্তন – মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা ভজন-কীর্তন-আরতি হয়- ভগবানের গুণগান করা হয়। এইরূপ আমরাও নিজেদের জীবনকে সঙ্গীতময় করে তুলি। সকাল-সন্ধ্যা নিত্যপ্রতিদিন ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা- উপাসনা করুন যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট থাকার অধিকারী হই তথা প্রভু-কৃপায় সদা আনন্দে থাকি।

৯. নমস্কার - মন্দিরে ভক্তগণ একে-অন্যকে অভিনন্দন জানায়। কেউ রাম-রাম বলে তো কেউ রাধে-রাধে তো কেউ হরে কৃষ্ণ। এখানেও আমাদের শেখা উচিত যে, যখনই আমরা নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎ করবো তখন এই মহাপুরুষদের স্থানে 'নমস্তে/নমস্কার' বলে করজোড়ে অভিনন্দন জানাবো। ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সবাই যে কোনও সময়ে নমস্কার করতে পারেন। নমস্কার জানানো কোন সম্প্রদায়-মত-পন্থ ইত্যাদির সূচক নয়, অতএব আমরা সবাইকে সমান মনে করি। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান তবে ভেদা-ভেদ কীসের? যেখানে ভেদ নেই সেখানে মিত্রতা বৃদ্ধি পায়। যেখানে মিত্রতা আছে সেখানে প্রেম উৎপন্ন হয়। যেখানে প্রেম সেখানেই ঈশ্বর। বলা হয় গড ইজ লাভ এণ্ড লাভ ইজ গড।
১০. মন্দির তো জড়ই - ভবন ইট-প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। কখনও নির্মাণ হয় কখনও ভঙ্গ হয়, কিন্তু আমাদের মন-মন্দির যেখানে আত্মা-পরমাত্মা উভয় বাস করে, সদা একই সঙ্গে থাকে। জড় ও চেতনের জ্ঞান পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে ঈশ্বর মন্দিরেও ব্যাপ্ত আছেন, কিন্তু সেই মন্দিরের চিত্রের মধ্যে আমরা পৌঁছাতে পারি না; অন্যদিকে আমরা স্বয়ং মনের মধ্যে বিরাজ করি আর ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহলে আমরা নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে অন্তরেই সাক্ষাৎ করি না কেন। মন্দির আমাদের মন-মন্দিরের প্রতীক।

🔶শ্রী মদন রহেজা
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যা ভাগ্যে (কপালে) লেখা আছে তাই পাওয়া যায় অথবা ঘটে ?

✅এই স্বীকৃতি একেবারে সত্য। ভাগ্যে যা লেখা আছে সেটা তো পাওয়াই যাবে। এ কেউ থামাতে পারবে না। ভাগ্যে এরূপ লেখা থাকে না যে, আপনার গাড়ি, টিভি অথবা ফ্রীজ পাবেন। হ্যাঁ, এতখানি অবশ্যই যে, যদি আপনার পূর্ব-কর্ম ভালো হয় তবে শুভ ফলই লাভ হবে। কোন রূপে পাওয়া যাবে এ বলা কঠিন।
পূর্ব-জন্মের সঞ্চিত কর্মের ফল যখন প্রাপ্ত হয়, তখন তাকেই কপাল অথবা ভাগ্য বলা হয়; কিন্তু কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা উচিত নয়, কারণ আপনার জানা নেই যে, ভাগ্যে কী লেখা রয়েছে ?

মা ব এনো অন্যকৃতং ভুজেম
ঋগ্বেদ ৬.৫১.৭
আমরা অন্যের সঞ্চিত পাপের কর্মফল ভোগ করি না।

আমাদের কর্তব্য সর্বদা প্রচেষ্টাবান্ থাকা, কর্মরত থাকা। বর্তমানে কৃত কর্মের ফলও বর্তমানেই পাওয়া যায় ।

যশ্চিকেত স সুক্রতুঃ
ঋগ্বেদ ৫.৬৫.১
যে বিচারশীল হয়, সে-ই সৎকর্মশীল হয়।

অতএব কখনো এ ভরসায় নির্ভরশীল থাকা উচিত নয় যে, পূর্ব কর্মের ফল পক্ক হলে তবেই ফল লাভ হবে - এসব অকর্মণ্যদের কথা।

গম্ভীরাং উদধীংরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব। প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত॥
ঋগ্বেদ ৩.৪৫.৩
গভীর ও ক্রিয়াশীল বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, ক্ষমাশীল, পালনকারী ও দানী মানবই সুখী হয়।

মনুষ্যকে ক্রতু বলা হয়েছে, অর্থাৎ কর্মী। মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকবে, কর্মরত হয়ে জীবন ধারণ করবে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
যজুর্বেদ ৪০.২
এই সংসারে কর্ম করেই শত বছর জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করো।

ঠগ জ্যোতিষী এবং অজ্ঞানী সাধু-সন্ত প্রায়সময়েই এমন বলে থাকে যে, আপনার ভাগ্যে ইত্যাদি-ইত্যাদি লেখা আছে সেগুলিকে মিথ্যা জানবে, কারণ ভাগ্যের লেখন কেউ পড়তে পারে না। যা হবার সেটা অবশ্যই হবে। কারোর বলায় অথবা না বলায় কিছু হয় না। ভাগ্য কপালে লেখা থাকে না; ভাগ্য ত কর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কারোর কর্মকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই জানে না, এমনকি স্বয়ং কর্তাও জানে না।

আমাদের সমাজে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য রাশিফল, হস্তরেখা দেখা ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। রাশি বা হস্তরেখার সাথে সাথে ভাগ্যের কোনো সম্পর্কই নেই বা তাবিজকবচ, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, পাথর ও আংটির মাধ্যমে ভাগ্য পাল্টানো সম্ভব নয়।

[অথর্ববেদ ৭।৫০।৮] এ বলা আছে, "আমার ডানহাতে কর্ম আর বামহাতে বিজয়।" এছাড়া [ঋগ্বেদ ১০।৬০।১২] বলা হয়েছে- "দুটো হাত দিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলো।" যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও গীতায় কর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিষ্কার কর্ম করতে বলেছেন।

অর্থাৎ, কর্ম আমাদের ফল নির্ধারণ করে, রাশি বা হস্তরেখা নয়। রাশি বর্তমান তারিখের মতো সময় নির্ধারণের একটি মাধ্যম। আর হস্তরেখা আঙ্গিক গঠন বা বৈশিষ্ট্য মাত্র। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, হাতের রেখা দিয়ে ভাগ্য বিচারের অপবিজ্ঞান না। ঈশ্বর কখনো রাশি বা হস্তরেখা অনুযায়ী একেকজনের ভাগ্য একেকরকম করে পক্ষপাতিত্ব করেন না। ফল তো আমাদের কর্মের ওপরেই নির্ভরশীল। আজও সমাজে কিছু লোক আছে যারা সহজসরল মানুষদের ঠকিয়ে ছলচাতুরি করে অর্থ আদায় করছে। এ বিষয়ে মনুস্মৃতি কী বলছে দেখে নেই-

উৎকোচ [ঘুষ গ্রহণ করে কাজ সম্পাদন করে দেবে বলে যারা আশ্বাস দেয়], ঔপধিক [ভয়ভীতি দেখিয়ে যারা প্রতারণা করে], মঙ্গলাদেশবৃত্তি [জ্যোতিষী - যারা মঙ্গল বা অমঙ্গল ভবিষ্যৎবাণী করে জীবিকা নির্বাহ করে], বঞ্চক [যারা পরের সম্পদ/ধন প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করে, ভণ্ড [যারা ভেতরের পাপ গোপন করে বাইরে অন্যরূপ আচরণ করে], ঈক্ষণিক

[যারা মানুষের হাতের রেখা দেখে শুভ অশুভ ফল নির্ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে] এই প্রকারের লোককে প্রকাশ্য প্রতারক বলে জানবে। [মনুস্মৃতি ৯।২৫৮]

ময়ি দক্ষো ময়ি ক্রতুঃ।
যজুর্বেদ ৩৮.২৭
আমার ভেতর দক্ষতা এবং কর্মপরায়ণতা হোক।

এইজন্য বলা হয় যে, কার্য করো, ভাবনা-চিন্তা করো, জ্ঞানপূর্বক করো। একশত কার্য ছেড়েও ভোজন করা উচিত হাজার-হাজার কার্য ছেড়েও স্নান আদি করা উচিত এবং কোটি-কোটি কাজ ছেড়েও পূর্বে প্রভুর উপাসনা করা উচিত।

সখায়ো মা রিষণ্যত
সামবেদ ২৪২
হে সখাগণ! পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারোর অথবা কোনকিছুর উপাসনা কোরো না ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সূর্যের গতি ও পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ - বৈদিক বিজ্ঞান

প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি ॥
সামবেদ ৫১
সরলার্থঃ ধার্মিক মানবজাতির প্রিয়, প্রকাশক, জগতের অগ্রনায়ক পরমেশ্বর বলবান রাজার ন্যায় স্বীয় বলের প্রভাবে প্রভাবশালী এবং সামর্থ্যবান হয়ে থাকেন। তিনিই মাতা পৃথিবীকে অনুকূলভাবে সূর্যের চার দিকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছেন। সেই পরমেশ্বর সূর্যের গৃহে, সূর্যমণ্ডলে, স্থিত রয়েছেন অর্থাৎ সূর্যের সঞ্চালকও তিনি ।

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎসগরস্য বুধ্নাৎ।
য়ো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥
সামবেদ ৩৩৯
সরলার্থঃপরমৈশ্বর্যবান জগদীশ্বরের জন্য অর্থাৎ তাঁর মহিমার গান করার জন্য অতীক্ষ্ণ প্রয়োগযুক্ত অর্থাৎ সুমধুর আমার এই স্তুতিবাণী প্রবৃত্ত হোক। সেই জগদীশ্বর অন্তরিক্ষের শীর্ষস্থান থেকে মেঘজলকে ভূমির দিকে প্রেরিত করেন অর্থাৎ ভূমিতে বৃষ্টি প্রদান করেন, যিনি বিবিধ কর্মে সংলগ্ন থেকে অথবা বিশেষরূপে সর্বান্তর্যামী হয়ে নিজের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা সেই

জগদ্ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে সেইভাবে ধারণ করে পরস্পর ভারসাম্য রক্ষা করছেন, যেভাবে রথের মাঝে বিদ্যমান দণ্ডের দ্বারা দুই রথচক্রকে রথচালক ধারণ করে থাকে ।

ক্রত্বা মহাং অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃতে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্ দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্ ॥
সামবেদ ৪২৩

সরলার্থঃ দিব্য প্রজ্ঞা আর জগতের ধারণ কর্ম দ্বারা মহান, নিয়ম ভঙ্গকারীর জন্য ভয়ংকর সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর নিজের ধারণশক্তির অনুরূপ বলবান সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদিকে আবর্তন করাচ্ছেন। লোক-লোকান্তরকে নিজ নিজ কক্ষে গতিদাতা, জগতের বিস্তারক, অকর্মণ্যতা আদি দোষসমূহকে দূর করতে সামর্থ্যবান তিনি ঐশ্বর্যপ্রদানের জন্য পরস্পর সম্বদ্ধ মানবের হাতে দৃঢ় শস্ত্রাস্ত্রসমূহকে ধারণ করান ।

ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥
সামবেদ ২০০

সরলার্থঃ হে ভ্রাতা! অন্ধকার বিদারক, প্রকাশপ্রদাতা সূর্য অভিভূত বা উদ্বিগ্নকারী, বৃহৎ রোগ থেকে উৎপন্ন, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু থেকে উৎপন্ন, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার ভয়কে দূর করে, কেননা সেই সূর্য আকর্ষণশক্তির দ্বারা আকাশে নিজ কক্ষপথে স্থির অর্থাৎ কেবল নিজের কক্ষপথে স্থিত অর্থাৎ সূর্য কখনো কক্ষপথ চ্যুত হয় না এবং আলো প্রদানের দ্বারা সকলকে পদার্থের দর্শন করায় ।

য়জ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশং দিবি ॥
সামবেদ ১২১

সরলার্থঃ পরোপকারের জন্য কৃত মহান কর্মসমূহ পরমাত্মাকে অর্থাৎ তাঁর মহিমাকে বর্ধিত করে। পরমাত্মার যজ্ঞ কর্মের একটি দৃষ্টান্ত এই হয় যে, দ্যুলোকের সূর্যরূপ মুকুট রচনাকারী সেই পরমাত্মা পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করাচ্ছেন ।

মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য়ম্ণঃ।
দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥
সামবেদ ১৯২

সরলার্থঃ হে পরমৈশ্বর্যবান জগদীশ্বর ! তোমার কৃপা দ্বারা অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষাকারী বায়ু তথা জীবাত্মার, নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি লোকের নিয়ন্ত্রণকারী সূর্যলোকের তথা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী মনের এবং আচ্ছাদক মেঘের তথা প্রাণের, এই তিনের মহান তেজকে নিবাসকারী এবং অপরাজেয়, দৃঢ় রক্ষণ শক্তি আমাদের প্রাপ্ত হোক ।

দধিক্রাবা অগ্নিঃশ্বো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎপ্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥

সামবেদ ৩৫৮

সরলার্থঃআমি বিজয়শীল তথা বিজয় প্রদানকারী, সকল শুভ গুণে ব্যাপ্ত, বল এবং বিজ্ঞান যুক্ত ধারক পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি লোককে নিজ নিজ কক্ষে বা কোনো পিণ্ডের চারিদিকে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী অথবা স্তোত্র-ধারক, ধর্ম-ধারক বা সদ্গুণ-ধারককে কর্মযোগে প্রবৃত্তকারী জগদীশ্বরের স্বাগত করি। স্বাগতবচন দ্বারা সৎকৃত ওই জগদীশ্বর আমাদের মুখের সুগন্ধিত অর্থাৎ কটূ-বচন, পর-নিন্দা প্রভৃতি রহিত মধুর সত্য-ভাষণের সৌরভ যুক্ত করেন এবং আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধি করেন ।

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥

সামবেদ ৩৫৯

সরলার্থঃঅন্ধকার, মেঘ, হিমপুরীর বিদারণকারী, পদার্থের মিশ্রণকারী এবং পৃথককারী, নিজ কক্ষে ঘূর্ণনশীল, অথবা পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্রমা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহসমূহকে নিজের চারপাশে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী, অপরিমিত বল এবং প্রকাশযুক্ত, কিরণরূপ বজ্রধারী, অনেক জ্যোতির্বিদ বিদ্বান বিজ্ঞানের দ্বারা বর্ণনাকৃত সূর্য সৌরমণ্ডলে দৃশ্যমান সমস্ত প্রাকৃতিক কর্মের ধারক হয়ে থাকেন ।

চন্দ্রমা অপ্স্বা৩ন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥

সামবেদ ৪১৭

সরলার্থঃ চন্দ্রমা অন্তরিক্ষের মধ্যে এবং কিরণরূপ শোভন পক্ষযুক্ত সূর্য দ্যুলোকে পরিক্রমা রূপে ধাবিত হচ্ছে, অর্থাৎ চন্দ্রমা নিজের কক্ষে ঘূর্ণনের সাথে সাথে পৃথিবী আর সূর্যের চারিদিকেও ঘুরছে, তথা সূর্য নিজের কক্ষে ও সমস্ত সৌরজগতসহও আবর্তিত হচ্ছে, এই কথা সকলে জানে, কিন্তু হে স্বর্ণাভ কিরণ রূপ চক্রযুক্ত প্রকাশমান চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ! তোমাদের গতিপ্রদাতাকে, কেউই জানে না। হে স্ত্রীপুরুষ অথবা রাজা-প্রজাজন! তোমরা আমার এই কথাকে অনুধাবন করো। এর মানে হলো, সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করার প্রচেষ্টা তুমি করো, যাঁর গতিতে এই সকল কিছু গতিশীল হয়েছে ।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥

সামবেদ ৬৭

সরলার্থঃ দ্যুলোকের শিরোমণি, পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী, সকল মানবের হিতকারী, সকলের পথপ্রদর্শক, সত্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধ, মেধাবী, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাম্রাজ্যের সম্রাট, প্রজাদের অতিথিতুল্য সৎকার করার যোগ্য, আমাদের রক্ষক তেজস্বী পরমেশ্বরকে বিদ্বান উপাসকেরা মৌখিক জপ দ্বারা এবং হৃদয়-গুহায় ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত করে থাকেন; অর্থাৎ জপ দ্বারা ও ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন ।

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥

সামবেদ ৫৫৮

সরলার্থঃদ্যুলোক অথবা সূর্যের ও মোক্ষের ধারণকর্তা, কর্মকুশল, আনন্দ-রসময়, বিদ্বানগণের প্রাণ ও বলপ্রদাতা, জীবন্মুক্ত মানবজাতি দ্বারা প্রসন্নযোগ্য পরমাত্মা সব জড় চেতনজগৎকে পবিত্র করেন। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষকৃত বর্ণনা আছে—আকর্ষণ বল দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহের নিয়ামক, জগতের সৃজনকারী তুমি অনায়াসেই নিজ বল দ্বারা নদীসমূহে বল এবং বেগকে স্থাপিত করো, যেভাবে ঘোড়া রথ প্রভৃতিসমূহে বেগ প্রদান করে ।

- **বাংলাদেশ অগ্নিবীর**

বেদ অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি কী ?

উত্তরঃ বেদ অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক এমননি মৃত্যুদণ্ডও ।

যস্তে গর্ভং প্রতিমৃশাজ্জাতং বা মারয়াতি তে ।
পিঙ্গস্তমুগ্রধন্বা কৃণোতু হৃদয়াবিধম্ ॥

অথর্ববেদ ৮.৬.১৮

(যঃ) যে (তে) তোমার (গর্ভম্) গর্ভস্থ শিশুকে (প্রতিমৃশাৎ) পীড়িত করে, (জাতম্, বা) অথবা নবজাত (তে) তোমার সন্তানকে (মারয়াতি) মেরে দেয়/দেবে, (তম্) তাকে (উগ্রধন্বা) উগ্র ধনুর্ধারী (পিঙ্গঃ) পিঙ্গ পুরুষ [মন্ত্র ২১] (হৃদয়াবিধম্, কৃণোতু) হৃদয়ে বিদ্ধ করুক।

কামুক-পুরুষের বর্ণনা আছে, যে গর্ভিণীর সাথে দূর্ব্যবহার করে গর্ভস্থ সন্তানকে পীড়িত করে, এবং সংভোগের কারণে কোনো শিশু যদি উৎপন্ন হয় তবে তাঁকে মেরে দেয়, যাতে ভোগীর অপযশ না হয়। এমন পুরুষকে বাণ দ্বারা হৃদয়াবিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। সায়ণাচার্য ""পিঙ্গ"" এর অর্থ করেছে ""পীতসর্ষপ""। এই অর্থে মন্ত্রের পূর্বার্ধে রোগজীবাণুর বর্ণনা কবিতা রূপে জানা উচিত।

যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে ।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥১৫॥
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে ।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥১৬॥

অথর্ববেদ ২০.৯৬.১৫-১৬

হে স্ত্রী! (যঃ) যে (জারঃ) ব্যভিচারী পুরুষ, (ভ্রাতা ভূত্বা) মিথ্যা ভাই হয়ে, এবং (পতিঃ ভূত্বা) মিথ্যার পতি হয়ে, (ত্বা নিপদ্যতে) তোমার ওপর ধর্ষণ করে, এবং এইভাবে (যঃ) যে (তে) তোমার (প্রজাম্) গর্ভস্থ-সন্তানের (জিঘাংসতি) গর্ভপাত দ্বারা হনন করতে চায়, বা হনন করে, (তম্) তাঁকে (ইতঃ) এই জীবন থেকে (নাশয়ামসি) আমরা রাজ্যাধিকারী বিনষ্ট করি।

হে স্ত্রী! (যঃ) যে ব্যাভিচারী পুরুষ (স্বপ্নেন) স্বাপন ঔষধি দ্বারা, বা (তমসা) অন্ধকারে, (ত্বা) তোমাকে (মোহয়িত্বা) জ্ঞানরহিত করে (নিপদ্যতে) তোমার ওপর ধর্ষণ করে, এবং এইভাবে (যঃ) যে (তে) তোমার (প্রজাম্) গর্ভস্থ-সন্তানের (জিঘাংসতি) গর্ভপাত দ্বারা হনন করতে চায়, বা হনন করে, (তম্) তাঁকে (ইতঃ) এই জীবন থেকে (নাশয়ামসি) আমরা রাজ্যাধিকারী বিনষ্ট করি।

পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাং চ বিশেষতঃ ।
মুখ্যানাং চৈব রত্নানাং হরণে বধং অর্হতি । ।

মনুস্মৃতি ৮.৩২৩

পুরুষ, নারী, রত্ন অপহরণে প্রাণবধ অব্দি শাস্তি দেওয়া উচিত ।

বাসন্তী নবশস্যেষ্টি ও হোলি উৎসব - কারণ ও পালনপদ্ধতি

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভারতবর্ষে ধুমধাম করে পালিত হয় 'হোলি' উৎসব। এই উৎসবের বৈদিক নাম ‘বাসন্তী নবসস্যোষ্ঠী’। এই নামের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ-

আমাদের দেশ ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ছয়টি ঋতুর মধ্যে প্রধানত বছরের দুটি ঋতুই দেশবাসীকে প্রাচুর্য, ধন ও শস্যের যোগান দিয়ে আনন্দিত করে। আমাদের ঋষিরা সকলের জীবনদাতা ও দেহ রক্ষাকারী নতুন খাদ্য কখন উত্তোলন ও ভোগ করবেন তার নির্দিষ্ট ক্ষণ ও তিথি নির্ধারণ করেছেন এসব বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে জ্যোতিষ বলা হয়। যেমন কার্তিক মাসের অমাবস্যা অর্থাৎ দীপমালিকা উৎসব এবং শরৎকালের রোপিত প্রাপ্ত খাদ্যের জন্য বসন্ত ঋতুর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন "বাসন্তী নবসস্যোষ্ঠী উৎসব"।
এ দিন খাদ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
আমাদের সংস্কৃতি অন্যকে দেওয়ার পরে নিজেরাই গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়। শস্যের পুষ্টির জন্য সর্বপ্রথম গম, যব ইত্যাদি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে,অগ্নিদেবকে নিবেদন করা হয়।
বেদ বলে ''কেবলঘো ভবতি কেবলাদি''(ঋগ্বেদ ১০/১১৭/৬)
অর্থাৎ, যে স্বয়ং অন্ন ভক্ষণ করে,তিনি কেবল পাপই ভক্ষণ করে।

অগ্নিদেব হলেন সমস্ত শক্তির উৎস এবং তা হতেই আমাদের দান করার ক্ষমতা প্রদান হয়। ভাল-মন্দ, বন্ধুত্ব-শত্রুতা,সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রকৃতি দ্বারাই ভাগ করা উপহার। কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এই সত্যটি মাথায় রেখে প্রকৃতির নিমিত্তে অগ্নিতে নতুন খাদ্যশস্য নিবেদন করা হয় এবং তারপর অগ্নিতেই অবশিষ্ট খাদ্যশস্য পাক করে নিজেরাই পুষ্ট হই।

এ যেন এক কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

🔥যজ্ঞে আহুতি না করে নতুন খাদ্য গ্রহণ করা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।গোপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে-

"যদ অকৃত্বা আগ্রয়ণং নবস্য অশ্নীয়াত,

দেবানাং ভাগং প্রতিক্লৃপ্তম্ অদ্ধান।।"-(গো.ব্রা. ২/১/১৭)

অর্থাৎ, যিনি ঈশ্বরের কৃপাশিষ্ট শস্যকে উৎসর্গ না করে নতুন শস্য নিজেই প্রথমে ভক্ষণ করেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন।

তাই এই পবিত্র উৎসবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মহা আনন্দে ঈশ্বরের গুণগান গেয়ে এসেছেন।কারণ একমাত্র তার কৃপায় আমরা কঠোর পরিশ্রমের পর অন্ন পাই এবং নতুন অন্ন দিয়ে বিশাল জীবন যজ্ঞের আয়োজন করে চলেছি।তাই, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হওয়া উৎসবের নাম বাসন্তী নবসস্যোষ্ঠী উৎসব।

আষাঢ় শস্য (মালায়) এর ভারতের সকল ফসলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। এটি সকলের মথার মুকুট মানা হয়। ভারতে অকাল পড়লে মালায় অনেক কম মারা যায়। এটি শুধু ক্ষুদার্থ ভারতেরই পেট ভরে না, প্রত্যুত পূর্ব কালে ইউরোপ প্রভৃতি ধনী বিদেশী দেশে কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করত। এইরকম জীবনধারণ সর্বপালক শস্যের আভাই কৃষকের মন, যারা আষাঢ় থেকে শুরু করে বছরে কঠোর জুতাই করে নিজের খেতের তৈরি করেছেন, আনন্দে কেনো নাচবে না। এই অবসরে তাদের আনন্দোৎসব করা স্বাভাবিক।

এটি শুধু ভারতবর্ষেরই বিশেষতা নয়, প্রত্যুত অন্য দেশেও নবশস্যের প্রবেশে এবং উৎসব করা হয়। ঋক্ষরাজ রুসের হিমাচ্ছাদিত দেশে ফসল কটার পরে কৃষক নিজের ইষ্টমিত্রকে মদ্য এবং পক্কান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করে উৎসব করে। ভুবনভাস্করের ভূমি জাপানেও, যখন ধান কাটে তখন ধানের সুরা এবং চালের রুটির সহভোজ হয় এবং গান-বাজনা পূর্বক পর্ব পালন করা হয়। ইউরোপে 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন দিবস' এবং ইংল্যান্ডে 'মে-পোল' উৎসবও এই ধরনের হয়। আসলে এই ধরনের উৎসব গ্রামের কৃষক জনতার মধ্যে জাগ্রত। সাদা-সিধে মহলের জীবন-প্রণালীর মধ্যেই তাদের আদর হয়। ভারতীয় উৎসব শুধু আমোদ প্রমোদের সাধন নয়। ধর্মপরায়ণ ভারতীয়দের প্রতিটি কথার মধ্যে ধার্মিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতার সংযোগ বিদ্যমান। যেমন বর্ষা ঋতুর চাতুর্মাসের(চার মাসে) পরে বিকৃত গৃহসমূহের পরিমার্জনের জন্য তথা শরৎ কালের প্রবেশের ফলে, তৎকালীন আবির্ভূত রোগসমূহের প্রতিকারের জন্য হোম-যজ্ঞ দ্বারা বায়ুমন্ডলের সংশুদ্ধি, নবপ্রবিষ্ট শীতকালের প্রতিরোধমূলক পোশাকের পরিবর্তন এবং নব্যপ্রাপ্ত শ্রাবণের শস্যের নবীন অন্ন,ধানের শিষের জন্য শারদীয় নবসস্যেষ্টি(দীপাবলী) উৎসবের জন্য স্থির করা হয়, সেই ভাবে শীতকালীন বর্ষার অনন্তর- মূহাসাকেও এক ধরনের চৌমাসাই মনে করা হয়। বাসস্থানের পরিষ্কারের জন্য তথা নতুন ঋতু বসন্তের পরিবর্তনের ফলে অস্বাস্থ্যের প্রতিরোধের জন্য হবন দ্বারা বাতাবরণের সংস্কারার্থ, নবাগত গ্রীষ্মের উপযুক্ত হালকা পাতলা সাদা বস্ত্রের পরিবর্তন এবং নতুন আসা আষাঢ়ী ফসলের যব(বার্লি) দ্বারা দেবযজ্ঞ করার জন্য আষাঢ়ী নবসস্যেষ্টির অভিপ্রেত।

সংস্কৃতে অগ্নিতে দগ্ধ আধাপাকা অন্নের ‘হোলক’ বলা হয়।

“তৃণাগ্নিভ্রষ্টার্দ্ধপক্বশমীধান্যং হোলকঃ। হোলা ইতি হিন্দী ভাষা” -শব্দকল্পদ্রুমকোশঃ

অর্দ্ধপক্কশভীধান্যৈস্তৃণভ্রষ্টৈশ্ব হোলকঃ।
হোলকঃল্লানিলো, মেদঃ কফদোষশ্রমাপহঃ।।
ভবেদ্ যো হোলক যস্য স তত্তহুণো ভবেৎ। (ভাব প্রকাশ নিঘণ্টু)
অর্থ-খড়ের অগ্নিতে দগ্ধ আধাপাকা শমীধান্যের 'হোলক' বলে। হোলা স্বল্পবত এবং মেদ(চর্বি), কফ এবং শ্রমের (ক্লান্তি) দোষসমূহ দূর করে।যে যে অন্নের হোলা হয়, তাতে সেই অন্নের গুণ বিদ্যমান। এমন মনে করা হয় যে আদিতে তৃণাগ্নিতে দগ্ধ আষাঢ়ীর প্রতিটি অন্নের জন্য 'হোলক' শব্দ ব্যবহৃত হত; কিন্তু পরবর্তীতে সে শমীধান্যের হোলো সমূহের জন্যই প্রচলিত হয়ে পরেছিল। হিন্দীতে প্রচলিত 'হোলা' শব্দ এরই অপভ্রংশ।

হোলোৎসবের আরেকটি বিষয় হোলিকা পুড়ানো বা নেড়া পুড়ানো। রাস্তাঘাটে বা শহর ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় আশেপাশের থেকে সংগ্রহ করা কাঠের স্তূপ ও গোবরের পিঠা,শুকনো কাঠ,মাছিয়া,গাছ ইত্যাদি দিয়ে হোলি পোড়ানোর প্রাচীন একটি প্রচলন রয়েছে। তবে তা কোনোভাবেই পুরাণে বা কাব্য প্রবন্ধে উল্লেখিত ঘটনা নয়।
নবসস্যোষ্টীর ইষ্টিপোড়ার তৎসম রূপ হলো যজ্ঞ আর তদ্ভব রুপ হলো ইষ্টপোড়া বা হোলিকাদহন।। শুকনো বা মরা কাষ্ঠ সহযোগে, সুগন্ধিজাত পর্দাথ সহযোগে যজ্ঞোৎসব
বর্তমানে হোলির দিনে গালাগালি, উশৃঙ্খলতা করে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে এবং অশালীনভাবে নিম্নমানের কৃত্রিম রং ব্যবহার করে, একে অপরের মানুষের সংবেদনশীল অঙ্গ ও মুখে কেমিক্যাল রঙ দিয়ে এবং এর কাদা ছুঁড়োছুড়ি করে,তা কোনভাবেই প্রাচীন ঋষিদের হোলিকা বা হোলোৎসব নয়। প্রাণীবাদী প্রকৃতির পৈশাচিক রুপের এটি একটি ইঙ্গিত,মানব প্রকৃতির নয়।
এ ধরনের কাজ শুধু কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত ও নৃশংসই নয়, বরং জাতীয় অপচয়ের কারণও বটে।সাথে পশুপাখির বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস এবং প্রকৃতির উপর করা অত্যাচারও বটে। উচ্চস্বরে গানবাজনা, আতশবাজি, পটকা, উশৃংখলতার বশবর্তী হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা,মাদকতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ স্বাধীনতা ভোগবাদী উৎসবেরই প্রতিফলন, বৈদিক সিদ্ধান্তের নয়।
তাই এই উৎসব উপলক্ষে একে অপরের গায়ে চন্দন, সুগন্ধি ছিটিয়ে এবং গোলাপ আদি সুগন্ধিজাত প্রভৃতি ফুলের মৃদু রঙের তিলক লাগিয়ে আনন্দ উপভোগ করা উচিত। সকলের সাথে একই সাথে পানাহার ও প্রকৃতির সকল উপাদানকে উফভোগ করা উচিত,যাতে সকল জীবকুল,প্রাণীকূল নিরাপদ থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যাতে অবক্ষয় না ঘটে।
"হোলি" আমাদের জাতীয় উৎসব, তবে এটি কৃতজ্ঞতা ও সেবার চেতনায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বীভৎস ও পশুসুলভ আচরণ দেখে অনেক চিন্তাবিদরা ও বিধর্মীরা এই উৎসবকে শূদ্রদের উৎসব বলে ঘোষণা করেন।অথচ এই উৎসব থেকে এমন কোন স্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না যে এটি মূর্খ শূদ্রদের উৎসব। এই উৎসব জনজীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি উৎসব। চারবর্ণ ও চার আশ্রমে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষেরই খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাই এই উৎসবের বৈদিক ও আসল নাম 'বাসন্তী নব্যস্যোষ্ঠী'।
🌼🌻হোলিকোৎসবের সাথে অজানা কাল থেকে একটি প্রাচীন ঘটনা রয়েছে যে,
"ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অত্যাচারী রাক্ষস রাজা হিরণ্যকশ্যপ তার শত্রু বিষ্ণুর ভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে তার মায়াবী বোন হোলিকার কোলে বসিয়েছিলেন এবং তাকে জ্বলন্ত চিতায় রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পান।তবে হোলিকা রাক্ষসী রেহাই পায়নি,ভস্মীভূত হয়ে যায়, তখন থেকেই এই হোলিকোৎসব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বলে জানা যায়।"

তর্কের খাতিরে এখানে এটা জানা দরকার যে, প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণ কাহিনীতে এরকম রূপক বর্ণনা আছে, যার সাথে বৈদিক হোলি উৎসবের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্কও নেই।আগুনের গুণ হল তাপ,যা দহন ধর্মবিশিষ্ট ও প্রকৃতিজাত। ভগবানের ভক্ত বা অভক্ত যাকে তাতেই রাখা হোকনা কেন, সে অবশ্যই পুড়ে যাবে।না পুড়লে প্রকৃতি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আর অনাদি সত্তা প্রকৃতি,পুরুষ কখনোই তার ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়না।

এই উপকথায়, আধ্যাত্মিক ভক্তির অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। যেমন:

হিরণ্যকশিপু = হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কাজে নিয়োজিত ভোগে আসক্ত ব্যক্তি।

হোলিকা = সে ভোগাসক্ত মানুষের লালসা,মানসিক প্রবৃত্তি।

চিতা = ঈশ্বরের ধ্যান।

প্রহ্লাদ = ভোগ্যরুপী আত্মা।

নৃসিংহ = ঈশ্বর।

এর অর্থ হল হিরণ্যকশিপু সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি যিনি ধনসম্পদে আশীর্বাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ মায়ার অধিপতি। হোলিকা হল সে মায়ায় আটকা পড়া ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও লোভ,যা তার মনোভাব এবং যার দ্বারা সে সবকিছুকে পেতে চাই, করায়ত্ত করতে চায়। অন্ত্যোষ্টিরুপ চিতা হল ঈশ্বরের ধ্যান, যা সময় বা কালের রূপ হয়ে মানুষের তৃষ্ণা-ঈপ্সা নিবারণ করে। তৃষ্ণা বা লোভ বিনষ্ট হলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির আত্মা যে আনন্দ অনুভব করে তা হল প্রহ্লাদ। এই আত্মা পুত্র রূপী।

🔥জৈমিনী গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে –

"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।" (জৈ: গৃ:১/১৮,নিরুঃ৩/১/৪) অর্থাৎ আত্মা অবশ্যই পুত্র রূপে রুপায়িত।

আধ্যত্মিক চিন্তাতে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়,

হিরণ্যকশিপুর(আসক্ত) পুত্র(অতৃপ্ত আত্মা) স্বীয় আত্মা হয়ে, দহন হতে গিয়ে, লোভ-কামনা(হোলিকা), অগ্নিভস্মীভূত(চিতা) হয়ে যে সুখ লাভ করে তাই হলো প্রহ্লাদ(তৃপ্ত আত্মা)।

পৌরাণিক দৃষ্টিতে দেখলে হোলিকা উৎসবের সাথে এ ঘটনা এভাবে সম্পর্কিত হয়-

হিরণ্যকশিপু = "হিরণ্যয়ং পশ্বতীতি হিরণ্যকশপঃ"

অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু একজন কৃষক।

হোলিকা = কৃষকের হতাশা; চাষাবাদ হবে নাকি হবে না?

চিতা = ভগবানের কৃপা যা হতাশা দূর করে।

প্রহ্লাদ = কৃষকের সুখ যা ফসল প্রস্তুত হলে সে পায়।

নৃসিংহ = ঈশ্বর।

এই অলঙ্কারের অর্থ হরিণ রূপে ধান্য ও শস্য দেখার আকুলতা নিয়ে কৃষক হলেন হিরণ্যকশিপু। হোলিকা তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হতাশা এবং বিভ্রান্তির অনুভূতি যা একজন কৃষক বপনের পরে অনুভব করেন। কৃষকের হতাশা ভগবানের কৃপায় সিংহের আকারে চিতারূপে ধ্বংস হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা হতাশার চিতা। নৈরাশ্য নাশের পর। ফসল পেয়ে কৃষক খুশি হয়ে প্রহ্লাদ হয়; তার খুশির সীমা নেই।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে এই 'বসন্তী নবসস্যোষ্ঠী', যা 'হোলিকা উৎসব' নামেও পরিচিত, এটি সম্পদ ও শস্য অর্জনের উৎসব এবং এটি একটি জাতীয় উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি, সাম্য এবং ঐক্যের অঙ্গীকার করা উচিত এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মর্যাদা বজায় রাখা উচিত, কারণ ভারতীয় উৎসবগুলি সামাজিক উদযাপনের একটি রূপ হলেও মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুঢ় রহস্য রয়েছে।ভারতীয়

জীবনের তরঙ্গে প্রবাহিত সেই রহস্যের মধ্যে রয়েছে আনন্দের অসীম উৎস, এর কৃতিত্ব ও পদ্ধতি নিহিত রয়েছে উৎসবের পবিত্রতা এবং পারস্পরিক আনন্দ ও আনন্দ প্রদানের মধ্যে এবং এই অর্জনই উৎসবের তাৎপর্য।

🌺🌻বেদের বাণী হলে🌷🌼

🏵️🏵️সংবৎসরোহসি পরিবৎসরোসীদাবৎসরোসিদ্বৎসরোহসি।

উষসস্তে কল্পন্তামহোরাত্রাস্তে কল্পন্তামর্ধেমাসাস্তে কল্পনাং মাসাস্তে কল্পন্তামৃতবস্তে কল্পন্তাঙসংবৎসরস্তে কল্পনাম্।

প্রেত্যাৎএত্যৈ সং চাঞ্চ প্র চ সারয।সূর্বর্ণ চিদসি তযা দেবতযাঙ্গিরসদ ধ্রুব সীদ।।🌼🌼

(যজুর্বেদ ২৭.৪৫)

অনুবাদ-হে আলোকিত মনুষ্যগণ তোমরা নতুন বছরে নতুন করে জেগে ওঠ,বিগত বছরের সকল জীর্ণতা ঝেড়ে ফেল।তোমাদের নতুন ভোর কর্মাত্মক হোক,বছরের সব দিনগুলো শুভ হোক,প্রতিটা মাস,অর্ধমাস শুভ হোক,ঋতুগুলো শুভ হোক।দিনে দিনে অগ্রসর হও,শক্তিমান হও,প্রাণবায়ুকে স্থির করে গুণযুক্ত হও।

🏵️🌿শুনং সুফলা বি তুদন্তু ভুমিং শুনং কীনাশ অনু যন্তু বাহান্।

শুনাসোরা হবিষা তোশামানা সুপিপ্পলা ঔষধী কর্তমস্মৈ।।🌱💐

(অথর্ববেদ ৩.১৭.৫)

অনুবাদ- কৃষক আমাদের দেয় পুষ্টির জোগান,যেন সে সমৃদ্ধির সাথে ভূমির চাষ করতে পারে।সেচের ষাঁড় ও ঘোড়াগুলো থাকুক সযত্নে।যজ্ঞের প্রার্থনায় সূর্য ও বায়ু আমাদের পূর্ণ করুক খাদ্যে ও শস্যে,ফুলে ও ফলে।

আষাঢ়ী নবান্নেষ্টির মধ্যে নবাগত আধাপাকা যবসমূহের হোমের জন্য তাকে ‘হোলকোৎসব’ বলত। তখন হোলক বা হোলে ব্যাপকভাবে খাওয়া হত এবং ছাতুর ব্যবহারও এই উৎসবে আরম্ভ হয়েছিল। ছাতু গ্রীষ্মের বিশেষ আহার এবং পিত্তাদি দোষ সমূহের দূর করে । বঙ্গদেশে আবীরোৎসব অনুষ্ঠিত হয় রাধাকৃষ্ণ যুক্ত করে যা অনুচিত, অবিহিত ও বর্জনীয় । যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শস্যকে উপযোগ করে শ্লীলভাবে আবীর জাতীয় আনন্দোৎসব গ্রহণ করা যাবে ।

■ পদ্ধতিঃ

বৃহৎযজ্ঞের পূর্ণাহুতির আগে শারদীয় নবশস্যেষ্টির ৮-৩৮ নং আহুতি । সংক্ষিপ্তভাবে করেত চাইলে বিকল্প আহুতি -

ওঁম্ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত । বসন্তোস্যাসীদাজ্যঙ্গ্রীষ্ম২ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ স্বাহা॥১॥ [যজুর্বেদ ৩১।১৪]

ওঁম্ যেন বহসি সহস্রঁয়েনাগ্নে সর্ববেদসম্ । তেনেমঁয়জ্ঞন্নো নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে স্বাহা ॥২॥ [যজুর্বেদ ১৮।৬২]

ওঁম্ বাজস্যেমম্প্রসবঃ সুষুবে গ্রে সোমঁ রাজানমোষধীষ্বঙ্গু । তা২অস্মভ্যং মধুমতীর্ভবন্তু বয়ঁ রাষ্টে জাগৃয়াম পুরোহিতাঃ স্বাহা ॥৩॥ [যজুর্বেদ ৯।২৩]

ওঁম্ বাজঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নো বাজো দেবান্হবিষা বর্ধয়াতি । বাজো হি মা সর্ববীরঞ্চকার সর্বা২আশা বাজপতির্ভবেয়ম্ স্বাহা ॥৪॥

ওঁম্ বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে । যস্যামিদঁবিশ্বম্ভুবনমাবিবেশ তস্যান্নো দেবঃ সবিতা ধর্ম সাবিষৎ স্বাহা ॥৫॥

ওঁম্ ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মে ণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ স্বাহা ॥৬॥

ওঁম্ সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে ক্রীডা চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে সূক্তঞ্চ মে সুকৃতং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ স্বাহা ॥৭॥ [যজুর্বেদ ১৮।৩৪,৩০,১২,৫]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যে ২০০টি উপকার মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদের করেছেন....

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজির ২০০তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর ২০০টি উপকার নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করবো –

১) বেদকে সত্য বিদ্যার গ্রন্থ প্রমাণ করেছেন।

২) বেদের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করেছেন।

৩) বেদকে মূল ঈশ্বরোক্ত সংবিধান বলেছেন।

৪) বেদকে মানবজাতির একমাত্র ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ বলেছেন।

৫) বেদ মর্যাদার পুনঃস্থাপনা করেছেন।

৬) অশুদ্ধ বেদভাষ্যকে শুদ্ধ করেছেন।

৭) বেদে ইতিহাস নেই বলেছেন।

৮) বেদে সাকারবাদ নেই প্রমাণ করেছেন।

৯) বেদ মনুষ্যমাত্রের জন্য বলেছেন।

১০) নারীদের বেদপাঠের অধিকার দিয়েছেন।

১১) শূদ্রকে বেদ পড়ার অধিকার দিয়েছেন।

১২) ত্রৈতবাদকে পুনঃ স্থাপিত করেছেন।

১৩) ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি তিন অনাদি তত্ত্ব বলেছেন।

১৪) বেদ শুধু কর্মকাণ্ড নয় প্রমাণ করেছেন।

১৫) বেদ ঈশ্বর প্রদত্ত, মনুষ্য কৃত নয় প্রমাণ করেছেন।

১৬) স্মৃতির মানে বেদ নয় বলেছেন।

১৭) বেদ ও সৃষ্টিতে একরূপতা বলেছেন।

১৮) ঈশ্বর ও জীব এক নয় সিদ্ধ করেছেন।

১৯) জীব কখনো ঈশ্বর হতে পারেনা বলেছেন।

২০) ঈশ্বর ও জীব এক নয় সিদ্ধ করেছেন।

২১) প্রকৃতি মিথ্যা নয় বলেছেন।

২২) ছয় দর্শনে একরূপতা বলেছেন।

২৩) ব্রাহ্মণ আদি গ্রন্থের বাক্য ও সিদ্ধান্ত বেদানুকূল হলেই সত্য ও মান্য বলেছেন।

২৪) ঈশ্বর কর্মফল প্রদাতা বলেছেন।

২৫) ঈশ্বর সব সত্য বিদ্যার ও পদার্থের মূল বলেছেন।

২৬) ঈশ্বর এক, ঈশ্বর অবতার নেন না সিদ্ধ করেছেন।

২৭) ঈশ্বর কখনো পয়গম্বর প্রেরণ করেন না এটি বুঝিয়েছেন।

২৮) ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপক সিদ্ধ করেছেন।

২৯) বেদকে আলস্য রূপী শঙ্খাসুর নিয়েছিল সিদ্ধ করেছেন।

৩০) বেদের জ্ঞান মানবসৃষ্টির আদিতে প্রাপ্ত হয় এই বলেছেন।

৩১) তীর্থস্থান যাওয়া মাত্র পাপ নষ্ট হয় না বলেছেন।

৩২) গঙ্গাতে ডুব দিলেই মুক্তি হয় না, পাপ মুছে যায় না বলেছেন।

৩৩) মাতা পিতা ঈশ্বর আচার্য বিদ্বানই তীর্থ বলেছেন।

৩৪) নিরাকার তত্ত্বই পরমসত্য প্রমাণিত করেছেন।

৩৫) জাতিবাদকে মিথ্যা বলেছেন।

৩৬) স্বভাব-গুণ-কর্মানুসারে বর্ণ ব্যবস্থাকে বলেছেন।

৩৭) শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে এই উদ্ঘোষ করেছেন।

৩৮) অস্পৃশ্যতাকে দূর করেছেন।

৩৯) জন্ম দ্বারা নয় বরং কর্ম দ্বারা মানুষ মহান বলেছেন।

৪০) বিধবার বিবাহ উচিত বলেছেন।

৪১) বিধবাদের নারকীয় জীবন থেকে রক্ষা করেছেন।

৪২) সতীপ্রথাকে মানবজাতির সব থেকে বড় কলঙ্ক বলেছেন।

৪৩) বহু বিবাহকে ঘাতক বলেছেন।

৪৪) নারীদের গুরুকুলে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন।

৪৫) পর্দা প্রথার বিরোধ করেছেন।

৪৬) বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়েছেন।

৪৭) বৃদ্ধ বিবাহ বন্ধ করিয়েছেন।

৪৮) নারীর সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

৪৯) গৃহস্থ আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

৫০) ব্রহ্মচর্যের মহিমা কীর্তন করেছেন।

৫১) বিবাহে গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী বর্ণ আবশ্যক বলেছেন।

৫২) বানপ্রস্থের উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন।

৫৩) সন্ন্যাসের মহত্ত্ব ও সন্ন্যাসীর কাজ কী তা বলেছেন।

৫৪) মানবনির্মাণ নিমিত্তে সংস্কার বিধি গ্রন্থ লিখেছেন।

৫৫) বাল্যশিক্ষা শাস্ত্রীয় পথ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন।

৫৬) জন্মপত্র তথা কুণ্ডলীর ভবিষ্যদ্বাণীকে শোকপত্র বলেছেন।

৫৭) মাতাকে নির্মাত্রী বলেছেন।

৫৮) শিশুর জন্য মাতার শিক্ষা সর্বোচ্চ মুখ্য বলেছেন।

৫৯) বালক বালিকার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা শাস্ত্রীয়ভাবে তুলে ধরেছেন।

৬০) অনিবার্য শিক্ষার মহত্ত্ব বলেছেন।

৬১) পাঠশালাইয় না পাঠালে মাতা-পিতাকে দোষী বলেছেন।

৬২) বিদ্যা গ্রহণকালে সবার একই ভোজন-বস্ত্র হবে শিখিয়েছেন।

৬৩) আর্ষ শিক্ষার মহত্ত্ব বলেছেন।

৬৪) অনার্ষ শাস্ত্র কীভাবে চিনবো জানিয়েছেন।

৬৫) ঋষিকৃত গ্রন্থের মহত্ত্ব বলেছেন।

৬৬) ঋষিকৃত গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ততা চিনতে ও সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছেন ।

৬৭) পঠন-পাঠন ব্যবস্থা শিখিয়েছেন।

৬৮) ব্রহ্মা থেকে জৈমিনী পর্যন্ত জ্ঞানকেই নিজের সিদ্ধান্ত বলেছেন।

৬৯) মহাপুরুষদের উপর দোষকে দূর করেছেন ।

৭০) যোগ বিদ্যা শিখিয়েছেন।

৭১) অষ্টাঙ্গ যোগ শিখিয়েছেন ।

৭২) প্রাণায়াম কা মহত্ত্ব বলেছেন।

৭৩) কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম ভেবে পূজার নিষেধ করেছেন।

৭৪) অন্ধ গুরুবাদের খণ্ডন করেছেন।

৭৫) ফলিত জ্যোতিষের ভণ্ডামি দূর করেছেন।

৭৬) অন্ধবিশ্বাস ও তার কারণ তুলে ধরেছেন।

৭৭) যজ্ঞে পশুহিংসার খণ্ডন করেছেন।

৭৮) নরবলিকে কলঙ্ক বলেছেন।

৭৯) কর্মকাণ্ড পদ্ধতিকে শুদ্ধ করেছেন।

৮০) পঞ্চমহাযজ্ঞকে পুনরায় প্রচলন করেছেন।

৮১) জাদু টোনা টোটকা দূর করেছেন।

৮২) ভূত-প্রেতের ভয় দূর করেছেন।

৮৩) পূর্বজন্ম-পুনর্জন্মের মহত্ত্ব বলেছেন।

৮৪) কর্মফল ব্যবস্থার মহত্ত্ব বলেছেন।

৮৫) যজ্ঞকে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা বলেছেন।

৮৬) যজ্ঞকে পর্যাবরণের জন্য অত্যাবশ্যক বলেছেন।

৮৭) গৃহস্থাশ্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনিবার্য বলেছেন।

৮৮) সন্ধ্যার বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন।

৮৯) সন্ধ্যার বিধি শিখিয়েছেন।

৯০) পরমেশ্বরই মুক্তির জন্য একমাত্র উপাস্য বলেছেন।

৯১) সব জীবেই ঈশ্বর ব্যাপ্ত বলেছেন।

৯২) অহিংসা আসলে কী শিখিয়েছেন।

৯৩) শাকাহার তথা সাত্ত্বিকাহারের মহত্ত্ব বলেছেন।

৯৪) মন্দিরে চলমান পশুবলি ও ঘৃণ্য প্রথার নিষেধ করেছেন।

৯৫) আহার-বিহারের ভেদাভেদকে অস্পৃশ্যতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছনে।

৯৬) শূদ্রের রান্না ভোজনকেও সঠিক বলেছেন।

৯৭) ব্রতের তাৎপর্য ও মহত্ত্ব বলেছেন।

৯৮) আমাদের অবনতির মূল কারণ ও সমাধান দিয়েছেন।

৯৯) গ্রহ নক্ষত্ররের প্রভাবকে অন্ধবিশ্বাস বলেছেন।

১০০) কর্মানুসার ও ত্রিবিধতাপের সুখ-দুঃখ বলেছেন।

১০১) সব প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে বলেছেন।

১০২) গোরক্ষার মহত্ত্ব বলেছেন।

১০৩) গোকরুণানিধি লিখেছে গোরু ও অন্যাদি পশু রক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন।

১০৪) সর্বপ্রথম রেবাড়ীতে গোশালা স্থাপিত করেছেন।

১০৫) গোরক্ষার জন্য হস্তাক্ষর অভিযান চালিয়েছেন।

১০৬) গোরক্ষার জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়াকে পত্র লিখেছেন।

১০৭) গো হতে কৃষি এবং কৃষি থেকে ভারতের উত্থান বলেছেন।

১০৮) পরাধীন ভারতে স্বদেশী কল-কারখানা চালু করতে বলেছেন।

১০৯) ব্যবসার জন্য উদ্বুদ্ধ করার স্বদেশী সর্বপ্রথম প্রয়াস করেছেন।

১১০) স্বদেশ ও স্বদেশীয় বস্তুকে সর্বোপরি বলেছেন।

১১১) স্বদেশী বস্তুর মহত্ত্ব বলেছেন।

১১২) ভারতীয় সভ্যতার স্বাভিমান জাগ্রত করেছেন।

১১৩) কেউ যদি আঙ্গুল জ্বালিয়ে দেয় তাও সত্য বলবেন বলেছেন।

১১৪) বালকদের শিক্ষা অজ্ঞের কাছে করাতে নিষেধ করেছেন।

১১৫) সর্বমতের একতার জন্য প্রয়াস করেছেন।

১১৬) সবাইকে দুরাগ্রহ ত্যাগ করে একত্র হয়ে বেদের পথে আসার প্রতি জোর দিয়েছেন।

১১৭) সর্বধর্ম[মত] সম্মেলন ডেকে সনাতনই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন ।

১১৮) শ্রাদ্ধ-তর্পণ কর্ম জীবিত অবস্থাতেই গুরুদের সম্মান ও সেবার জন্য বলেছেন।

১১৯) মৃত্যুর পর যাই করো মা-বাবা সেই ফল পাবে না , তাই বেঁচে থাকতে সেবা করো

এই কথা বলেছেন ।

১২০) যজ্ঞোপবীত সংস্কার পুনঃ প্রচলন করেছেন।

১২১) তথাকথিত শূদ্র ও স্ত্রীকে যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী বলেছেন।

১২২) কুসংস্কার ও জাতিভেদ তৈরি করা গ্রন্থের খণ্ডন করেছেন।

১২৩) ১৮ পুরাণকে বেদ বিরুদ্ধ প্রমাণ করেছেন।

১২৪) ঈশ্বরকে সীমিত করা হানিকারক বলেছেন।

১২৫) সত্য প্রচারের জন্য পাদ্রী, মৌলবী, জৈনী ইত্যাদিদের সাথে বারংবার শাস্ত্রার্থ করেছেন।

১২৬) কাশীতে শাস্ত্রার্থ করে মূর্তিপূজা বেদ বিরুদ্ধ বলেছেন।

১২৭) বেদ পাঠশালা স্থাপন করেছেন।

১২৮) গুরুকুল প্রণালীর মার্গ প্রশস্ত করেছেন।

১২৯) মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ বলেছেন।

১৩০)মোক্ষের অবধি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩১) ঈশ্বরের প্রমুখ ১০০ নাম ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩২) ঈশ্বর ও জীবের ভেদ কী তা বলেছেন।

১৩৩) নমস্তে-কে আর্যদের অভিবাদন বলেছেন।

১৩৪) স্বর্গ ও নরকের বাস্তবিক পরিভাষা জানিয়েছেন।

১৩৫) স্বরাজ্যের সর্বপ্রাচীন উদ্ঘোষ করেছেন।

১৩৬) ১৮৫৭ সালের ক্রান্তিতে ভূমিকা পালন করেছেন।

১৩৭) স্বরাজশাসনকেই সুরাজশাসন বলেছেন।

১৩৮) পরাধীন দেশে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন।

১৩৯) লবণ-করের সর্বপ্রথম বিরোধ করেছেন।

১৪০) বিদেশী রাজা আমাদের দেশ শাসন-শোষণ না করুক এটি বলেছেন।

১৪১) বন্য বস্তুর উপর চুঙ্গী করের বিরোধ করেছেন।

১৪২) স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করেই জমি নেওয়ার বিরোধ করেছেন।

১৪৩) অভিব্যক্তির ও বাকস্বাধীনতার স্বতন্ত্রতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

১৪৪) রাজনীতির গভীর ব্যাখ্যা করেছেন।

১৪৫) রাজাদের জন্যেও গনতন্ত্রের কথা বলেছেন।

১৪৬) ধর্ম ও রাজনীতির সুন্দর সমন্বয় করেছেন।

১৪৭) সত্যার্থ প্রকাশ – এর মতো অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৪৮) প্রথম ক্রান্তিকারী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাকে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছেন।

১৪৯) জীবনে ১৭ বার বিষ পান করেছেন কিন্তু পাষণ্ড খণ্ডন ও বেদ প্রচার ত্যাগ করেননি।

১৫০) প্রচার করার সময় দুষ্টদের প্রস্তর বৃষ্টিকে সহ্য করেছেন কিন্তু অবোধদের প্রতি রাগ করেননি।

১৫১) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার উৎস হয়েছেন।

১৫২) মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁর শিষ্য হয়েছেন।

১৫৩) সত্যার্থ প্রকাশ পড়ে পণ্ডিত রাম প্রসাদ বিস্মিল স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়েছেন।

১৫৪) ১৮৭৫ সালে আর্যসমাজ স্থাপন করেছেন

১৫৫) কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিজের উত্তরাধিকারী করেননি।

১৫৬) আর্যসমাজকে গণতান্ত্রিক সংগঠন করেছেন।

১৫৭) পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী, পণ্ডিত লেখরাম, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপত রায়ের মত

সৈনিক তৈরি করেছেন।

১৫৮) আর্যরা বহিরাগত নয় তার ঘোষণা দিয়েছেন।

১৫৯) আর্য অর্থ শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

১৬০) ভারতে আর্যদের মূলনিবাসী বলেছেন।

১৬১) আর্য ও দ্রবিড়দের ভেদ দূর করেছেন।

১৬২) আর্য দ্বারা স্থাপিত বলে প্রাচীন নাম আর্যাবর্ত বলেছেন।

১৬৩) আর্যসমাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী করেছেন।

১৬৪) আর্যসমাজের মতো সংগঠন স্থাপিত করে দেশকে সেনা প্রদান করেছেন।

১৬৫) আর্য-কে জাতিবাচক নয় বরং গুণবাচক শব্দ বলেছেন।

১৬৬) আর্য কোন জাতি নয় বরং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমষ্টি বলেছেন।

১৬৭) আর্যসমাজে স্বয়ং কোন বিশিষ্ট পদ নেননি।

১৬৮) রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান জাগ্রত করেছেন।

১৬৯) নিজের বেশভূষার প্রতি গর্ব করতে শিখিয়েছেন।

১৭০) বৈদিক সংস্কৃতির মহত্ত্ব কী তা বলেছেন।

১৭১) বিশ্ব পরিবারের তাৎপর্য বেদের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৭২) মাতৃভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন।

১৭৩) পুরুষ ও নারীর ন্যূনতম বিবাহ বয়স স্থাপিত করেছেন।

১৭৪) স্বদেশী সাহিত্যের প্রতি জোর দিয়েছেন।

১৭৫) নিজের ভাষার উপর গর্ব করতে বলেছেন ও বেদ প্রচার করতে বলেছেন।

১৭৬) আর্যসমাজকে মানবমাত্রের জন্য হিতৈষী রূপে প্রস্তুত করেছেন।

১৭৭) ১০ নিয়মের মাধ্যমে মানব জন্মকে সার্থক করার উপায় জানিয়েছেন।

১৭৮) সনাতনী হয়েও সনাতন নিন্দুকদের খণ্ডন করেছেন ও করতে শিখিয়েছেন।

১৭৯) মতভেদ থাকলেও যে সৌহার্দ্য হ্রাস পাওয়া উচিত না তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

১৮০) নিজের ব্রহ্মচর্য বল দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করেছেন ও সিংহনাদ করে আত্মরক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

১৮১) সর্বসাধারণের জন্য বেদের প্রচার-প্রসার করার জন্য 'বৈদিক যন্ত্রালয়' নামে প্রেস স্থাপন করেছেন।

১৮২) বিদেশ গমনকে পাপ নয় বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

১৮৩) বিদেশ গেলে ধর্মচ্যুত হয় না বরং ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

১৮৪) জলয়ান ও বিমানের ব্যাপারে বেদ ঠেকে উদাহরণ দিয়েছেন।

১৮৫) বিদেশে ব্যবসার উৎসাহ দিয়েছেন।

১৮৬) সর্বত্র সনাতন ও বেদ বিদ্যার প্রচার চেয়েছেন।

১৮৭) নিজের কোন সম্পত্তি তৈরি করেননি।

১৮৮) বিদেশী ভাষাও শেখা উচিত বলেছেন।

১৮৯) কোন লোভে বিচ্যুত হননি, বরং সত্যই সর্বোত্তম তার শিক্ষা দিয়েছেন।

১৯০) পিতার বৈভব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে বিত্তৈষণা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

১৯১) গুরুর একবার মাত্র বলাতেই সম্পূর্ণ জীবন জগতের ও সনাতন ধর্মের কল্যাণে সমর্পিত করেছেন।

১৯২) অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন।

১৯৩) চরিত্রে দাগ লাগতে দেননি, বরং নিজের সব কথা উন্মুক্তভাবে সকলকে জানিয়েছেন।

১৯৪) কেবল নিজের ব্রহ্মানন্দের চিন্তা না করে জগতের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

১৯৫) মরণ পরেও সমাধি তৈরি করতে না করেছেন, ভস্মকে বলেছেন কৃষি জমিতে ছড়িয়ে দিতে।

১৯৬) মৃত্যুর সময় হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেছেন।

১৯৭) নিজেকে পুজা করতে বারণ করেছেন।

১৯৮) সমস্ত বিশ্বকে সনাতনের ছত্রছায়ায় আনতে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন।

১৯৯) বারাণসীতে মিথ্যার খণ্ডন ত্যাগে শিবাবতার ঘোষণার প্রলোভনকেও হেলা ভরে ত্যাগ করেছেন।

২০০) মানবজাতির জন্য নিজের সর্বস্ব দান করেছেন।

নারীর যজ্ঞ ও পৌরহিত্য অধিকার - বেদমন্ত্রে প্রমাণ

নারীর বেদাধিকার স্বয়ং বেদ দিয়েছে [যজু০ ২৬।২]। এমতাবস্থায় নারীর বেদাধিকার সম্পর্কে কোন পৌরুষেয় গ্রন্থ কিংবা সম্প্রদায় কী মতামত দেয় তা মুখ্য নয়। তবে প্রশ্ন ওঠে শাস্ত্রে বিধিস্থলে নারীর উল্লেখ কী দেখতে পাওয়া যায় যাজ্ঞিক হিসেবে ? কেননা অধিকাংশ বিধানেই পুংলিঙ্গবাচক বিধিই আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যমান বলে মনে হয়। তাহলে নারীর যজ্ঞাধিকারের প্রায়োগিক দিক প্রমাণিত হয় কীভাবে? আজকের নিবন্ধে আমরা তা নিয়েই আলোচনা করবো।

শাস্ত্রে পৌরহিত্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি হিসেবে নির্ধারিত। ব্রাহ্মণ অর্থ বিদ্বান যথা - ব্রাহ্মণা হ বৈ বিপ্রাসঃ [জৈ০ ব্রা০ ২।৮৪], দেবা বিপ্রাঃ [শত০ ব্রা০ ৬।৩।১।১৬], বিদ্বাংসো হি দেবাঃ [শত০ ব্রা০ ৩।৭।৩।১০]।
যজ্ঞে ৪ জন ঋত্বিক থাকে । তাদের মধ্যে মুখ্য ও প্রধান ঋত্বিক হলো ব্রহ্মা। গোপথ ব্রাহ্মণে [২।১।৩] বলা হয়েছে, ' তস্মাদ্যো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স্যাৎ তং ব্রহ্মাণং কুর্বীত' অর্থাৎ যে কিনা ব্রহ্মজ্ঞান যুক্ত তাকে ব্রহ্মা করবে। তাই শাস্ত্রানুকূল সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ বর্ণে যোগ্য তথা কর্ম-গুণ-স্বভাববলে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যাধিকার স্বীকার্য।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র [১০।২।১] ' স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' এখানে 'স্বর্গকামঃ' পুংলিঙ্গে আছে । তাহলে নারীরা কী স্বর্গ চাইবে না বা যজ্ঞ করবে না ?

এর মীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব মীমাংসায় [৬।১।৮] লিখেছেন -
"জাতিং তু বাদরায়ণোঽবিশেষাৎ তস্মাৎ স্ত্র্যপি প্রতীয়েত জাত্যর্থস্য বিশিষ্টত্বাৎ"
অর্থাৎ, বাদরায়ণ আচার্য স্বর্গকাম সামান্যরূপে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য মনুষ্যজাতিতে অধিকৃত মানেন। তাই জাতিরূপে সামান্য হওয়ায় স্ত্রীরও যজ্ঞকর্মে অধিকৃত মানা উচিত । সূত্রে 'তু' শব্দ পুমান্-এর যজ্ঞাধিকার নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত। শবর স্বামীও বলেছেন, ' তস্মাদ্ শব্দেন উভাবপি স্ত্রীপুংসৌ অধিকৃতৌ ইতি গম্যতে ' = 'স্বর্গকামঃ' শব্দ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অধিকৃত।
কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেও [১।১।৭] 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' দ্বারা নারীর যজ্ঞাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

মহর্ষি জৈমিনি অবিদ্বানদেরই যজ্ঞাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন 'জ্ঞাতে চ বাচনং ন হ্যবিদ্বান্ বিহিতোঽস্তি ' এই সূত্র [৩।৮।১৮] দ্বারা ।

কেউ কেউ বলেন শাস্ত্রে বিধি কেবল পুলিঙ্গবাচক আদেশ পাওয়া যায়। তাহলে স্ত্রীর জন্য তা বিহিত কীভাবে ? উত্তরে বলতে হয়, পুমান্ স্ত্রিয়া [অষ্টা০ ১।২।৬৭],
যুবা খলতিপলিতবলিনজরতীভিঃ [অষ্টা০ ২।১।৬৬]তে পরিভাষিত ' এবং তর্হি জ্ঞাপয়ত্যাচার্যঃ - যথাজাতীয়কমুত্তরপদং তথাজাতীয়কেন পূর্বপদেন সমাসো ভবতি - ইতি। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্?। প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণং ভবতি ইত্যেষা পরিভাষা ন কর্তব্যা ভবতি ॥ যুবা খ ॥' মহাভাষ্য [২।১।৬৭] দ্বারা নারী পুরুষ উভয়েরই বোধ শাস্ত্রানুমোদিত।

যদি তা না মানা হয়, তবে হে সুধী, ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ ব্রাহ্মণৌ তথা যুবা খলতিঃ = যুবখলতিঃ-র মতো যুবতিঃ জরতী = যুবজরতী কীভাবে সিদ্ধ হবে ? নাহলে তো সূত্র ও পরিভাষা ব্যর্থ । তাই কন্যারও ঋত্বিক কর্মে অধিকার প্রমাণিত। বেদেও বলা হচ্ছে, 'স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ' [ঋ০ ৮।৩৩।১৯]।

🌸মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সংস্কারবিধিতেও বলেছেন, নারী ও পুরুষ যজ্ঞ করবে ও করাবে। এতে আর্যসমাজে নারী ঋত্বিক ও যজ্ঞাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। করুণানিধান দয়ানন্দ ঋগ্বেদের [১।১৬৪।৪১] 'গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী। অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥' মন্ত্রের 'নবপদী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'চতুর্বেদোপবেদব্যাকরণদিশিক্ষাযুক্তা'
অর্থাৎ পুরুষ-নারী উভয়ে চারবেদ,চার উপবেদ ও ব্যাকরণাদি শিক্ষাযুক্ত হবে ।

🍁অথর্ববেদ [৭।২০।৪] বলছে,
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্ ॥
হে সর্ব বরণীয় নারী ! স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান দ্বারা আমাদের যজ্ঞকে পূর্ণ করো এবং উত্তম ঐশ্বর্যযুক্তা তুমি আমাদের শ্রেয় বীরযুক্ত ধন ধারণ করাও।

🔶নারীর ঘৃতাহুতি দান সম্পর্কে বেদ বলছে -

তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি ।
অধস্পদেন তে পদমা দদে বিষদূষণম্ ॥
অথর্ববেদ ১০.৪.২৪
অর্থঃ (কন্যা) কন্যা (তৌদী) বৃদ্ধি, বলযুক্তা [তু গতিবৃদ্ধিহিংসাসু, সৌত্রঃ, বাহুলকাৎ দ প্রত্যয়ঃ = তোদঃ, অণ্ ঙীপ্ = তৌদী], (নাম) নামযুক্ত (অসি) হয়, এবং সেই কন্যা (ঘৃতাচী নাম) ঘৃত দ্বারা অঞ্চনকারী অর্থাৎ ' আহুতিদাত্রী ' এই নামযুক্ত, (অসি) হয়, সেই (তে) তোমার অর্থাৎ কন্যার (বিষদূষণম্) বিষনাশক (অধস্পদেন) নিম্নকারী গুণ দ্বারা (পদম্) গতিকে, জ্ঞানকে [পদ গতৌ], (আ দদে) গ্রহণ করি, স্বীকার করি ।
🔷নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলো নারীর যজ্ঞাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে -

ত্মনা সমৎসু হিনোত যজ্ঞং দধাত কেতুং জনায় বীরম্ ॥
ঋগ্বেদ ৭.৩৪.৬
অর্থঃ হে কন্যাগণ! যেভাবে (জনায়) জনহিতের জন্য রাজা (সমৎসু) সঙ্গ্রামে (বীরম্) যোদ্ধাদের প্রেরণা দান করেন সেভাবে (ত্মনা) নিজে নিজে (কেতুম্) বুদ্ধি [নিঘ০ ৩।৯] (দধাত) ধারণ করো, এবং (যজ্ঞম্) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম (হিনোত) বৃদ্ধি করো ।

এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূর্তী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি ।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥

ঋগ্বেদ ৭.৮০.২

অর্থঃ (এষা স্যা) এই সেই (উষাঃ) দীপ্তিমতী, কান্তিযুক্তা [নিরু০ ১২।১], (অহ্রয়াণা) অলজ্জিত, শ্রেষ্ঠকর্মসমূহ-যুক্তা [নিরু০ ৫।৩] (যুবতিঃ) প্রাপ্ত যৌবনা, (নব্যম্) নবীন, (আয়ুঃ) আয়ুকে (দধানা) ধারণ করে (গূঢ়ী) গুহ্যগুণযুক্ত (তমঃ) অন্ধকার = অজ্ঞানকে (জ্যোতিষা) জ্ঞান, প্রকাশ দ্বারা (অবোধি) জানতে পারে এবং (অগ্র) অগ্রণী হয়ে (সূর্যম্) পরমাত্মাকে [যজু০ ৭।৪২] (যজ্ঞম্ অগ্নিম্) যজ্ঞ ও অগ্নিকে (এতি) লাভ করে, সম্পাদিত করে ; এই কর্মসমূহের অপূর্ণতা কিম্বা দোষকে (প্র অচিকিতৎ) দূর করে।

শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্সাদয়ামি ।

অথর্ববেদ ৬.১২২.৫

অর্থঃ (শুদ্ধাঃ) আভ্যন্তরীণ শুদ্ধ (পূতাঃ) বাহ্যিক শুদ্ধ (যজ্ঞিয়াঃ) যজ্ঞকর্ত্রী (ইমাঃ যোষিতঃ) এই কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞাতা যুবতীদের (ব্রহ্মণাম্) ব্রহ্মজ্ঞানীদের (হস্তেষু) গ্রহণ-তুয়াগ গুণ অর্থাৎ বিজ্ঞান বলে (প্রপৃথক্) বিস্তারিতভাবে (সাদয়ামি) রাখি। অর্থাৎ শুদ্ধ, পবিত্র, যজ্ঞকারী নারীদের মধ্যে জ্ঞানীদের মত পরমাত্মা বিজ্ঞান বল বিদ্যমান রাখেন ।

তাই বেদমন্ত্র ও শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে নারীর যজ্ঞ ও পৌরহিত্যাধিকার প্রমাণিত ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে ঘোড়ার মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোথায় আছে?

🔺বেদে ঘোড়ার মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোথায় আছে ❓

বেদে সরাসরি অশ্বসহ সকল ধরনের মাংস আহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সেখানে গোরুর কিংবা অশ্বের মাংস খাওয়া যে নিষিদ্ধ হবে তা আর বিচিত্র কী। বেদমাতা আদেশ করেছেন -

য়ে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য়ऽঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
য়ে চার্বতোমাꣳসভিক্ষামুপাসতऽউতো তেষাম্ভিগূর্ত্তির্নऽইন্বতু॥
যজুর্বেদ ২৫।৩৫

পদার্থ: (য়ে) যারা (অর্বতঃ) অশ্বের (মাংসভিক্ষাম্) মাংস যাচনা (উপাসতে) করে (চ) এবং (য়ে) যারা (ঈম্) প্রাপ্তব্য অশ্বকে হত্যার যোগ্য (আহুঃ) বলে; তাদেরকে (নিঃ,হর) দূরে নিক্ষিপ্ত করো, সর্বতোভাবে বের করে দাও। এবং (য়ে) যারা (বাজিনম্) বেগবান অশ্বের (পক্বম্) পরিপক্ব স্বভাবের (পরিপশ্যন্তি) পরীক্ষা করে (উতো) এবং (তেষাম্) তাদের (সুরভিঃ) সুগন্ধ এবং (অভিগূর্ত্তিঃ)পুরুষার্থ (নঃ) আমাদের (ইন্বতু) লভ্য হোক, (ইতি) এমন কামনা।

ভাবার্থ: যারা অশ্বাদি শ্রেষ্ঠ পশুদের মাংস খেতে ইচ্ছুক তাদেরকে রাজাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিরত করবেন যাতে মানুষের উদ্যম লাভ সিদ্ধ হয়।

অর্থাৎ যারা কিনা ঘোড়ার মাংস খেতে চায়, যে ঘোড়া উপকারী ও আমাদের নিকট থাকা উচিত সেগুলোকে হত্যার যোগ্য বলে তাদেরকে রাজা এমন করা থেকে বিরত করবেন। যারা ঘোড়ার নিরীক্ষক তারা ঘোড়াকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন যেন সেই ঘোড়াকে কাজে লাগিয়ে তার যশ-সুগন্ধ ও উদ্যম আমরাও লাভ করতে পারি। অর্থাৎ আমরাও যেন ঘোড়ার স্বভাব পরীক্ষা করে ঘোড়াকে উত্তম কাজে ব্যবহার করি পাশাপাশি ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য গবেষণা করে নিজেরাও উদ্যম বৃদ্ধি করতে পারি ।

য়ন্নীক্ষ্ণং মাঁস্পচন্যাऽউ্খায়া য়া পাত্রাণি য়ূষ্ণऽআসেচনানি।
ঊষ্মণ্যাऽপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্॥
যজুর্বেদ ২৫।৩৬

পদার্থ: (য়া) যে (ঊষ্মন্যা) উষ্ণতায় উপযুক্ত (অপিধানা) আচ্ছাদন (আসেচনানি) সর্বত্র সিঞ্চিত করার (পাত্রাণি) পাত্র, (য়ৎ) যে (মাংস্পচন্যাঃ) মাংস রান্নার (উখায়াঃ) স্থালীকে (নীক্ষণম্) নিকৃষ্টভাবে [ঘৃণার চোখে - অনুবাদক] দেখা, (চরূণাম্) পাত্রসমূহের (অঙ্কাঃ) লক্ষণ (সূনাঃ) প্রসিদ্ধ এবং যে (য়ূষ্ণঃ) শুভ কর্মের বর্দ্ধক মানবের (অশ্বম্) অশ্বের (পরি, ভূষন্তি) সর্বতোভাবে অলংকৃত করে, সেগুলো স্বীকার্য।

ভাবার্থ: যদি কেউ অশ্বাদি উপকারী পশু এবং উত্তম পাখিদের মাংস খায় , তবে তাদেরকে অবশ্যই যথাপরাধ দণ্ড দেবে।

অর্থাৎ বিদ্বানরা উষ্ণতায় উপযোগী আচ্ছাদন = ঢাকনা, সবদিকে জল সিঞ্চন করার পাত্রগুলোকে নিরীক্ষণ করবেন। যাতে মাংস রান্না করা হয় এমন পাত্রকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবেন । পাত্রের প্রসিদ্ধ চিহ্নগুলোকেও নিরীক্ষণ করবেন । যদি কেউ উপকারী পশু-পাখির মাংসাহার করে তবে তাকে রাজদণ্ড অবশ্যই দিতে হবে ।

অথর্ববেদে অশ্ববধকারীকে দণ্ডদানের বিধান রয়েছে -

যদিং নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো হসো অবীরহা ॥
অথর্ববেদ ১।১৬।৪

অর্থাৎ, যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে যেন বীরদের বিনাশকারী কেহই না থাকে।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যজুর্বেদ ৩২।৩ ও পরমাত্মার স্বরূপ

★ ন তস্য প্রতিমাऽঅস্তি য়স্য নাম মহদ্যশঃ।
হিরণ্যগর্ভऽইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা য়স্মান্ন জাতऽইত্যেষঃ ॥
[যজুর্বেদ ৩২।৩]

(ন) না (তস্য) তার (প্রতিমা) প্রতিমা (অস্তি) হয় (যস্য) যার (নাম) নাম (মহৎ) মহান (যশঃ) কীর্তিকর। (হিরণ্যগর্ভ) জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আধার (ইতি) এইরূপ (এষ) এই পরমাত্মা। (মা মা হিংসীৎ) "আমাকে তোমা হতে বিমুখ করোনা", (ইত্যেষা) এইরূপে এই পরমাত্মার কাছে প্রার্থণা করতে হয়। (যস্মাত্) যার অপেক্ষা (ন জাত) অধিক প্রসিদ্ধ কিছুই নেই (ইতি) এইপ্রকার (এষ) এই পরমাত্মার স্বরূপ।

এইটি বেদের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রগুলোর একটি। এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হচ্ছে, সেই অনন্ত পরমেশ্বরকে কোনো প্রতিমায় ব্যক্ত করা সম্ভব না। কিছু ভাষ্যকার প্রতিমা শব্দ দ্বারা এখানে মূর্তি, ছবি এই অর্থগুলো গ্রহণ করেছেন। আবার কিছু ভাষ্যকার প্রতিমা শব্দ দ্বারা এখানে সাদৃশ্য, উপমা, তূলনা এই অর্থগুলো গ্রহণ করেছেন।

তবে এই ভাষ্যগুলো ছাড়াও আর্য সমাজের ভাষ্যই এখানে অত্যন্ত নিরপেক্ষ। কেননা আর্যসমাজের বিদ্বানদের করা প্রায় সকল ভাষ্যেই প্রতিমা শব্দটি দ্বারা এখানে সম্ভাব্য সকল অর্থকেই স্বীকার করা হয়েছে।
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ভাষ্য করছেন, "পরমেশ্বরের প্রতিমা অর্থাৎ পরিমাপ, সাদৃশ্য, তুলনা, প্রতিকৃতি বা আকৃতি নেই।"

হরিশরণ সিদ্ধালংকারও একইরকমভাবে ভাষ্য করছেন, "সেই প্রভুর মূর্তি, পরিমাপ, সাদৃশ্য, তুল্যতা নেই।"
ড. তুলসীরাম শর্মা অনুবাদ করছেন, "There is none and nothing like Him, no picture, no icon, no simile, no metaphor."

এভাবে আর্য সমাজের অন্যান্য সকল বেদ-উপনিষদ ভাষ্যেই অনুরূপ অনুবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ববর্তী পুরাণবাদী ভাষ্যকারগণও এরূপ উভয় অর্থকেই স্বীকার করেছেন। মহিধর ও উব্বট দুজনেই প্রায় একইপ্রকার অর্থ করেছেন যে, সেই পুরুষের প্রতিমা ও প্রতিমানভূত কোনো বস্তু নেই।

এই মন্ত্রটির অনুবাদ আবার অনেকে শঙ্করাচার্যের উপনিষদ্ ভাষ্য হতে দেখিয়ে থাকে। অথচ শঙ্করাচার্য তার সেই উপনিষদ্ ভাষ্যেই [মুন্ডকোপনিষদ্ ২|১|২] এ "অমূর্তঃ পুরুষঃ" এর ভাষ্য করেছেন, " অমূর্তঃ সর্বমূর্তিবর্জিত পুরুষ" অর্থাৎ সেই পুরুষ সর্বমূর্তিবর্জিত। অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে কোনো মূর্তি হয়না তা শঙ্করাচার্যের উপনিষদভাষ্যেও স্পষ্টতই স্বীকার করা হয়েছে।

তথাপি যজুর্বেদের উক্ত মন্ত্রে যারা প্রতিমা দ্বারা প্রতিমা বা মূর্তি অর্থকে মানেনা তাদের দাবি পরমেশ্বরের প্রতিমা বানানো অবশ্যই সম্ভব। তাই এখানে প্রতিমা দ্বারা প্রতিমা অর্থ নেওয়া যাবেনা। কিন্তু আসলেই কি বেদ, উপনিষদ্, গীতা, দর্শনাদি বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপাদিত সেই পরমেশ্বরের কোনো মূর্তি বানানো যায়? নিচে এই বিষয়েই আলোচনার চেষ্টা করব।

১) সনাতনধর্মে পরমাত্মা অসীম (সাম ৩৩৫), অনন্ত (ঋক্ ৪|১|৭)।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহতঃ। [যজুর্বেদ ৪০|৫]
(তত্) সেই ব্রহ্ম (অস্য সর্বস্য) এই সমস্তকিছুর (অন্তঃ) ভেতরে (তত্ উ) সেই ব্রহ্মই (সর্বস্যাস্য) এই সমস্তকিছুর (বাহতঃ) বাহিরে।

যিনি সমস্ত চরাচর জগতে ব্যাপ্ত হয়ে তা অতিক্রম করেও অনন্তব্যাপী একটি মানবাকৃতির প্রতিমাতে কি সেই অসীম পরমেশ্বরকে ব্যক্ত করা যায়?

পরমেশ্বরের সেই অনন্ত স্বরূপের বিষয়ে বেদে বলা হচ্ছে, " যতটা বিশাল আকাশ ও পৃথিবী তাদের বিস্তারে, যতদূর জলধারা প্রবাহমান, যতদূর প্রকাশ বিদ্যমান, যতদূর সমস্ত দিক-উপদিক বিস্তৃত এই সমস্ত অপেক্ষাও পরমেশ্বর অনেক বিশাল, তিনি সর্বদাই মহান।[অথর্ব ৯|২|২০,২১] "

বিশাল আকাশ, পৃথিবী, সমস্ত দিক-উপদিকও যার বিশালতার কাছে অতি নগণ্য সেই পরমেশ্বরের অপার স্বরূপকে সামান্য কোনো মূর্তি-ছবিতে ব্যক্ত করার ক্ষমতা কারো আছে কি?

সমস্ত জগত তারই মহিমা, তিনি এই সমস্ত জগত অপেক্ষাও অনেক বিশাল। [যজু ৩১|৩]।
ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বিশাল। "তার অপেক্ষা বিশাল কিছুই নেই [ঋগ্বেদ ৪|৩০|১]। "
শুধুমাত্র এই জগতের বিশালতাকেই আমরা কল্পনাতেও ধারণ করতে অপারগ। আর যেই ব্রহ্মের বিশালতার কাছে এই সমস্ত জগতও তুচ্ছ কোন মূর্তি, ছবি বা আকারে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা যাবে?
বেদে আরো বলা হচ্ছে,

যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ। ন ত্বা বজ্রিন্সহস্রম্ সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী।।
[সামবেদ ২৭৮]
(ইন্দ্র) হে সর্বৈশ্বর্যময়, (যত্) যদি (তে) আপনার (দ্যাবঃ) এই আকাশ (শতম্) শতসংখ্যক হয় (উত্) এবং (ভূমিঃ শতম্ স্যুঃ) যদি পৃথিবীও শতসংখ্যক হয় (ন ত্বা অনু) তা আপনার সমান হবে না। (বজ্রিন্) হে ওজস্বী ব্রহ্ম, (সহস্রম্ সূর্যাঃ) সহস্র সূর্যও আপনার সমান না। (জাতম্) সমস্ত সৃষ্টিতে নিজ মহিমা দ্বারা প্রকট আপনাকে (রোদসী) সমস্ত দ্যুলোক- পৃথিবী (ন অষ্ট) ব্যাপ্ত করতে পারে না।

শত পৃথিবী, শত আকাশও যার সমান না কোন মূর্তি সেই অনন্ত পরমাত্মার সমান হবে? একটা মানুষের মতো দেখতে মূর্তি বানিয়ে দিলেই কি তা সেই অনন্ত পরমাত্মার মূর্তি হয়ে যায়?

২) এমন কোন আকার বা শরীর আছে যা পরমেশ্বরের সেই অসীম স্বরূপকে নিজের মধ্যে ধারণ করবে? কোনোকিছুর আকার আছে মানেই হলো তার একটা সীমানা বা বাউন্ডারি আছে। যেহেতু পরমেশ্বর অসীম তাই তার কোনো আকার বা শরীর হতে পারেনা। কেননা আপনি পরমেশ্বরকে কোনো আকার দিলেন মানে আপনি তাকে সেই আকার বা শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছেন। অনন্ত অপার পরমেশ্বরকে কোনো আকার বা রূপে আবদ্ধ করা যায় না।
অতএব, যেই পরমেশ্বর নিরাকার (যজু৪০|৮), অরূপ(শ্বেতা৩|১০) তার কীভাবে কোনো প্রতিমা বানানো যেতে পারে?

৩) আলোচ্য মন্ত্রাংশের অর্থ হিসেবে আপনি বলছেন, " পরমেশ্বরের সদৃশ কিছু নেই", "পরমেশ্বরের সাথে তূলনা করার মতো কিছু নেই "। এই অর্থগুলো আর্য সমাজও স্বীকার ও একইসাথে মনন করে।
পরমেশ্বরের সদৃশ কিছু হতে পারেনা যদি আপনি তা বিশ্বাস করেন তাহলে কীভাবে কোনো মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির রূপ বা আকারকে পরমেশ্বরের সদৃশ বলে মানছেন?

যদি পরমেশ্বরের সাথে তূলনা করার মতো কিছুই না থাকে তাহলে কোনো জড় মূর্তির রূপ বা আকারকে আপনি কীভাবে পরমেশ্বরের সাথে তূলনা করছেন?

বেদাদি শাস্ত্রে অসংখ্য জায়গায় বলা হয়েছে পরমেশ্বরের সদৃশ বা তার সাথে তূল্য কিছু হতে পারে না।
দেবীসুক্তে পরমাত্মা বলছেন, "আরভামাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা। [ঋক্ ১০|১২৫|৮] অর্থাৎ আমিই নিখিল জগতের নির্মাণ করি। আমি আকাশের অতীত, এই পৃথিবীর অতীত।"
"তার সদৃশ কিছু না আছে পৃথিবীতে, না আছে আকাশে। না জন্মেছে, না জন্মাবে। [ঋক্ ৭|৩২|২৩]"
"হে পরমেশ্বর! না এরূপ কিছু আছে যেরূপ আপনি। [ঋক্ ৪|৩০|১] "
এই জগতে যদি সেই অনন্ত পরমেশ্বরের সদৃশ কিছু না থাকে তাহলে কেন প্রতিমা তৈরি করে জাগতিক রূপ, আকারে তাকে ব্যক্ত করা হয়?

উপনিষদে ঋষিগণের বাক্যে যিনি জ্ঞাত - অজ্ঞাত সমস্তকিছুরই অতীত[কঠ ২|১|১০] সামান্য একটা মানবাকৃতির মূর্তি বানিয়ে দিলেই কি সেই সর্বেশ্বরের প্রতিমা হয়ে যায়?
যিনি পরম [ঋক্ ১|১৬৪|৩৯], যার সদৃশ কিছুই নেই [ঋক্ ১|৫২|১৩] কেন কোনো প্রতিমা বানিয়ে বলা হয় তা সেই পরমেশ্বরের সদৃশ?
৪) যেই পরমেশ্বর সমস্ত জাগতিক পরিমাপের অতীত [অথ ১০|৭|৩৯] কোন পরিমাপে তার মূর্তি নির্মিত হবে?
৫) নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। [শ্বেতাশ্বতর ৬|৯]
(তস্য) তার (লিঙ্গম্) কোনো চিন্হবিশেষও (ন এব) নেই।
ন প্রতীকে ন হি সঃ।। [বেদান্তদর্শন ৪|১|৪]
(ন প্রতীকে ন হি সঃ) প্রতীক = মূর্তি আদি জড়ের মাঝে পরমাত্ম-বুদ্ধি করা উচিত না, কেননা তা পরমাত্মা নয়।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে কোনো চিন্হবিশেষেও সেই অনন্ত পরমেশ্বরকে ব্যক্ত করা যায় না। এই শাস্ত্রবাক্যগুলোর অর্থ নিয়ে কিন্তু কারো কোনো দ্বিমত নেই। তাহলে যেই পরমেশ্বরের কোনো চিন্হবিশেষও তৈরি করা সম্ভব না তার প্রতিমা কীভাবে তৈরি করা যাবে?

৬) যারা এরূপ কোনো আকৃতি, প্রতিমা, বস্তু বা স্থানেই পরমাত্মা বিশেষভাবে বিদ্যমান বলে মনে করে তাদের বিষয়ে উপনিষদে এসেছে,

যদ্ এবেহ তদ্ অমুত্র যদ্ অমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যো স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।
[কঠোপনিষদ ২|১|১০]
(যৎ) যেই ব্রহ্ম (ইহ) এখানে (তৎ এব) সেই ব্রহ্মই (অমুত্র) ওখানেও, (যৎ) যেই ব্রহ্ম (অমুত্র) ওখানে (তৎ) সেই ব্রহ্ম (ইহ অনু) এখানেও একইভাবেই বিদ্যমান। (যঃ) যেই ব্যাক্তি (ইহ) এই ব্রহ্মতে (নানা ইব) নানাত্ব (পশ্যতি) দর্শন করে (সঃ) সে (মৃত্যোঃ) মৃত্যু হতে (মৃত্যুম্) মৃত্যুকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয়।
গীতাতেও বলা হচ্ছে,

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং [গীতা ১৩|২৭]
(সর্বেষু ভূতেষু) তিনি সর্বভূতে (সমং) সমভাবে (তিষ্ঠন্তং) স্থিত।
তাই তিনি যে কোনো আকৃতি, প্রতিমা, বস্তু বা স্থানেই বিশেষভাবে বিদ্যমান আছেন এমনটা নয়। তিনি নিখিল ব্রহ্মান্ড ও তার পরেও যাকিছু সমস্ততে এক অদ্বিতীয় স্বরূপেই পূর্ণ হয়ে আছেন। যারা কোনো বিশেষ আকৃতি, প্রতিমা, বস্তু বা স্থানেই কেবল তাকে দর্শন করার চেষ্টা করে তারা সেই পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেনা এবং সেই অজ্ঞানতাবশত মৃত্যু হতে মৃত্যুকে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর এই সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

৭) যারা মূর্তি-পূজা করে তারা পরমেশ্বরকে কোনো মানবাকৃতি বা তাদের কল্পিত কোনো বিশেষ রূপেই চিন্তন করে। অথচ পরমেশ্বর স্বয়ং রূপ,শরীর বা আকারাদির অতীত হয়েও তার রূপ বা শরীর বিশ্বময়। কেননা পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত রূপের স্রষ্টা [অথ ১৩|১|১১], তাই জগতের সমস্ত রূপও তারই। আবার আত্মা যেরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে তেমনি পরমেশ্বর সমস্ত ভূতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন [যজু ৪০|৫,৬], সমস্ত রূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন [ঋক্ ৯|২৫|৪]।
তাই উপনিষদে বলা হচ্ছে,

"পরমেশ্বর সমস্ত ভূতেই প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, সমস্ত ভূতই তার শরীর [বৃহদারণ্যক ৩|৭|১৫]। " এভাবে বলা হচ্ছে, "পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, দিকসমূহ, আকাশ, অন্ধকার, তেজ সমস্তকিছুর মধ্যে তিনি বিদ্যমান। এই সমস্তকিছুই তার শরীর [বৃহ ৩|৭|৩-১৪]। "

তাই পরমেশ্বরকে কোনো বিশেষ আকার, শরীর বা রূপেই কল্পনা করা ভ্রান্তমত ব্যতিত কিছুই না। বরং তার দ্বারা ব্যাপ্ত জগতের প্রতিটা বস্তুই তার শরীর, এই সমস্ত জগতই তার শরীর। সমস্ত জগতময় তার রূপ।
পবিত্র বেদেও একইভাবেই সেই নিরাকার পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে,

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুত্ উদরম্। দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যষ্ঠায ব্রহ্মণে নমঃ॥
[অথর্ববেদ ১০|৭|৩২]
(ভূমিঃ) ভূমি (যস্য) যার (প্রমা) পাদমূল (উত) ও (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (উদরম্) যার উদর (দিবম্) এই দ্যুলোক (মূর্ধানম্) যার মস্তক (যঃ চক্রে) যিনি একে রচনা করেছেন (তস্মৈ জ্যেষ্ঠায়) সেই সব থেকে মহান, (ব্রহ্মণে) সব থেকে বিশাল পরমাত্মাকে (নমঃ) নমস্কার করি।
যস্য সূর্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ। অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥
[অথর্ববেদ ১০|৭|৩৩]
(পুনর্ণব) পুনঃপুনঃ নবীন (সূর্যঃ চ চন্দ্রমাঃ) এই সূর্য ও চন্দ্রমা (যস্য) যার (চক্ষুঃ) নয়ন। (অগ্নিম্) প্রকাশ (আস্যম্) যার বদন। (যঃ) যিনি (চক্রে) একে রচনা করেছেন। (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) সব থেকে মহান, (ব্রহ্মণে) সব থেকে বিশাল পরমাত্মাকে (নমঃ) নমস্কার করি।

অর্থাৎ একজন প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত পরমেশ্বরকে কেবল কোনো বিশেষ আকার বা রূপেই চিন্তন করে না। বরং তার স্রষ্টাকে সে খুঁজে পায় সমস্ত সৃষ্টির মাঝেই। অনন্ত অপার পরমেশ্বর সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, এই সমস্ত জগতই যেন তার শরীর। ওই সূর্য ও চন্দ্রমা যেন তারই দুইটি চোখ, দীপ্তি যেন তার বদন, দ্যুলোক তার মস্তক, অন্তরিক্ষ তার উদর, এই ভূমি

যেন তারই পাদমূল। অর্থাৎ এই নিখিল জগতই তার রূপ, এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়েই রূপহীন তার রূপ ব্যক্ত হয়। এভাবে প্রতিটা বস্তুতেই একজন ঈশ্বরভক্ত পরমেশ্বরের বিভূতি খুঁজে পায়। সমস্ত জগতময় তার সেই বিশ্বরূপকে উপলব্ধি না করে যারা কোনো প্রতিমা বানিয়ে পরমেশ্বরকে কেবল কোনো বিশেষ আকার বা রূপেই কল্পনা করতে চায়, তারা পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেনা।

সনাতন ধর্ম কি ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা সমর্থন করে ?

সনাতন ধর্মে কাম সন্তান উৎপাদনের জন্য বিহিত ও যৌনতা দুইটি বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মধ্যেই অনুমোদিত । এজন্য আদর্শিক বিরোধ থাকায় তা সমর্থন করে না ।

১। সনাতন ধর্মে কাম অর্থাৎ বৈধকাম [গীতা ১০.২৮] সন্তান জন্মদানের জন্য বিহিত ।

২। বেদে পরমকাম্য হলেন ঈশ্বর । অথর্ববেদে ১৪ম কাণ্ডে যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে কাম একমাত্র বিবাহিত নারী ও পুরুষেই বিহিত । যেমন অথর্ববেদ ১৪.১.৪০.

৩। যেহেতু সমকামীতা ১ ও ২ নং পয়েন্ট পূর্ণ করে না তাই সমকামিতা সনাতন ধর্ম সমর্থন করে না ।
৪। বিরোধ করে কিনা এই প্রশ্নের জবাব হলো যদি একক একটি পথ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তবে বাকি পথ অটোমেটিক্যালি নিষিদ্ধ হয়ে যায় । তাই সমকামিতা অননুমোদিত বলা যায় ।

ছলে-বলে কিংবা যদি কেউ কুমার-কুমারীর অজ্ঞাতে বা জোর করে সমকামিতা করে তবে তার শাস্তির বিধান মনুস্মৃতিতে নিম্নরূপ -

কন্যৈব কন্যাং যা কুর্যাত্তস্যাঃ স্যাদ্দ্বিশতো দমঃ ।
শুল্কং চ দ্বিগুণং দদ্যাচ্ছিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ । ।
বিশুদ্ধমনুস্মৃতি ৮/৩৬৯
পদার্থঃ (য়া কন্যা এব কন্যাং কুর্য়াত্) কোন কন্যা যদি অন্য কন্যার কুমারী অবস্থা আঙ্গুলি=বা অন্য কিছু দিয়ে নষ্ট করে (তস্যাঃ দ্বিশাতো দমঃ স্যাত্) তাদেরকে দুইশত পণের দণ্ড করে (চ) আর (দ্বিগুণং শুল্কং দদ্যাত্) তাহার থেকে দুইগুণ অর্থাৎ চারশো জরিমানা ওই কন্যাকে দাও (চ) এবং (দশ শিফাঃ আপ্নুয়াত্) দশ বেত্রাঘাত মেরে দণ্ড দোষী কন্যার হইবে।

যা তু কন্যাং প্রকুর্যাৎস্ত্রী সা সদ্যো মৌণ্ড্যং অর্হতি ।
অঙ্গুল্যোরেব বা ছেদং খরেণোদ্বহনং তথা।।
বিশুদ্ধমনুস্মৃতি ৮/৩৭০

পদার্থঃ (য়া তু স্ত্রী কন্যাং প্রকুর্য়াৎ) যদি কোন মহিলা কোন কন্যার কুমারী অবস্থা অঙ্গুলি দিয়ে নষ্ট করে দেয় তবে (সা সদ্যং মৌণ্ড্যম্+অর্হতি) তাহাকে শীঘ্র মস্তক মুণ্ডিত করা উচিত (বা) যা (অঙ্গুল্যোঃ+এব ছেদম্) দুই আঙ্গুলি কেটে দেওয়া উচিত (তথা) এবং (খরেন+উদ্‌বহনম্) তাহাকে গাধার উপর বসিয়ে ঘুরানো উচিত।

বলা হচ্ছে "যদি কোনো মহিলা কোনো কন্যার কুমারী অবস্থা আঙ্গুলি দিয়ে নষ্ট করে দেয় তবে তার মস্তক মুণ্ডিত করা উচিত বা আঙ্গুলি কেটে দেওয়া উচিত।" আমার মতে এখানে সমকামিতার সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়নি। সমকামিতা হচ্ছে সমপ্রেম বা সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ বা যৌন আকর্ষণ। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যে আমরা পাচ্ছি কোনো মহিলা কোনো মেয়ের কুমারী অবস্থাকে নষ্ট করলে শাস্তি পাওয়া উচিৎ। এখানে সমপ্রেম বা যৌন আকর্ষণ ছাড়াও উক্ত কাজটি করা সম্ভব। যা ধর্ষণ সংজ্ঞার মধ্যে পরতে পারে। কোনো মহিলা কোনো কন্যার কুমারী অবস্থাকে নষ্ট করা এক ধরনের যৌন নিগ্রহ। অনুমতি ব্যতিরেকে কারো সঙ্গে যৌন কর্ম করাটা ধর্ষণের পর্যায়ে পরে। এমনটা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এটি সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে সরাসরি অপরাধ।
মনুস্মৃতিতে তখনই সমকামীদের সাজার বিধান আছে যখন তারা অন্যদের জোর করবে, বা অন্যদের সাথে এগুলো করার চেষ্টা করবে। এর সাজা হল সমাজচ্যুত করা। স্বাভাবিকভাবেই এর কারণ হল তারা যেন সমাজের বাকিদের প্রভাবিত না করতে পারে। কারণ এই ব্যাপারগুলো অনেকের মাঝে হয়তো প্রাকৃতিকভাবে থাকে, তবে এগুলোকে ওপেনলি প্রমোট করলে আরো অনেকেই উৎসাহবশে এগুলোতে আকৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্বা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যযোঃ ।
জৈহ্ম্যং চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্ ।।
বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি ১১/৬৭
পদার্থঃ (ব্রাহ্মণস্য, রুজঃ, কৃত্বা) ব্রাহ্মণ কে লাঠি আদি হইতে পীড়া দেওয়া ক্রিয়া করা (অঘ্রেয়মদ্যয়োঃ, ঘ্রাতিঃ) দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ এবং মদ্রকে শোকা (জৈহ্ম্যং) কুটিলতা করা (চ) আর (পুংসি, মৈথুনং) পুরুষ হয়ে পুরুষের সাথে মৈথুন করা (জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্) ইহাদের জাতিভ্রংশকর=জাতি হইতে পতিত হওয়ায় পাতক বলা হয়।

অর্থাৎ পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে অথবা নারী অন্য নারীর সাথে যৌনক্রিয়া করলেও প্রকৃতিগতভাবে সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মীয়ভাবে এই মিলনকে পাপ বলা হচ্ছে। ধর্মীয়ভাবে আরেকটা বিষয় এখানে বলা প্রয়োজন। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বিবাহপদ্ধতি গুলোতে কেবল নারীর সাথে পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারীর সাথে নারীর বা পুরুষের সাথে পুরুষের বিবাহপদ্ধতি পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টিতেও সমকামিতায় যৌনকর্মকে পাপ বলা যায়।

কিন্তু সমকামিতা কখনোই ধর্ষণ নয়, কেননা অধিকাংশ গবেষকদের মতে সমকামিতায় সাধারণত নারী পুরুষদের মতোই প্রেমের আবির্ভাব হয়, যা প্রকৃতিগত [প্রকৃতিগত আরো অনেক কিছুই আছে যা কিন্তু আমরা নৈতিক ও বৈধ মনে করি না এই বিষয়টা পাঠক খেয়াল রাখবেন, আমরা একটু পরেই সেটা নিয়ে আলোচনা করবো]। শুধু নারী বা পুরুষের মধ্যেই নয়, পোকামাকড়, মাছ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে প্রায় ১৫০০ প্রজাতিতে সমকামিতা রয়েছে। প্রথমদিকে ধারণা ছিল

সমকামিতা একটি মানসিক অসুখ। তারপর প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে সরিয়ে নেয় এবং ১৯৯০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও একই কাজ করে। রিপোর্টে বলা হয় সমকামী বা উভকামী হওয়াটা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। এটা কোনোপ্রকার অসুস্থতা নয় এবং তাই এ জন্য চিকিৎসার দরকার নেই। সম্ভবত এই তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতে সমকামিতা বৈধ করা হয়েছিল। এছাড়া নেদারল্যান্ড, তুরস্ক, মালি, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া, আলবেনিয়া, বাহরাইন, ফিলিস্তিন, ইরাক সহ অনেক দেশেই সমকামিতা বৈধ। সমকামিতার পক্ষে বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে সমকামিতা জন্মগত। এইটাকে Born this way Argument বলা হয়। তাদের মতে, Gay gene এর প্রভাবে মানুষ সমকামী হয়।
2019 এ সমকামিতা এবং জেনেটিক্সের উপর সর্ববৃহৎ রিসার্চ করা হয়। প্রায় ৫ লাখ মানুষের উপর করা স্টাডি এর ফলাফলে Gay gene বলে আলাদা করে কিছু নেই এটা প্রমানিত হয়। কোন single link নেই এর মধ্যে,অনেকগুলা Gene হালকাভাবে এই ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। জিন প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিষয়টা এমন না যে অনেকগুলা জিন পুরোপুরি নির্ধারণ করে দেয় একজনের sexual orientation কি হবে বরং মাত্র ৮-২৫% প্রভাবিত করে। জেনেটিক্স,জেনেটিকাল প্রভাব মাত্র ৮-২৫% ব্যাখ্যা করতে পারে। রিসার্চ পেপারটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ন্যাচার এবং সায়েন্স জার্নালে। পেপারের লিংকঃ

- ন্যাচার-

  https://www.nature.com/articles/d41586-019-02585-6

  সায়েন্স-

  https://www.sciencemag.org/.../genetics-may-explain-25...

রিসার্চের ব্যাপারে ডিজাইন করা বিস্তারিত ওয়েবসাইট:-
https://geneticsexbehavior.info/what-we-found/
https://www.harvardmagazine.com/.../there-s-still-no-gay...
এর দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে মানুষ জন্মগতভাবে সমকামি হয়।সমকামিতার জন্য জিন দায়ী মাত্র ৮-২৫%।

অন্যদিকে অ্যালকোহোলিজম(Alcoholism) এমনকি সহিংসতার জন্য জেনেটিকাল প্রভাব দায়ী ৫০%! সুতরাং

একইভাবে সমকামিতাকে Born This way Argument দিয়ে কোনভাবেই স্বাভাবিক প্রমান করা যায় না। এলকোহলিজম এবং সহিংসতার সাথে জিনের সম্পর্ক নিয়ে পড়ুনঃ
https://www.jax.org/.../the-genetics-of-violent-behavior
https://vertavahealth.com/alcohol/is-alcoholism-genetic/...
https://americanaddictioncenters.org/.../hereditary-or...

কিন্তু তবুও আমরা কিন্তু এলকোহলিজম এবং সহিংসতা কে জন্মগত বলি না। সুতরাং সমকামিতাকেও জন্মগত বলার সুযোগ নেই।

এই কারণে অনেক প্রো LGBTQ এক্টিভিস্টও Born This Way Argument এর বিরোধিতা করেন।

- **ট্রান্সজেন্ডার কারা ও কেন হয় ?**

ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে সম্ভাব্য কারণ মধ্যে অন্যতম হল - জিনগত প্রভাব, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের দেহে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণের পরিমাণ, ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের ওপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি।

There is no single explanation for why some people are transgender. The diversity of transgender expression and experiences argues against any simple or unitary explanation. Many experts believe that biological factors such as genetic influences and prenatal hormone levels, early experiences, and experiences later in adolescence or adulthood may all contribute to the development of transgender identities।

১. Frequently Asked Questions about Transgender People

২. Understanding transgender people, gender identity and gender expression

এরকম সেক্স ডিজঅর্ডার আছে যাকে বলে Androgen Insensitivity Syndrome.
কিছু সময় সন্তানের লিঙ্গ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মেয়েদের মতো হলেও তার জেনেটিক সেক্স হয় 'XY' অর্থাৎ, ছেলেদের মতো! এই সমস্যা হয় টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশান হলে
বা,Androgen insensitivity syndrome (AIS)।

এদের সেক্স ক্রোমোজম XY কিন্তু বহিঃজননাঙ্গ পুরোপুরি মেয়েদের মত অথবা অস্পষ্ট থাকে। জড়ায়ু কখনো থাকে বা নাও থাকতে পারে কিন্তু অভ্যন্তরীণ শুক্রাশয় তলপেটের মধ্যে তৈরি হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে একে 46 XY DSD বলা হয় (Male pseudoharmaphrodite)।
এর অনেকগুলো কারণ আছে, তন্মধ্যে ছেলে হরমোনের(টেস্টোস্টেরন) প্রতি শরীরের/ জননাঙ্গের কম আসক্তি বা সাড়া প্রদান (Androgen insensitivity syndrome – AIS) অন্যতম।
জানা আছে কি ১৯৮৮ অলিম্পিকের সে ঘটনা? মারিয়া প্যাতিনো(María José Martínez-Patiño) নামক স্পেনিশ অলিম্পিয়ান বাহ্যিভাবে দেখতে যে কিনা পূর্ণাঙ্গ মেয়ে সে অলিম্পিক প্রতিযোগীর সেক্স ক্রোমোজোমে পুরুষের xy ক্রোমোজোম থাকায় সে খেলা থেকে বাতিল হয়ে যান। এছাড়া ২০০৬ সালে কাতারের এশিয়া গেইমসের ভারতের সাথীর ঘটনা। এইরকম ঘটনা আরো আছে।

১। XY+টেসটিস+ মেইল সেকেন্ডারি সেক্সচুয়াল ক্যারেকটার = Male(পুরুষ)। এই পুরুষ অপারেশন করেও কখনো মা হতে পারবে না।
২। XX +ওভারি+ ফিমেল সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেকটার= Female (নারী)। এই নারী অপারেশন করেও কখনো বাবা হতে পারবে না।
এখন হিজড়াতে আসি, এখানে বহু ভ্যারাইটি আছে, তবে এদেরকে মোটাদাগে ৩ভাগে ভাগ করি।
৩। কমপ্লেক্স হিজড়া (True hermaphrodite) এদের বিষয়টা কমপ্লেক্স। অনেক সময় টেসটিস, ওভারি একসাথে থাকতে পারে। এদের প্রকৃত সেক্স ডিটারমাইন করা টাফ। এরা সংখ্যায় অতি নগন্য।
৪। মেল প্রিডমিনেন্ট হিজড়া (Male pseudohermaphrodite) XY+টেসটিস+ ফিমেল সেকেন্ডারি। এরা ইন্টারনালি মেইল, এক্সটারনালি ফিমেল। এদের মেডিকেল ও সার্জিকাল ট্রিটমেন্টের পর বাবা হবারও সুযোগ থাকে।
৫। ফিমেল প্রিডমিনেন্ট হিজড়া (Female pseudohermaphrodite) XX + ওভারি+ মেল সেকেন্ডারি। এরা ইন্টারনালি ফিলেম, এক্সটারনালি মেইল। মেডিকেল ও সার্জিকাল ট্রিটমেন্টের পর এদের মা হবার সুযোগ থাকছে।

এখানে ১ পুরুষ, ২ নারী, ৩,৪,৫ হিজড়া।

মোটাদাগে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ক্রোমোজোম টেস্ট "“ক্যারিওটাইপিং" এর মাধ্যমে দেখতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি আদতে নারী নাকি পুরুষ জিনগতভাবে । যেখানে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণই সম্পূর্ণ এককভাবে সুনিশ্চিত নয় তখন উন্মুক্ত অকুণ্ঠ সমর্থন কীভাবে সম্ভব ? এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত এগোবে । কিন্তু যদি কোন পরীক্ষা না থাকে কেবল ব্যক্তিগত কামবোধ [অর্থাৎ আমার নিজেকে মেয়ে/ছেলে মনে হয় তাই আমি ছেলে/ মেয়ে হতে চাই এমন মৌখিক ভিত্তিহীন দাবি] ও যৌনতার জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত ট্রান্সজেন্ডারের অনুমোদন যে উলটো বিকৃত যৌনাচার বা ব্যভিচার ডেকে আনবে না তার নিশ্চয়তা কী ? তাই উচিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে তারপর ধর্মীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আচরণ করা। নতুবা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপব্যভার সুনিশ্চিত ।

- **আমাদের কি সমকামিদের ঘৃণা করা উচিৎ?**

না, যেহেতু কোনভাবে এটার একটা অত্যল্প হলেও পারিপার্শ্বিক বা জেনেটিক প্রভাব থাকতে পারে, আবার এটাও বিবেচ্য যে সেই কারণগুলো যে দাবি করছে তার বেলায় আদৌ প্রযোজ্য কি না । কিন্তু আমাদের আদর্শ ও ধর্মীয় সিদ্ধান্তের সাথে মেলে না তাই বোঝানো যেতে পারে । কিন্তু এটা কখনোই প্রমোট করা যাবে না বা হবে না [আবারও বলছি ধর্মীয় , সামাজিক সিদ্ধান্ত] । ব্যক্তিগতভাবে কে ঘরে কি সেটা একান্ত তার বিষয় কিন্তু প্রকাশ্যে কখনো তার সমর্থন হবে না ।

© **বাংলাদেশ অগ্নিবীর**

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের মুক্তো

◘ বাল্মীকি রামায়ণের বালকান্ডের মুক্তো ◘

▪□ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র কেমন ছিলো ?

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ।

নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ধৃতিমান্বশী ॥

বুদ্ধিমান্নীতিমান্বাগ্মী শ্রীমাঞ্ছত্রুনিবর্হণঃ ।

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥

মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ ।

আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ ॥

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।

পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ ॥

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ ।

যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১।৮-১২

অনুবাদ: 'ইক্ষ্বাকুবংশজাত, জনগণ যাঁকে 'রাম' নামে জানেন, (তিনি) সংযতাত্মা, মহাবলবান, কান্তিমান, ধৈর্যশীল এবং জিতেন্দ্রিয়। তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সুবুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রুসংহারক, তাঁর স্কন্ধদেশ সুদৃঢ়, বাহুযুগল দীর্ঘ, - শঙ্খের ন্যায় তাঁর গ্রীবাদেশ এবং গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদিক সুপুষ্ট। শ্রীরামচন্দ্রের বক্ষোদেশ বিশাল, বিশাল ধনু তাঁর, তাঁর কণ্ঠাস্থি মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত; তিনি শত্রুদমনকারীআজানুলম্বিত বাহুদ্বয় তাঁর, সুন্দর মস্তক ও উন্নত ললাট এবং তাঁর গমনাগমন মনোহর বিক্রমশালী। শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিভক্ত, তাঁর গাত্রবর্ণ সুস্নিগ্ধ। তিনি তেজস্বী। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল এবং নেত্রদ্বয় আয়ত। তিনি লক্ষ্মীবান ও শুভলক্ষণযুক্ত। (শ্রীরামচন্দ্র) ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজা-কল্যাণব্রতী, যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং যোগসমাধিমান পুরুষ ।

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা ।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ।

সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥

সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ।

আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥

স চ সর্ব গুণোপেতঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ ।

সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১।১৪-১৭

অনুবাদ: (শ্রীরামচন্দ্র) স্বধর্ম এবং স্বজনদের প্রতিপালক, বেদ ও বেদাঙ্গগুলির গূঢ়রহস্যজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী। (তিনি) সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সাধু, উদার ও বিচক্ষণ। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রুপ সাধু- সজ্জনগণ সর্বদা তাঁর শরণাগত হন। তিনি সগুণসম্পন্ন, সর্বদাই সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন। তিনি সর্বগুণান্বিত হয়ে মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী। গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের মতো এবং হিমালয়ের মতো ধৈর্যশীল।

▪□ দশরথের রাজ্য কেমন ছিলো □

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥
সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥
নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্ ।
নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধৃক্ ।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৬।৮-১১

অনুবাদ: 'অযোধ্যতে কোথাও কখনও কামুক ব্যক্তি, কৃপণ, নিষ্ঠুর বা ক্রুর ব্যক্তি, অশিক্ষিত এবং নাস্তিক ব্যক্তি দেখা যেত না।'অযোধ্যার সকল নরনারীই ছিল ধর্মপরায়ণ, ব সংযমী এবং সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত; (অধিক কি!) স্বভাব এবং ব আচরণে তারা

ছিল মহর্ষিদের মতো নির্মল চিত্ত। 'অযোধ্যায় কেউই কুণ্ডলবিহীন, মুকুটহীন এবং অ পুষ্পমাল্যহীন ছিল না; কারও ভোগ্যবস্তু অল্প ছিল না; সকলেই শরীর মার্জন করত, অঙ্গে চন্দন লেপন করত = এবং সুগন্ধ দ্রব্যসকল ব্যবহার করত। 'অযোধ্যাপুরীতে অশুদ্ধ অন্নভোজী কেউই ছিল না; বাহুভূষণ, কণ্ঠভূষণ এবং হস্তভূষণহীনও কেউই ছিল না; অধিকন্তু কেউই আত্মজ্ঞানহীন ছিল না ।

নানাহিতাগ্নির্নায়জ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ ।
কশ্চিদাসীদয়োধ্যায়াং ন চার্বৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥
স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥
নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
নাষডঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥
কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্ নাপ্যরূপবান্ ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৬।১২-১৬

অনুবাদ: 'অগ্নিহোত্রী নয় এবং অযাজ্ঞিক এমন কেউই অযোধ্যায় ছিল না; (এমনকি) নীচমনা, চোর এবং অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কেউই সেখানে ছিল না।'(অযোধ্যাপুরীতে) ব্রাহ্মণেরা ছিলেন স্বকর্মরত, জিতেন্দ্রিয়, দান এবং অধ্যয়নপরায়ণ; তাঁরা দানগ্রহণ ব্যাপারে সংযত ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন অপরিগ্রহী।'অগ্নিহোত্রী নয় এবং অযাজ্ঞিক এমন কেউই অযোধ্যায় ছিল না; (এমনকি) নীচমনা, চোর এবং অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কেউই সেখানে ছিল না। '(অযোধ্যাপুরীতে) ব্রাহ্মণেরা ছিলেন স্বকর্মরত, জিতেন্দ্রিয়, দান এবং অধ্যয়নপরায়ণ; তাঁরা দানগ্রহণ ব্যাপারে সংযত ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন অপরিগ্রহী। 'কেউই (কোনও ব্রাহ্মণই) নাস্তিক বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না; কেউই অশিক্ষিত, পরদোষদর্শী বা (সাধনায়) অসমর্থ ছিলেন না। '(অযোধ্যায়) কেউই বেদের ষড়ঙ্গে জ্ঞানহীন ছিলেন না; সহস্রদান করেন না এমন কেউ ছিলেন না; কেউই ব্রতহীন, দুঃখী, দরিদ্র বা বিক্ষিপ্তমনা ছিলেন না। 'অযোধ্যায় কোনও পুরুষ বা নারী কেউই শ্রীহীনএবং রূপহীন ছিল না; এমনকি রাজার প্রতি ভক্তিহীন কাউকে দেখা যেত না। 'ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সকলেই ছিলেন দেবতা ও অতিথির পূজক, কৃতজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ নগরীতে সকল মানুষ ধর্মাশ্রয়ী ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে পুত্র-পৌত্র এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে (সুখে) থাকত।

▪□অতিথি সৎকারে কখনো ভেদাভেদ করা উচিত নয়

দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া ।

সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১৩।১৪

অনুবাদ: যাতে সকল বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) জনগণই উত্তমরূপে সৎকার এবং সেবা প্রাপ্ত হন, তা দেখতে হবে। কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

▪□বিবাহের সময় কন্যার কুলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া শিষ্টাচার

প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।

বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৭১।২

অনুবাদ: রাজা জনক বললেন, হে মহামতি, শুনুন। কন্যাদানের সময় কুলীন পুরুষের নিজের কুলের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

□ক্ষমার মাহাত্ম্য

যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ ।

ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৩৩।৮

অনুবাদ: [কন্যাদের প্রতি রাজা কুশনাভ] হে পুত্রীগণ! ক্ষমাই দানরূপ পুণ্য কর্ম, ক্ষমাই সত্যের মতো পবিত্র, ক্ষমাই দেবযজ্ঞরূপ কর্ম, ক্ষমাই যশঃপ্রদ, ক্ষমাই পরম ধর্ম; ক্ষমাতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত।

□প্রতিজ্ঞা করলে তা পালন করতে হবে নাহলে ধর্মহানি

প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ ।

ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।২১।৮

অনুবাদ: প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোনও কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পরে সেই কাজ না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ অর্থাৎ ধর্মহানি হয়।

▪□শ্রী লক্ষ্মণ কেমন ছিলেন □

রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ ।

সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ ।

ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১৮।২৯-৩০

অনুবাদ: সৌন্দর্যবর্ধক স্নিগ্ধ স্বভাব লক্ষ্মণ বাল্যকাল থেকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কর্মে এমনকি তাঁর শারীরিক সেবাতেও সর্বদাই রত থাকতেন। শ্রীমান লক্ষ্মণ শ্রীরামের বহিঃস্থিত অপর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ব্যতীত নিদ্রা যেতে পারতেন না, পরিবেশিত অন্ন তাঁকে ছাড়া গ্রহণ করতেন না।

▪□ দান করা কখন সম্ভব□

দাতৃপ্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি।

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৭৩।১২

অনুবাদ: দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে থাকলেই দান ধর্ম পালন করা সম্ভব।

□ শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রীরা কেমন ছিলেন □

এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ ।

বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শাস্ত্রজ্ঞা দৃঢবিক্রমাঃ ।

কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতা যথাবচনকারিণঃ ॥

তেজঃক্ষমায়শঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ ।

ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৭।৬-৮

অনুবাদ: বিদ্যাহেতু বিনয়ী, লজ্জাশীল, কর্মকুশল, জিতেন্দ্রিয়, কীর্তিমান, মহাত্মা, শ্রাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ়-পরাক্রমী, যশস্বী, কর্মে সমাহিতচিত্ত, তেজঃ-ক্ষমা ও যশঃ সম্পন্ন বংশ-পরম্পরায় নিযুক্ত মন্ত্রীগণ ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞানুসারে সর্বদা কর্ম করতেন, তাঁরা মৃদু হাস্যপূর্বক কথা বলতেন এবং ক্রোধ, কাম বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না।

▪□ যজ্ঞের পশু রক্ষা করা রাজার দায়িত্ব

অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৬১।৭

অনুবাদ: হে নরেশ্বর! যে রাজা যজ্ঞ-পশুর রক্ষা করে না সে বিবিধভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

□সজ্জনের হৃদয় স্বচ্ছ ও রমণীয়

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময় ।

রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।২।৫

অনুবাদ: বাল্মীকি মুনি বললেন, "ভরদ্বাজ ! দেখো এই ঘাট কর্দমহীন, সজ্জন ব্যক্তির মনের মতো স্বচ্ছ ও রমণীয় এর জল। "

□ রামায়ণ রচনা কীসের ভিত্তিতে হয়েছিলো □

কামার্থগুণসংয়ুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্ ।

সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥

স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা ।

রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।৩।৮-৯

অনুবাদ: মহাত্মা নারদ রঘুবংশের চরিতকথা যেরূপ করেছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ গুণযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নের আকর এবং সকলে শ্রুতিসুখকর কাব্যোৎকর্ষের তিন বিষয় যথা- গুণ, অলঙ্কার ও রীতি সমন্বিত শ্রুতিবাক্য রামায়ণ রচনা করলেন।

▪□ রামায়ণ পাঠ করলে কী ফল লাভ হয় □

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ ।

স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ ॥

বণিক্ জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ ।

জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১।১০০

অনুবাদ: রামায়ণ পাঠের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করবেন, বণিক তথা বৈশ্য বাণিজ্যে সাফল্য এবং সাধারণ শূদ্রজনও মহত্ত্ব লাভ করবেন।

গুরু ছাড়া কি মুক্তি হবে না ?

🍁গুরু ছাড়া কি মুক্তি হবে না ❓

শাস্ত্র অনুযায়ী গুরু ২ প্রকার । একজন পরমগুরু অর্থাৎ পরমেশ্বর আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মাতা পিতা আচার্যসহ সকল সদুপদেশদাতা। গুরু সম্পর্কে পবিত্র বেদ বলছে -

তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ ।
সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥
[সামবেদ ১১০২]
সরলার্থঃ যারা পবিত্র, বিদ্বান, জ্ঞানের ধারণকর্ত্তা ও পরিপক্ক, পরমাত্মাতে আশ্রিত, সূর্যের ন্যায় দর্শনীয় অর্থাৎ কান্তিমান অধ্যাত্ম সত্যের মার্গ তথা দৃষ্টি প্রদানকারী, গতিমান্ ও কর্মণ্য, ধীর এবং বিবেকবান তারাই বিনয় , বিদ্যা, ধর্ম, আদির প্রেরণা দানকারী বিনয়স্বভাবযুক্ত গুরু হবেন ।

⛔তথাকথিত গুরুরা বর্তমানে জটিল জটিল কৃত্তিম পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলেন। আমরা আগেই দেখলাম গুরু হতে হবে বেদবিৎ। শিক্ষার্থীদেরও গুরু সম্পর্কে ধারণা এমন হবে যেন তারা পরস্পরকে বলে -

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো য়ঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হুবেমহি ॥
সামবেদ ৩৮০
সরলার্থঃ হে সহপাঠীগণ ! তোমরা আনন্দদাতা তথা বিদ্যার ঐশ্বর্যযুক্ত আচার্যের জন্য উৎকৃষ্ট অন্নের সাথে আদরপূর্ণ প্রিয়বচন উচ্চারণ করো, যে আচার্য সরল শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা অন্ধকার অজ্ঞান যার গর্ভে আছে, এমন অবিদ্যা রূপ রাত্রিকে নষ্ট করেন। বিদ্যার আকাঙ্ক্ষাকারী তোমরা আমরা সদ্গুণের বর্ষণকারী, কুপথ দূরকারী বিদ্যা আর বিদ্যাযজ্ঞের ঋত্বিক প্রশস্ত বিদ্বান অধ্যাপক যার কাছে আছেন, তেমন আচার্যকে মিত্রতার জন্য স্বীকার করি।

- গুরু কে হবেন - https://www.agniveerbangla.org/2022/06/blog-post_13.html?m=1

যোগদর্শনে ভগবান্ পতঞ্জলি বলেছেন -

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।
[যোগদর্শন ১।২৬]
শব্দার্থ - (সঃ এষঃ) সেই ঈশ্বর (পূর্বেষাম্) পূর্বে উৎপন্ন গুরুদের (অপি) ও (গুরুঃ) গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা (কালেন-অনবচ্ছেদাৎ) সময় দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত না হওয়ায়।

সূত্রার্থ - সেই ঈশ্বর পূর্বে উৎপন্ন গুরুদেরও গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা, তার কারণ হল কালের দ্বারা তিনি কখনো মৃত্যুকে প্রাপ্ত হননা।

এই সূত্রে ঈশ্বরের স্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে।পূর্ববর্তী গুরুরা সময় দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছেন কিন্তু ঈশ্বরকে নষ্ট করার জন্য কালের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। এই জন্য তিনি সকল গুরুদেরও গুরু। যেমন এই সৃষ্টির আরম্ভে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই রকম অতীত সৃষ্টিতেও দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও দেবেন, এরকম জানা উচিৎ ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 'আর্যোদ্দেশ্যরত্নমালা' গ্রন্থের ৬১ সংখ্যক রত্নে বলেছেন -

বীর্যদান হতে আরম্ভ করে ভোজনাদি দিয়ে পালন করেন বলে পিতাকে "গুরু" বলা হয় । যিনি স্বীয় সত্যোপদেশ দ্বারা হৃদয়ের অজ্ঞানরূপী অন্ধকারকে দূর করে দেন, তিনি ''গুরু'' অর্থাৎ "আচার্য"।

সত্যার্থ প্রকাশের স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশঃ অংশেও বলেছেন -

মাতা এবং পিতা ‘গুরু’; তদ্ব্যতীত যাঁর উপদেশে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করা হয় তাঁকেও ‘গুরু’ বলে ।

- গুরু কে হতে পারে, সৎ গুরু চেনার উপায় কী ? গুরু কে ভগবান বলা যায়? সৎ গুরুর লক্ষণ সমূহ কী কী? লোকমুখে শোনা যায় গুরু ত্যাগ করলে নাকি পাপ হয়? আসলেই কী গুরু ত্যাগ করলে পাপ হয় ?

ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ প্রায়ই আমাদের মনে প্রায়ই উঁকি দেয়। গুরু সম্পর্কে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। শিষ্যদেরও উচিত গুরু চয়নের পূর্বে সেই গুরু আদতে বেদাদি শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী গুরু পদবাচ্য কিনা তা অনুসন্ধান করা। শিষ্য গুরুর লক্ষণ কীভাবে বুঝবে তা নিয়ে বেদে বলা হয়েছে -

ভ্রাজন্ত্যগ্নে সমিধান দীদিবো জিহ্বা চরত্যন্তরাসনি।
স ত্বং নো অগ্নে পয়সা বসুবিদ্রয়িং বর্চো দৃশেঽদাঃ ॥
সামবেদ ৬১৫

সরলার্থঃ আচার্য রূপ অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দেবার জন্য সমিধ হাতে গুরুকুলে আগত শিষ্য আচার্যের উদ্দেশ্যে বলছেন— হে স্বয়ং জ্ঞানদীপ্ত, তথা শিষ্যদের জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্তকারী, বিদ্বান আচার্যদেব! আপনার মুখের ভেতর, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উপদেশ প্রদানের ফলে প্রাপ্ত যশ দ্বারা দীপ্তিমান জিহ্বা, শব্দসমূহের উচ্চারণের জন্য তালু, দন্ত প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করে। সেই মহিমান্বিত, বিবিধ বিদ্যা রূপ ধনের দাতা, হে আচার্য্যদেব! আপনি আমাদের কর্তব্য-দর্শনের জন্য বেদজ্ঞান রূপ দুধের সাথে সদাচারের সম্পদ এবং ব্রহ্মবর্চস তথা ব্রহ্মতেজ আমাদেরকে প্রদান করুন।

আমাদের কেমন গুরুর কাছে যাওয়া উচিৎ?

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে মুণ্ডক উপনিষদও। বলেছে -

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
মুণ্ডকোপনিষদ্ ১.২.১২
সরলার্থঃ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী মনুষ্য কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থাকে (কর্মফল বা ভোগসমূহকে) পরীক্ষা করে বৈরাগ্য অবলম্বন করবেন, কারণ সাংসারিক অনিত্য কর্ম দ্বারা নিত্য পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। এজন্য তাঁকে জানার জন্য সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমিধা (যজ্ঞকাষ্ঠ) হাতে নিয়ে বেদজ্ঞ, ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকট উপস্থিত হবেন।

➡️একইভাবে গুরুরও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে -

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
য়েনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥
মুণ্ডকোপনিষদ্ ১.২.১৩
সরলার্থঃ যথাবিধি শরণাগত, শান্তচিত্ত এবং শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন (সংযতেন্দ্রিয়) সেই শিষ্যকে উক্ত বেদবিদ্ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সেই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থরূপে উপদেশ প্রদান করবেন, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী নিত্য পূর্ণ পরমাত্মাকে জানা যায়।

কঠ উপনিষদ (১.২.৭) বলছে— নিপুণ আচার্যের কাছে কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করেছে, এই রকম ব্যাক্তিও সচরাচর পাওয়া যায়না। কথাটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে সম্পূর্ণ সত্যতা নিজেই উপলোব্ধি করতে পারবেন।

মহাভারতের গীতায় (২.৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা সহ নানা প্রকার জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু সেটি অর্জুন শিষ্যত্ব গ্রহণের পর। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত ছিলেন। সমর্পণ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ।

এজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬/২৩) বলছে, পরমেশ্বরের প্রতি যার ভক্তি আছে, তার পক্ষেই গুরুর দানকৃত বিদ্যা প্রকাশিত হয় ।

■ গুরুকে ভগবান বলা যায় ?

এই প্রশ্নেরও স্পষ্ট উত্তর রয়েছে উপনিষদে। ভগবান ঈশ্বরকে যেমন বলা যায় তেমনি গৌণরূপে গুরুদেবকেও বলা যায়। মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের তিন নাম্বার শ্লোকে দেখা যায় গৃহস্থ শৌনক ঋষি অঙ্গিরার কছে জ্ঞান অর্জন করতে এসে "ভগবান" শব্দে সম্বোধন করছেন। বিস্তারিত পড়ুন -
http://back2thevedas.blogspot.com/2022/10/blog-post_27.html

সুতরাং ঈশ্বর হলেন পরমগুরু। সুতরাং আসলেই মূখ্যভাবে পরমাত্মারূপী গুরু ছাড়া গতি নেই, কেননা তিনিই মূল লক্ষ্য । আর সামবেদে বলা হয়েছে কোন গুরুর কাছে শিষ্য যাবে না। সেখানে বলা হয়েছে -

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয়।
অস্য রাতৌ সুতং পিব ॥

সামবেদ ২২৩

সরলার্থঃ হে বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র বুদ্ধিমান বিদ্যার্থী ! ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি যুক্ত বিদ্যাদানকারী গুরুকে তুমি ত্যাগ করো, তার কাছে বিদ্যা পাঠের জন্য যেও না। প্রেমের সাথে বিদ্যাদানকারীর কাছে পৌঁছে বিদ্যালাভের জন্য প্রার্থনা করো। এই গুরু বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হওয়ার পর জ্ঞানরসকে গ্রহণ করো।

🔷গুরু-শিষ্য বরং পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে অধ্যাপন-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হবেন। বেদে বলা হচ্ছে -

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূং রনু।
তবেদং সখ্যমস্তৃতম্ ॥
সামবেদ ২২৯

সরলার্থঃ হে বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র বুদ্ধিমান বিদ্যার্থী ! তুমি অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজ্ঞের সাধক ব্রহ্মবেত্তা, বেদবেত্তা এবং ব্রাহ্মণ স্বভাবের আচার্যের থেকে প্রত্যেক ঋতুতে জ্ঞান রস পান করো। তোমার এই গুরুশিষ্য সম্বন্ধরূপ মিত্রতা অবিনশ্বর থাকুক।

⚠️আপনি শাস্ত্র বা ধর্মীয় গ্রন্থ যা-ই পড়ুন না কেন কারো না কারো ব্যাখ্যা পড়ছেন, শুধুমাত্র মূল অনুবাদ পড়ে তাৎপর্য বোঝা সম্পূর্ণরূপে কখনোই সম্ভব না। অর্থাৎ আপনি পরোক্ষভাবে হলেও একজন গুরু বা আচার্যের উপর নির্ভর করছেন নিজের অজান্তেই। কেননা তিনি যদি যে শাস্ত্র আপনি পড়ছেন তার অনুবাদ / ব্যাখ্যা / আলোচনা না করতেন তার সম্যক রূপে উপলব্ধি সম্ভব ছিলো কি? মোটেও না।

🔶বেদেও গুরুকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে শিষ্যকে সে কী বলবে -

ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥
সামবেদ ৩৪৪

সরলার্থঃ শিষ্যের প্রতি আচার্যের উক্তি - হে জিজ্ঞাসু এবং বিদ্যুতের মতো তীব্রবুদ্ধিসম্পন্ন আমার শিষ্য ! তুমি আমার প্রদানকৃত এই শ্রেষ্ঠ, চিরস্থায়ী, তৃপ্তিপ্রদ, অধ্যয়ন-অধ্যাপন-বিধি দ্বারা নিষ্পাদিত জ্ঞানরস পান করো। পবিত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপন-রূপ যজ্ঞের গৃহে, অর্থাৎ গুরুকুলে আমার বাণী সেই জ্ঞানরসকে তোমার প্রতি ক্ষরণ করে।

সুতরাং আপনি যে রাস্তাতেই যান না কেন আপনার গুরু বা আচার্যের শরণাপন্ন হতেই হচ্ছে। হোক তা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ রূপে। গুরুবাদ এবং আচার্যদের গুরুত্ব দুটোকে এক করা যাবে না।

🖋বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যেকোনো অভ্যাস কীভাবে গড়ে তুলবেন ? কোন মন্ত্র পড়লে সহজে হবে?

প্রতি বছরের শুরুতে আমরা কিছু "নিউ ইয়ার রেজুলেশন" নিই। এবার থেকে সন্ধ্যোপাসনা করবো, রোজ ৫০ টা করে পুশ-আপ দেব/ ব্যায়াম করবো, মেডিটেশন করবো, বই পড়বো etc ....
জোশের চোটে হয়তো দুয়েকদিন এগুলো করা হয়েও যায়। কিন্তু তারপর আবার যে লাউ, সেই কদু। এগুলো অভ্যাসে আসে না।
নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন। কিন্তু ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই আমাদের জীবন গড়ে তোলে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা অর্জুন, এই অভ্যাসের বলেই শ্রেষ্ঠ। পুরো মহাভারতের বহু স্থানে অর্জুনের এই অভ্যাস ও অধ্যাবসায়ের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী এসেছে।
ভালো অভ্যাসই আপনাকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করবে। এজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অন্য নাম অভ্যাসযোগও।

তাই ভালো ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ। অন্ততপক্ষে তিনটি অভ্যাস প্রত্যেকের গড়ে তোলা উচিৎ।
১. শরীরচর্চা ২. ধ্যান-উপাসনা ৩. বই পড়া

আত্ম-উন্নয়ন করতে হলে এগুলো অপরিহার্য। তাছাড়া একজন সনাতনী হিসেবে, ধার্মিক হিসেবে শরীর ও মনে ফিট থাকা আপনার কর্তব্য।

মা তিষ্ঠঃ পরাঙ্মনাঃ
(অথর্ববেদ ৮/১/৯)
- উন্মনা / বিষন্ন হয়ে বসে থেকো না।

যেকোনে অভ্যাস গড়ার তিনটি নিয়ম —

১. অভ্যাসটিকে ছোট ছোট মজাদার ও সহজ ধাপে ভেঙে নেওয়া;
২. কঠোর সংকল্প ও অধ্যাবসায় নিয়ে অভ্যাস করে যাওয়া ;
৩. দুই নম্বর নিয়মকে অনুসরণ করা।
উদাহরণ স্বরূপ এভাবে করতে পারেন।

♦শরীরচর্চা

ধরুন, রোজ অন্তত ৩০ টা পুশ-আপ দিতে চান। অভ্যাস না থাকলে, একদিনে দুটোও দেওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারেন —
• ১ তারিখে ১ টা পুশ-আপ

• ২ তারিখে ২ টা, ৩ তারিখে ৩ টা ... ...

এভাবে প্রতি তারিখের সাথে একটা একটা করে বাড়িয়ে নির্ধারিত সংখ্যায় পৌছে চালিয়ে যাবেন। ৩০ দিন পরে যখন ৩০ টা পুশ-আপ দিতে পারবেন, নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

এই পদ্ধতি যেকোনো ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যোগাসন শুরু করার বিষয়ে আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখে।

.

♦ধ্যান-উপাসনা

ধ্যান বলুন বা মেডিটেশন, তা আমাদের চিন্তা ভাবনায় ক্ল্যারিটি আনে, মন শান্ত করে, দৃঢ় অথচ কৃতজ্ঞ হতে শেখায়।

কিন্তু অভ্যাস না থাকলে চোখ বন্ধ করে দুই মিনিট বসে থাকলেই মাথা চক্কর দেবে। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারেন —

• পুরো সন্ধ্যোপাসনা বিধিটি অডিও ডাউনলোড করে নেবেন। শাস্ত্রপৃষ্ঠা

• সন্ধ্যাবেলা হলে ইয়ারফোনে অডিওটি চালিয়ে চুপ-চাপ শুনবেন শুধু। শুয়ে বসে যেভাবেই হোক।

• ১০-১২ দিন শোনার পর চোখ বুজে মনে মনে মন্ত্রগুলো বলাও শুরু করবেন।

• তারও ১০-১২ দিন পর একটা নিরালা জায়গা বেছে সেখানে সোজা হয়ে বসে শুনবেন।

শুনতে শুনতে কবে যে মন্ত্রসহ পুরো বিধি মুখস্থ হয়ে যাবে, টেরও পাবেন না।

মেডিটেশনের জন্য ইউটিউবে অনেক ভালো ভালো টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়, সেগুলো অনুসরণ করে দেখতে পারেন।

♦বই পড়া

শাস্ত্রবিষয়ে জানতে চান বা অন্য কোনো বিষয়ে, পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

এই অভ্যাস গড়তে প্রতিদিন অন্তত ৫-১০ পাতা করে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। যে কোনো কিছু পড়তে পারেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ধর্মীয়... যা ভালো লাগে। কিন্তু পড়তেই হবে। পড়তে পড়তে একসময় পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে।

এভাবে ছোট ছোট মজাদার ধাপে ভেঙে নিয়ে যেকোনো ভালো অভ্যাস গড়ে তুলুন। সেই খরগোশের মত ১০০ কি.মি. দৌড় দিয়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়লে অভ্যাস আর গড়া হবে না। রয়ে সয়ে কচ্ছপের গতিতে হলেও ধীরে সুস্থে লক্ষ্য ধরে এগিয়ে গেলে তবেই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল।
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।।

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নেমে পড়তে হবে শুধু। মনকে বশ করা কঠিন কিন্তু মনকে একবার মানিয়ে নিতে পারলে সব করা সম্ভব। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভ্যাসযোগ (ধ্যানযোগও বলা হয়) থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

শ্রীভগবান্ উবাচ –
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৬/৩৫
... বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৬/৩৬

❝ হে অর্জুন! নিঃসন্দেহে মন চঞ্চল, দুর্নিগ্রহ। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করা যায়। ... যথাবিহিত উপায়ে চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তির পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব। ❞ — এটিই হল আসল কথা।

পথ চলতে গিয়ে পা পিছলে যাবে বারবার, আলস্য পেয়ে বসবে, ইচ্ছা হবে না। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মনে মনে এই মন্ত্রটি বলবেন,

"অহমিন্দ্র ন পরা জিগ্যে।"
(ঋগ্বেদ ১০।৪৮।৫)
- "আমি ঐশ্বর্যবান, কখনোই হেরে যেতে পারি না"

মনে রাখবেন আপনি শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের, মহান মহর্ষিদের উত্তরাধিকারী, যেকোনো পরিস্থিতে থেমে যাওয়া আপনার বৈশিষ্ঠ্য নয়। তবেই হবে, আর হবেই, নিশ্চিত থাকুন।
তাহলে আর কী? আগামীকাল থেকেই শুরু হয়ে যান। কারণ,

রন্তী চিদত্র বিবিদে হিরণ্যং
(ঋগ্বেদ ২/১৫/৯)
- কার্যারম্ভ করা ব্যক্তিই ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত করে।

• ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
- "এই জগতে জ্ঞানের সমান পবিত্রকারী নিঃসন্দেহে কিছুই নেই।"
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৩৮]

স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ
- স্বাধ্যায়ে/ অধ্যয়নে প্রমাদ করবে না।
[তৈত্তিরীয় উপনিষদ/ শিক্ষাবল্লী/১১/১]

বৈদিক বিজ্ঞান - সূর্যের আলোতে বস্তুর প্রকাশ ও দর্শন

সূর্য বা কোনো আলোক উৎস থেকে আলো যখন কোনো বস্তুর ওপর পড়ে তখন সেই বস্তু কিছু আলো শোষণ করে বাকিটা ফিরিয়ে দেয়। একে আলোর প্রতিফলন বলে। প্রতিফলিত এই আলোকরশ্মি যখন আমাদের চোখের রেটিনায় এসে পড়ে তখনই আমরা সেই বস্তুটাকে দেখতে পাই।
চোখের উপাদানগুলোর মধ্যে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস মিলে একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ওই বস্তু থেকে আলোক রশ্মি ওই লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। রেটিনার ওপর আলো পড়লে স্নায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড ও কোণ কোষগুলো সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ প্রেরণায় পরিণত করে। ওই স্নায়ু তড়িৎ প্রেরণাকে তাৎক্ষণিকভাবে অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে পুনরায় উল্টো করে দেয়। ফলে আমরা বস্তুটি যে রকম থাকে সে রকমই দেখি। পবিত্র বেদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে -

দূরাদিহেব য়ৎসতোঽরুণস্সুরশিশ্বিতৎ।
বি ভানুং বিশ্বথাতনৎ ॥
সামবেদ ২১৯

সরলার্থঃ দীপ্তিমান সূর্যরূপী যখন মহাকাশে স্থিত দূরবর্তী স্থান থেকে মঙ্গল, বুধ, চন্দ্রমা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ জ্যোতি দ্বারা নিকটে উপস্থিত প্রতীয়মান করে দীপ্তিমান দেখায়; তখন নিজের প্রকাশক কিরণকে অনেক প্রকারে বিস্তীর্ণ করে ।

উজ্জ্বল সূর্যের নিজের আলোরূপ প্রকাশ যখন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহে পতিত হয়; তখন সেই আলোয় সেগুলো প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সেই প্রকাশ আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়ে সেই দূরবর্তী পদার্থকেও নিকটবর্তী পদার্থের ন্যায় দৃশ্যমান করে।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য়ম্॥
সামবেদ ৩১

সরলার্থঃ উৎপন্ন পদার্থকে প্রকাশকারী, প্রকাশমান, প্রকাশক, দিন-রাত প্রভৃতির প্রদাতা তথা দ্যুলোকে অবস্থিত সেই প্রসিদ্ধ সূর্য-রূপ অগ্নির কিরণ সকল প্রাণীর দর্শনের জন্য পৃথিবী প্রভৃতি লোকে পৌঁছায় অর্থাৎ সূর্য দ্যুলোকে অবস্থিত হয়েও কিরণ দ্বারা সব লোকে পৌঁছে যায় ।

ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।
প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥
সামবেদ ৬৩২

সরলার্থঃ এই সূর্য মাসের ত্রিশ দিবা-রাত্রিতে বিশেষরূপে ভাস্বর হয়। সেই অক্ষ পরিভ্রমণকারী সূর্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর গুণ-কর্ম-স্বরূপ বর্ণনা করার জন্য বাণী প্রযুক্ত করা হয়। এই সূর্য প্রতিদিনই স্বীয় কিরণ বা তেজ দ্বারা সবাইকে প্রকাশিত করে ।

অপ ত্যে তায়বো য়থা নক্ষত্রা য়ন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥
সামবেদ ৬৩৩

সরলার্থঃযেভাবে সর্বপ্রকাশক সূর্যের জন্য, অর্থাৎ যেন ভয়ে ভীত হয়ে সূর্যকে স্থান দেয়ার জন্য রাত্রির সাথে তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে যায়, সেভাবে অন্যের ঘরে সিধ খননকারী চোর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই কোথাও আত্মগোপন করে ।

অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাং অনু।

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো য়থা ॥
সামবেদ ৬৩৪
সরলার্থঃ এই সূর্যের প্রজ্ঞাপক কিরণ প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন পদার্থ সমূহ অথবা সূর্যের ন্যায় হৃদয়াকাশে ভাস্বর পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক দিব্য জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে তাঁর উপাসক মানবজাতি—চমকিত অগ্নির ন্যায় দৃশ্যমান হয়ে শোভা পায়।

সূর্যের কিরণ যখন স্বচ্ছ সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাঁচ ইত্যাদিতে পড়ে, তখন সেগুলোতে উজ্জ্বল সেই সূর্যকিরণ জ্বলন্ত অগ্নির মতো বলে মনে হয়। সেই প্রকারে মনোভূমিতে পড়ন্ত পরমেশ্বরের দিব্য জ্যোতিকেও যোগীগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জেনে অনুভব করেন ।

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥
সামবেদ ৬৩৫
সরলার্থঃ সূর্য বহু রোগ হতে রক্ষা করে। নিজ জ্যোতি দ্বারা সকল পদার্থকে দর্শনযোগ্য করে। পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহে জ্যোতি প্রদান করে এবং সকল প্রদীপ্ত—মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ কে আলোকিত করে ।

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥
সামবেদ ৬৩৬
সরলার্থঃ সূর্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশরূপী দেব তথা দাতাদের, প্রজাদের অর্থাৎ মাটি, পাথর, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, বনস্পতি ইত্যাদির অভিমুখী হয়ে এবং মানবজাতির অভিমুখী হয়ে উদিত হয় এবং সমস্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও চন্দ্রাদি উপগ্রহের অভিমুখী হয়ে আমাদেরকে সবকিছু দেখার জন্য জ্যোতি প্রদান করে ।

©**বাংলাদেশ অগ্নিবীর**

অবতার বুদ্ধ আর গৌতম বুদ্ধ এক নয় ! পড়ুন প্রমাণসহ

পুরাণের অবতার বুদ্ধ বনাম ত্রিপিটকের নাস্তিক গৌতমবুদ্ধ।

অনেক বৌদ্ধরাই দাবি করে থাকে যে তাদের নাস্তিক বৌদ্ধমতের প্রভাবককে হ্রাস করার জন্য ব্রাহ্মণরা নাকি গৌতমবুদ্ধকে পুরাণবর্ণিত হিন্দু অবতারসমূহের তালিকায় প্রবেশ করিয়েছিল। পুরাণের অবতার বুদ্ধ যে নাস্তিক গৌতমবুদ্ধ নয় সেই বিষয়টিই আজকে বিস্তারিত প্রমাণসহকারে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। তবে বৌদ্ধদের এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে শুধু গৌতমবুদ্ধই কেন জৈন, শিখ, চার্বাক প্রভৃতি দর্শনের প্রবর্তকদের নামও পুরাণে একইভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কেননা হিন্দুদের মহান পরমতসহিষ্ণুতার কারণেই কালের বিবর্তনে কেবল বৌদ্ধমতই নয় জৈন, অজীবিক, চার্বাক, অজ্ঞান,

শিখ প্রভৃতি সনাতনধর্ম বহির্ভূত দর্শন ভারতে উদ্ভব হয়েছিল ও সারা ভারতজুড়েই বেশ প্রভাবশালী অবস্থানও গড়ে তুলতে পেরেছিল। এতগুলো প্রভাবশালী অহিন্দু দর্শনের প্রবর্তকদের বাদ দিয়ে কেবল নাস্তিক গৌতমবুদ্ধের নামই ব্রাহ্মণরা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত করেছে এমন দাবি নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

উপরন্তু সনাতনধর্মে পুরাণের প্রামাণিকতা কতটুকু তা প্রথমে স্পষ্ট করা দরকার। প্রথমত কিছু একটা সংস্কৃততে লিখে দিলেই তা হিন্দুশাস্ত্র হয়ে যায় না। ধর্মের মূল হলো বেদ। যখন কোনো গ্রন্থ বেদসিদ্ধ হয় তখনই তা হিন্দুশাস্ত্র রূপে মান্যতা পায়। বর্তমান প্রচলিত পুরাণসমহের অধিকাংশ কথাই বেদবিরুদ্ধ ও স্ববিরোধী। যা থেকে স্পষ্ট হয় যে পুরাণ কোনো ঋষিকৃত শাস্ত্র নয় বরং একাধিক ব্যক্তি-সম্প্রদায় দ্বারা নিজ নিজ মান্যতা মন্ডনের নিমিত্তই লেখা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পুরাণকে মেনে থাকে তাদের অধিকাংশও এর কাহিনীগুলোকে রূপক হিসেবেই মানে। অতএব পুরাণকে আমরা Indian Mythology হিসেবেই পড়তে পারি ও এগুলো হতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করতে পারি। অতএব পুরাণ যে সনাতনধর্মে অত্যন্ত প্রামাণিক কোনো শাস্ত্র এমনটা কখনোই না। তথাপি এই পুরাণসমূহকেই ব্যবহার করে যেই নাস্তিক বৌদ্ধগুলো সনাতনধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করে তাদের প্রতিহত করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

এইবার পুরাণসমূহ থেকে সেই অবতার বুদ্ধের বর্ণনা আমরা পড়ে নিই

★তৎপরে কলিযুগ সমাগত হলে দেব বিদ্বেষীদের সম্মোহনের নিমিত্ত বুদ্ধ নামে অঞ্জনা-গর্ভজাত হয়ে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হবেন।

[ভাগবৎপুরাণ ১|২|২৪]

★তৎপরে কলিযুগের সন্ধ্যান্তে দেব বিদ্বেষীদের সম্মোহনের নিমিত্ত বুদ্ধ নামে জিন পুত্র হয়ে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হবেন।

[গরুড়পুরাণ পূর্বখন্ড|১|৩২]

ভাগবৎপুরাণের শ্লোকে অঞ্জনা নামটি স্ত্রীবাচক ও গরুড়পুরাণের শ্লোকে জিন নামটি পুরুষবাচক হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে এখানে জিন হচ্ছে অবতারবুদ্ধের পিতা, অঞ্জনা তাঁর মাতা। এবং অবতার বুদ্ধ ভারতের বিহার রাজ্যের গয়াপ্রদেশে (কীকটদেশ) জন্ম নিবেন এমনটাই বলা হচ্ছে।

অপরদিকে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে নাস্তিক গৌতমবুদ্ধের পিতা ছিলেন শুদ্ধোদন ও মাতা ছিলেন মায়াদেবী এবং তিনি নেপালের লুম্বিনীতে(কপিলাবস্তু) জন্মেছিলেন।

এইখানে খুবই স্পষ্ট যে অবতারবুদ্ধের সাথে নাস্তিক গৌতমবুদ্ধের বর্ণনা মিলছে না। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসহ বিভিন্ন হিন্দু মত-পরম্পরা নাস্তিক গৌতমবুদ্ধকে অবতারবুদ্ধরূপে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তবে এইটাও সত্য যে কিছু অপ্রধান পুরাণের বর্ণনা গৌতমবুদ্ধের সাথে মিলেও যায় (অগ্নি ১৬.৪৯.৮, বৃহন্নারদীয় শারদা তিলকতন্ত্র ১৭.১৫৮)। এর কারণ হতে পারে পুরাণের অবতার বুদ্ধ স্বতন্ত্র থাকলেও পরবর্তীকালের গৌতমবুদ্ধের সাথে নাম সম্পূর্ণ মিল থাকায় পুরাণকারদের মধ্যে এইবিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং অবতারবুদ্ধ ও নাস্তিক বুদ্ধ দুটোই একই ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হওয়া শুরু হয়। পুরাণসমূহ যে কোনো ঋষিকৃত গ্রন্থ নয় ও তা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হয়েছে তা প্রথমেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

□এইবার বৌদ্ধমতের সাথে পেরে না উঠে হিন্দুরা গৌতমবুদ্ধকে নিজেদের অবতার বানিয়ে ফেলেছে তাদের এই হাস্যকর দাবিটিতে আলোকপাত করা যাক।

- প্রথমত একেই বুঝি বলে চোরের মায়ের বড় গলা! আমরা শুরুতেই দেখিয়েছি পুরাণের অবতার বুদ্ধ নাস্তিক বুদ্ধ নন। তথাপি যদি কিছুক্ষণের জন্য তা ধরেও নিই তাহলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন - বৌদ্ধমতের পূনর্জন্মবাদ, নির্বাণ বা মুক্তি, কর্মবাদ, কল্পবাদ, অহিংসা, অনাসক্তি, সন্ন্যাস প্রভৃতি দর্শন কি গৌতমবুদ্ধের নিজস্ব আবিষ্কার ছিল? এগুলো কি পূর্ব হতেই হিন্দু শাস্ত্রসমূহে বিদ্যমান ছিল না? এগুলোত তিনি সনাতনধর্ম থেকেই গ্রহণ করে কিছুক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যাখ্যা যুক্ত করে প্রচার করেছেন? এরজন্যত কোনো হিন্দুর মনেই গৌতমবুদ্ধের প্রতি কোনো অবমাননা বোধ হয়নি।

অন্যদিকে হিন্দুরা নাহয় গৌতমবুদ্ধকে অবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং নিজেই যে সনাতনধর্মের দুই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম উভয়কেই তার জাতককথায় যুক্ত করেছে এর পেছনে তার উদ্দেশ্য কী ছিল? চলুন তাহলে সেগুলোর বর্ণনা দেখে নিই।

প্রথমে জাতক কী সেই বিষয়ে যারা জানেন না তাদের অবগতির জন্য বলে রাখি ত্রিপিটক অনুসারে গৌতমবুদ্ধ তার উক্ত জন্মে বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে তাকে আরো বহুজন্ম অতিবাহিত করে আসতে হয়েছে। বুদ্ধের ওই সমস্ত পূর্ব জন্মগুলোকেই জাতক বলা হয়।

ত্রিপিটকের জাতককথায় দশরথ জাতকে(৪৬১) বুদ্ধ নিজেকে পূর্বজন্মে রাম বলে উল্লেখ করছেন। ত এখানে হিন্দু অবতারবাদের স্বীকৃতিত বুদ্ধ নিজেই দিয়ে দিলেন তাই নয় কি? উপরন্তু দশরথ জাতকের কাহিনী পড়লে দেখতে পাবেন সম্পূর্ণ বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীকেই কপি মেরে বুদ্ধ কিছুটা এদিক-ওদিক করে চালিয়ে দিয়েছে।

এছাড়া ঘট জাতকে(৪৫৪) বুদ্ধ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন। এখানেও মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনি কপি মেরে কিছুটা এদিক-ওদিক করে চালিয়ে দিয়েছে বুদ্ধ। শ্যাম জাতক (৫৪০) রামায়ণের দশরথ কর্তৃক ভুলবশত অন্ধ পিতা-মাতার সন্তান বালক শ্রবণকে হত্যার সেই বিখ্যাত কাহিনীই কপি-পেস্ট। এইভাবে জাতককথায় অগণিত জাতকে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, নাম, স্থান কপি করা হয়েছে। যেমন কুণাল জাতকে(৫৩৬) বুদ্ধ (তখন কুনাল নামে জন্মেছিলেন) নারীর দুঃশ্চরিত্রতার উদাহারণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণা (যেইটা মহাভারতে দ্রৌপদীর অপর নাম) নামক এক নারীর উল্লেখ করছে যার অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এই পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও নাকি অপর এক কুব্জ বামন পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। দ্রৌপদীকে হিন্দুরা অত্যন্ত সতী নারী হিসেবে বিশ্বাস করে কিন্তু নাস্তিক বুদ্ধ তাঁর নামেই এমন জঘন্য মিথ্যা কাহিনী বানালো!

এখানে আবার কিছু দুঃসাহসী বৌদ্ধ দাবি করতে পারে যে জাতককথা থেকে চুরি করেই হিন্দুরা রামায়ণ ও মহাভারত লিখেছে। প্রথমত রামায়ণ-মহাভারতে কোথাও গৌতমবুদ্ধ কিংবা বৌদ্ধমতের সাথে সম্পর্কিত কোনোকিছুরই কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ত্রিপিটকের অগণিত স্থানে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, ব্যাকরণের সাথে ইতিহাস, পঞ্চমবেদের জ্ঞাতা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, সোণদন্ড ব্রাহ্মণ [দীর্ঘ নিকায়, সোণদন্ড সূত্র]। হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ইতিহাস বলতে রামায়ণ - মহাভারতকেই নির্দেশ করা হয় ও পঞ্চমবেদ বলতে নির্দিষ্টভাবে মহাভারতকেই বলা হয়। তার মানে প্রমাণিত হয় যে রামায়ণ - মহাভারত বুদ্ধের অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছে।

তবে কেউ কেউ প্রচলিত রামায়ণের একটি শ্লোক দেখাতে পারে যেখানে নাকি তাদের মতে গৌতমবুদ্ধের উল্লেখ আছে,

*यथा हि चोर: स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तकिमत्र वद्धि। तस्माद्धि य: शङ्क्यतमः प्रजानाम् न नास्तकिनाभमुखो बुध: स्यात्।। [বাল্মীকি রামায়ণ ২|১০৯|৩৪]

অর্থ - যেরূপ চোর সেরূপই বুদ্ধ তথাগতকে নাস্তিক বলে জানবে। যে প্রজাদের দ্বারা বিশ্বাসের অযোগ্য। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই নাস্তিকের অভিমুখী হবেন না।

১) প্রথমত রামায়ণ - মহাভারতে সময়ে সময়ে অসংখ্য শ্লোক বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এইটি সকল গবেষকগণই স্বীকার করেন। তবে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলো একসাথে মিলিয়ে দেখলে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলো কিছুটা নির্ণয় করার সুযোগ থাকে। যেমন ধরুন রামায়ণের একটা পুরনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল কেরালা থেকে, আরেকটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল বাংলা থেকে। এখন বাংলার কিছু অসৎ ব্যক্তি রামায়ণের অযোধ্যা কান্ডে কিছু শ্লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফলে বাংলায় প্রক্ষিপ্ত হওয়া শ্লোকগুলো বাংলা থেকে পাওয়া ওই পাণ্ডুলিপিতেই থাকবে, কেরালার পুরনো পাণ্ডুলিপিতে তা থাকার কোনো সুযোগ নেই। এখন আমরা যদি কেরালা ও বাংলার দুই পুরনো পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখি তাহলে সহজেই বাংলায় প্রক্ষিপ্ত হওয়া শ্লোকগুলো বের করে ফেলতে পারব। ঠিক এই কাজটাই করেছে ভারতের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান Oriental Institute of Baroda । তারা রামায়ণের সবগুলো পুরনো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করে যেই শ্লোকগুলো সবগুলো পাণ্ডুলিপিতেই বিদ্যমান কেবল সেগুলোকেই রেখে বাকিগুলো বাদ দিয়ে রামায়ণের তুলনামূলক বিশুদ্ধ সংস্করণ বা Critical Edition প্রকাশিত করেছে। রামায়ণের সেই Critical Edition এ এই শ্লোকটি কিন্তু বিদ্যমান নেই। ১০৯ নং সর্গে থাকা প্রচলিত ৩০,৩২-৩৫,৩৭-৩৯ নং শ্লোক Critical Edition এ নেই মূলত গীতাপ্রেস হতে প্রকাশিত রামায়ণ থেকেই অপপ্রচারকারীরা এই শ্লোকটি দেখিয়ে থাকে। গীতাপ্রেসের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি হয়ত আছে কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য প্রায় সকল পাণ্ডুলিপিতে তথা পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলোতে এই শ্লোক অনুপস্থিত। তাই এই বৌদ্ধদের যদি মেরুদণ্ড নামক কিছু না থাকে তাহলেই পরবর্তীতে এই অত্যন্ত দুর্বল একটা প্রমাণ দিয়ে রামায়ণে বুদ্ধ দেখাতে আসবে।

২) তাদের ত্রিপিটকে রামায়ণ - মহাভারতের অগণিত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এইসব বেকারদের নির্লজ্জের মতো রামায়ণের ওই একটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দেখিয়ে সারাদিন অপপ্রচার করার অফুরন্ত সময় থাকে কিন্তু পাঁচ মিনিট খরচ করে ৩০৮ ও ৩০৯

নং সর্গের সম্পূর্ণ সংলাপটি পড়ার সময় বা সৎসাহস কোনোটিই তাদের নেই। শ্রীরাম মূলত আলোচ্য উক্তিটি করছেন জাবালিকে উদ্দেশ্য করে। এখন জাবালি কে ছিলেন? মূলত ভরত যখন রামকে convince করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি কিন্তু একা ছিলেন না, তাঁর সাথে সাধারণ প্রজা থেকে শুরু করে অনেকেই গিয়েছিল রামকে ফিরিয়ে আনার আশায়। অতঃপর ভরত যখন রামের কাছে যুক্তিতে পরাস্ত হলেন তখন সেই তাদের মধ্যেই জাবালি নামক এক ব্রাহ্মণোত্তম রামকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন(সর্গ ৩০৮) ও রাম তাঁকেও একইভাবে যুক্তিতে পরাস্ত করেছিলেন(সর্গ ৩০৯)।

৩০৯ নং সর্গটি সম্পূর্ণ পড়লে দেখতে পায় যে একদম ১-৩২ নং শ্লোকের যেই শৈলী আর তার পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলোর যেই শৈলী তার মধ্যে আকাশ - পাতাল তফাৎ। প্রথম শ্লোক থেকে যদি পড়েন তাহলে দেখবেন শ্রীরাম কতটা বিনয়ের সাথে মিষ্টভাষী হয়ে জাবালিকে উত্তর দিচ্ছেন। প্রথম শ্লোকেই কিন্তু বলা হচ্ছে, "রাম অবিচলিত থেকে সমীচীন ভাষায় বললেন।" সেই রামের ভাষা কিনা একদম শেষের দিকে গিয়ে পুরো ১৮০ ডিগ্রী উল্টে গেল? এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলোর একদম আগের শ্লোকটিতেই রাম জীবের প্রতি অনুকম্পা ও প্রিয়বচনকে স্বর্গে যাওয়ার পথ বলছেন(৩১) সেই রাম ঠিক পরের শ্লোকেই এতটা কঠোর বচন বলবেন? উপরন্তু ৩৩ নং প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে রাম সরাসরি তাঁর নিজ পিতা দশরথের কাজকেই নিন্দা করছেন জাবালিকে যজ্ঞকর্মে রাখার জন্য। কী হাস্যকর! যেই রাম তাঁর পিতৃভক্তির জন্য জগদ্বিখ্যাত। কেবল পিতার অন্যকে দেওয়া কথা যেন মিথ্যা না হয়ে যায় সেজন্য একবারও না ভেবে চক্রবর্তী সম্রাটের পদ ছেড়ে দিয়ে চৌদ্দবছরের জন্য বনবাসে যেতে রাজি হয়ে গেলেন সেই রাম কিনা সকলের সামনে পিতৃনিন্দা করেছেন!

৩০৮ নং সর্গের প্রথম শ্লোকেই জাবালিকে ব্রাহ্মণোত্তম বলা হচ্ছে ও তিনি সত্যিই যে ব্রাহ্মণোত্তম তা তাঁর শুরু থেকে বলা উক্তিগুলো(শ্লোক ৩-১২) পড়লেই অনুধাবন করা যায়। এইগুলোত আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেরই common কথাবার্তা, খুবই আস্তিকতাপূর্ণ ও জগৎসংসারের নশ্বরতাকেই প্রতিপাদন করছে। এইগুলো কোনো বস্তুবাদী নাস্তিকের বিশ্বাস হয় কীভাবে? উপরন্তু তাঁর ৫,৬,৯ নং শ্লোক পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি পরলোকে অবিশ্বাসী নন কিন্তু ১৭ নং শ্লোকে তিনি পরলোক অস্বীকার করলেন। আর ১৪,১৫,১৬ নং প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শ্রাদ্ধের কথাগুলোও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক।

তাছাড়া ৩০৯ নং সর্গে ১-৩২ এ যদি দেখেন শ্রীরাম কিন্তু জাবালির কোনো মতকেই খন্ডন করেননি, ২৩ নং শ্লোকে জাবালির বাক্যগুলোকে যুক্তিপূর্ণও বলছেন। শ্রীরাম উত্তরে simply এইটাই বলেছেন যে ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি ধর্মের শুধু একটা দিক নিয়েই বললেন। কিন্তু সত্যওত বড় ধর্ম। শ্রীরাম যেখানে একবার পিতাকে কথা দিয়ে এসেছেন সেই কথার বিরুদ্ধে যদি তিনি মিথ্যাচরণ করেন তাহলে এর থেকে বড় অধর্ম আর কী হতে পারে? রাম যদি নিজেই এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা করেন তাহলে প্রজারাওত তা করতে উৎসাহিত হবে। মূলত প্রক্ষিপ্তকারীরা ভেবেছিল যে বাইরে থেকে কিছু শ্লোক ঢুকিয়ে যদি এখানে জাবালিকে নাস্তিক চার্বাক সাজানো যায় তাহলে বেশ মশলাদার একটা কাহিনী হবে যেমনটা বর্তমানের টিভি সিরিয়ালগুলোতে করা হয়। পরবর্তীতে আরো বিভিন্নভাবে এই সংলাপে আরো কিছু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়ে আজকের এই রূপে এসেছে।

আর জাবালি যদি নাস্তিক-বৌদ্ধই হউন তাহলে ৩০৭ নং সর্গের প্রথম শ্লোকে জাবালিকে ব্রাহ্মণোত্তম বলা হয়েছে কেন? অবশ্য এই প্রশ্নটা যে প্রক্ষিপ্তকারীদেরকে ভাবাইনি এমনটা নয়। তাই ১০৯তম সর্গের ৩৮ ও ৩৯ নং শ্লোকে তারা এর পেছনে খুবই হাস্যকর কিছু কারণ দেখিয়েছে তা আপনারা নিজেরাই পড়লে বুঝতে পারবেন। উপরন্তু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলোতে জাবালির কথা শুনে একবারও মনে হচ্ছে না যে তিনি বৌদ্ধমত অনুসারে কথাগুলো বলছেন বরং এইগুলো বস্তুবাদী চার্বাক

মতের কথা। তাহলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীরাম তথাগত বুদ্ধের নিন্দা করতে যাবেন কেন চার্বাকের নাম একবারও উল্লেখ না করে?

তবে ৩০৮ নং সর্গের ১ম শ্লোকে বলা হচ্ছে, "ধর্মজ্ঞ রামকে ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি ধর্মের বিপরীত বচনে বললেন। " এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে জাবালির কথাগুলো ধর্মের বিপরীত এমনটা বলা হলো কেন? প্রথমত আমি শুরুতেই বলেছি জাবালির বলা ৩-১২ এর বিশুদ্ধ শ্লোকগুলোকে কেউই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ প্রমাণ করতে পারবে না, বরং এগুলোর হিন্দু ধর্মগ্রন্থেরই কথা। তাই এখানে ধর্মের বিপরীত বলতে বোঝা উচিত যে ওই পরিস্থিতিতে রামের যা ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ জাবালি রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার বিপরীতকে শাস্ত্রবচন দ্বারা সিদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন।

উপনিষদ রহস্য - ইন্দ্র ও যক্ষ সংবাদ

কেনোপনিষদের কথা প্রসঙ্গ উঠলেই সর্বপ্রথম আমাদের যে আখ্যানের কথা মনে পড়ে সেটি হচ্ছে ইন্দ্র এবং যক্ষের সংবাদ। কেনোপনিষদের ৩য় খণ্ডে এই আখ্যানটি এসেছে। আখ্যানটি এরকম—

"একসময় ব্রহ্ম দেবতাদের ওপর বিজয় লাভ করলেন। তখন ব্রহ্মের এই বিজয়ে মহিমান্বিত হয়ে দেবগণ ভাবলেন, "এই বিজয় তো আমাদেরই"। তখন ব্রহ্ম তাঁদের অহংকার দূর করার জন্য তাঁদের সামনে যক্ষরূপে প্রকট হলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁকে চিনতে পারলেন না। তখন এই যক্ষকে জানার জন্য দেবগণ প্রথমে অগ্নিদেবকে প্রেরণ করে বললেন, এই যক্ষকে জানার চেষ্টা করুন। অগ্নিদেব দম্ভসহকারে যক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন যক্ষ অগ্নিদেবকে বললেন তুমি কে? অগ্নিদেব উত্তর দিলেন আমি অগ্নি,

আমি জাতবেদা নামেও প্রসিদ্ধ। যক্ষ বললেন, তোমার মধ্যে কি এমন সামর্থ্য আছে? অগ্নিদেব বললেন, এই জগতের সবকিছুই আমি দগ্ধ করতে পারি। তখন যক্ষ সেই অগ্নিদেবের সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, এটি দগ্ধ করো। তখন অগ্নি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটি দগ্ধ করতে পারলেন না। এরপর নিরাশ হয়ে অগ্নিদেব ফিরে এলেন এবং অন্যান্য দেবতাদের বললেন, এই যক্ষকে আমি জানতে পারলাম না। এরপর দেবগণ বায়ুদেবকে যক্ষকে জানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। যখন যক্ষের সামনে বায়ুদেব উপস্থিত হলেন তখন যক্ষ বললেন তুমি কে? বায়ুদেব অহংকারপূর্বক বললেন, আমি অতি বেগবান বায়ু এবং অন্তরিক্ষে দ্রুত গতিতে বিচরণের জন্য আমাকে মাতরিশ্বাও বলা হয়। যক্ষ বললেন, তোমার মধ্যে কি এমন পরাক্রম আছে? বায়ুদেব বললেন, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমি উড়াতে পারি না। যক্ষ বায়ুদেবের সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, এটি উড়িয়ে দেখাও। বায়ুদেব তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়েও সেই তৃণকে উড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। এরপর লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে দেবতাদের বললেন, আমি এই যক্ষকে জানতে অসমর্থ। এরপর দেবগণ

ইন্দ্রকে বললেন, হে ঐশ্বর্যবান! অগ্নি ও বায়ুদেব তো যক্ষকে জানতে ব্যর্থ হলেন, আপনি কৃপা করে এই যক্ষকে জেনে আসুন। দেবগণের কথা শুনে ইন্দ্র যক্ষের সামনে গেলেন, কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের সামনে থেকে অন্তর্ধান হলেন। তখন ইন্দ্রের অনেক দুঃখ অনুভব হলো। কারণ তিনি এই যক্ষকে জানার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু জানার সেই সুযোগই হলো না। তখন আকাশে হৈমবতী উমা আবির্ভূত হলেন এবং বললেন এই যক্ষ আসলে ব্রহ্মই, তোমরা সকলে ব্রহ্মের বিজয়েই নিজেদের মহিমান্বিত মনে করেছিলে। এভাবে উমার মাধ্যমেই ইন্দ্র যক্ষের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরেছিলেন এবং সকল দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন।"

এই হচ্ছে আখ্যায়িকার সার কথা। সাধারণভাবে এই আখ্যান পড়লে এর বিশেষতার বোধ হয় না। স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্র তো দেবগণের রাজা, তিনি যক্ষকে জেনে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন এতে আবার আশ্চর্য কী। কিন্তু যদি আমরা এই আখ্যানের প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা এর প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করতে পারবো। কারণ উপনিষদ্ রহস্য বিদ্যার গ্রন্থ। এজন্য এর বর্ণনা স্থূল দৃষ্টিতে দেখার অথবা বোঝার কোনো অবকাশই নেই। আসুন এই আখ্যানটির রহস্য জানার চেষ্টা করি। প্রথমে আমরা আখ্যানের প্রতিটি চরিত্র সম্বন্ধে জানবো।

১। যক্ষ — যক্ষ' হচ্ছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। "য়ক্ষ্যতে পূজ্যতেতি য়ক্ষঃ" যিনি পূজনীয়, তাঁর নাম যক্ষ। অথর্ববেদে বলা আছে, "এই শরীররূপ নগরী সমস্ত অগ্ন্যাদি দেবগণের (পঞ্চভূতের) অধিষ্ঠানভূত। আট চক্র ও নয়টি ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার বিশিষ্ট এই নগরী অজেয়। এই নগরীতে এক প্রকাশময় কোশ (মনোময় কোশ) সুখময় জ্যোতি দ্বারা আবৃত। সেখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— তিন অরবিশিষ্ট; জ্ঞান, কর্ম, উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত; জ্যোতির্ময় সেই মনোময় কোষে যে (যক্ষ) পূজনীয় ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁকেই ব্রহ্মজ্ঞানিগণ নিশ্চিতরূপে জানেন (অথর্ব০ ১০।২।৩১-৩২)"। অথর্ববেদে আরো বলা হয়েছে— "মহদ্ য়ক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তস্মৈ বলিং রাষ্ট্রভৃতো ভরন্তি (অথর্ব০ ১০।৮।১৫)" অর্থাৎ এই সংসারে রাষ্ট্রের সেবকগণ সেই মহান (যক্ষ) পূজনীয় ব্রহ্মকে পূর্ণ শ্রদ্ধার দ্বারা ধারণ করেন।

২। অগ্নিদেব— সর্বপ্রথম অগ্নিদেব যক্ষের সামনে গিয়েছিলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন (অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি) অর্থাৎ আমি প্রসিদ্ধ অগ্নি এবং আমিই জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে অগ্নিকে 'জাতবেদ' বলার কারণ হচ্ছে, "জাতং বেদো ধনং য়স্মাৎ স জাতবেদাঃ" যার থেকে ধন উৎপন্ন হয় তার নাম হচ্ছে 'জাতবেদ' = অগ্নি; অথবা "জাতং জাতং বিদ্যতে ইতি জাতবেদাঃ" প্রত্যেক কার্য-পদার্থে (কাষ্ঠ প্রভৃতি উৎপন্ন বস্তুমাত্রে) বিদ্যমান হওয়ার কারণে অগ্নির নাম 'জাতবেদ'। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে— "অগ্নির্য়থৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব (কঠ০ ২।২।৯)" অর্থাৎ একই অগ্নি জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রবিষ্ট হয়ে তদাকার হয়ে বিদ্যমান।

৩। বায়ুদেব— অগ্নিদেবের পর বায়ুদেব যক্ষের সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, (বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি) অর্থাৎ আমি প্রসিদ্ধ বায়ু এবং আমিই অন্তরিক্ষে বিচরণকারী মাতরিশ্বা। বায়ুকে মাতরিশ্বা বলার কারণ

হিসেবে নিরুক্তাকার মহর্ষি যাস্ক বলেছেন— "মাতরিশ্বা বায়ুঃ, মাতরি = অন্তরিক্ষে শ্বসিতি, মাতর্য়শ্বনিতীতি বা॥" (নিরুক্ত ৭।২৬) = অন্তরিক্ষে শীঘ্র গমন করার কারণে বায়ুকে 'মাতরিশ্বা' বলা হয়।

৪। ইন্দ্র— দেবগণ ইন্দ্রকে "মঘবন" বলে সম্বোধন করেছেন। ঐশ্বর্যবান হওয়ার কারণে ইন্দ্রকে 'মঘবন্' বলা হয়েছে। এই প্রকরণে 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ জীবাত্মা। পাণিনীয় সূত্রানুযায়ী— "ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা॥ (অষ্টা০ ৫।২।৯৩)" অর্থাৎ 'ইন্দ্র' তিনিই, যার কর্ম সাধনের জন্য 'ইন্দ্রিয়' রয়েছে। ষষ্ঠী সমর্থ 'ইন্দ্র' শব্দ দ্বারা লিঙ্গ অর্থে 'ঘচ্' প্রত্যয়ের নিপাতন হয়। অষ্টাধ্যায়ীর এই সূত্রের কাশিকা-বৃত্তির ব্যাখ্যায় এই ভাবকে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে— "ইন্দ্র আত্মা, স চক্ষুরাদিনা করণেন অনুমীয়তে।" যদিও 'ইন্দ্র' শব্দটি পরমেশ্বর, জীবাত্মা, রাজা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অনেক অর্থে বৈদিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু এই উপনিষদে যক্ষের (ব্রহ্মের) জ্ঞাতা হলেন ইন্দ্র।

৫। হৈমবতী উমা— এই প্রকরণে 'উমা' হিমালয় দুহিতা পার্বতী নয়, বরং "উম্ পরমাত্মানং মাতি প্রমাপয়তি ইতি উমা" অর্থাৎ যা পরমাত্মার সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্ত করায়, তার নাম 'উমা'। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যাই 'উমা'। "হন্তি উষ্মাণমিতি হিমম্" = যে সন্তাপকে দূর করে তার নাম 'হিম' এবং "হৈমং বিদ্যতে য়স্যা সা হৈমবতী" = যার মধ্যে হিমের ভাব আছে, তার নাম 'হৈমবতী'। এই প্রকার শান্ত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়ার কারণে ব্রহ্মবিদ্যাকে 'হৈমবতী' বলা হয়েছে। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এই প্রকরণ সম্পর্কে বলেছেন— "এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে হৈমবতী নামক যে ব্রহ্মবিদ্যা আছে, তার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে" (পূনা প্রবচন, সপ্তম প্রবচন, যজ্ঞ ও সংস্কার বিষয়ক)।

এই হলো আখ্যানের চরিত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবার আখ্যানে ফিরে আসা যাক। এই প্রকরণে ব্রহ্মের যক্ষরূপে প্রকট হওয়া এবং অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণের তাঁকে না জানা, একটি আলংকারিক বর্ণনা। এখানে রূপকালঙ্কার দ্বারা পরমাত্মার যক্ষরূপে প্রকট হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা বেদান্ত-দর্শনের (১।২।২৩) "রূপোপন্যাসাচ্চ" সূত্রে করা হয়েছে। কেননা, ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিরকার অতএব তাঁর শরীরধারী হয়ে সংলাপে অংশগ্রহণ কখনো সম্ভব নয়। তাই আখ্যায়িকার রূপে ব্রহ্মের সর্বোৎকৃষ্টতার বোধ করানোর জন্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সংসারে দুটি প্রধান শক্তি দেখতে পাই একটি হচ্ছে, প্রকাশ এবং অন্যটি গতি। এদের আশ্রয়ে আমরা সংসারে অনেক কিছু লাভ করে থাকি। কিন্তু ব্রহ্মের কাছে এই দুই শক্তিও তুচ্ছ। কেননা, অগ্নি ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যক্তরূপে না আসে তাহলে তা কোনকিছুই জ্বালাতে পারবে না। বায়ুও ব্যক্ত অবস্থায় এসেই কোনোকিছু ওড়াতে পারেন, নতুবা নয়। আর তাদের অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত অবস্থায় আনেন স্বয়ং ব্রহ্ম। সেজন্য বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি মহাভূতের যা কিছু সামর্থ্য রয়েছে, তা ব্রহ্ম প্রদত্ত। ব্রহ্মের শক্তির কাছে ভৌতিক অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড় দেবগণ যে শক্তিহীন এটি বোঝানোর জন্যই এই আখ্যায়িকা। আর অগ্নি, বায়ু দেবগণের যক্ষকে জানতে না পারার কারণ হচ্ছে, তাঁরা উভয়েই অচেতন সেজন্য যক্ষকে জানার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু ইন্দ্রে (জীবাত্মাতে) চেতনা-শক্তি থাকার কারণে তার সেই সামর্থ্য আছে। কিন্তু যদি জীবও যদি অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে সাংসারিক ভোগবিলাসে নিমগ্ন হয়, তখন তারও ঈশ্বর-প্রাপ্তি হতে পারে না। ইন্দ্রকে (জীবাত্মাকে) দেখে যক্ষের (ব্রহ্মের) অন্তর্ধান হওয়ার দ্বারা এটিই স্পষ্ট হয়। এরপর ইন্দ্র (জীবাত্মা) স্বাধ্যায় ও যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করলেন। তখন

জীবাত্মার হৃদয়াকাশে 'উমা' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হলো এবং তার দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে জানতে পারলেন। কারণ জীব যোগসাধনা দ্বারা যখন দিব্যপ্রজ্ঞা লাভ করেন, তখনই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা তার বুদ্ধি নির্মল হয় এবং তিনি ব্রহ্মকে জানতে সক্ষম হন। আর এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি আমাদের হৃদয়াকাশেই হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলছে, "অথ য়দিমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ য়দন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥ (ছান্দোগ্য০ ৮।১।১)" অর্থাৎ 'ব্রহ্মপুর' নামক এই শরীরে যে সূক্ষ্ম হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ আছে, তার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আকাশ রয়েছে। সেই আকাশের অন্তর্বর্তী স্থানে যে ব্রহ্ম আছেন, তিনিই অন্বেষণ করার যোগ্য এবং তিনিই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। তাই ব্রহ্ম যেখানে প্রকট এবং অন্তর্ধান হয়েছিলেন সেটি আমাদের এই হৃদয়াকাশ, বাইরের আকাশ নয়। এভাবে যদি আমরা উপনিষদের আখ্যানগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করি তাহলেই আমরা এর প্রকৃত রস আস্বাদন করতে সক্ষম হবো নতুবা স্থূল চিন্তা করলে শুধু একটি কাল্পনিক গল্প বলেই মনে হবে।

সন্দর্ভ গ্রন্থ— উপনিষদ্ সংগ্রহ ১ম খণ্ড (স্বাধ্যায় প্রকাশনী)

উপনিষদ্ রহস্য - অদৃশ্যই সত্য (সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ)

সংসারের পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— দৃশ্য ও অদৃশ্য। যা কিছু দৃশ্য সেসব আমরা দেখতে পাই আর যা কিছু অদৃশ্য, তা আমরা দেখতে পাই না। এমন অনেক পদার্থ আছে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। দেখতে না পাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত সেসব এতই সূক্ষ্ম যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সেগুলো দেখার শক্তি নেই। দ্বিতীয়ত সেসব এতটাই দূরে যে, আমরা সেগুলো দেখতে পাই না। অর্থাৎ দূরত্বের কারণে আমাদের ইন্দ্রিয় সেখানে পৌঁছাতে পারে না। যদি সেসব বস্তু আমাদের নিকটে হতো, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম। তৃতীয় কারণ হতে পারে, সেগুলো আমাদের এতটাই কাছে যে, আমরা তাদের দেখতে পাই না। এর পরিণামস্বরূপ আমরা দৃশ্যকেই সত্য বলে মনে করি, বাস্তব মনে করি; অদৃশ্যকে সত্য ও বাস্তব মনে করি না। শুধু তাই নয়, আমরা অদৃশ্যকে মিথ্যা ও অবাস্তব বলতে শুরু করি। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৈনন্দিন আচরণে অদৃশ্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করি। কিন্তু যদি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, অদৃশ্যই সত্য, এটিই বাস্তব। দৃশ্যমান কেবল অদৃশ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। যদি অদৃশ্য না থাকে, তবে দৃশ্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দৃশ্যের অস্তিত্ব অদৃশ্যের স্রোত থেকে প্রবাহিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে আরুণি ও শ্বেতকেতুর সংবাদ পাওয়া যায়। পিতা শ্বেতকেতুকে বললেন— পুত্র! গুরুর কাছে গিয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন কর। পিতার আদেশ অনুসারে শ্বেতকেতু ১২ বছর গুরুকুলে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করলেন। যখন শ্বেতকেতু পিতার কাছে ফিরে আসলেন, তখন তিনি নিজেকে খুব পণ্ডিত মনে করলেন এবং ভেবেছিলেন যে, তিনি সবকিছু শিখে ফেলেছেন। পিতা তখন পুত্রকে বললেন— তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?' শ্বেতকেতু বললেন, এটি কেমন বিদ্যা? এরপর পিতা বললেন— পুত্র যাও, সামনে দাড়িয়ে থাকা বট বৃক্ষের ফল নিয়ে এসো। পুত্র তখন বৃক্ষ থেকে ফল নিয়ে আসলেন। পিতা বললেন এটি ভেঙ্গে ফেল। পুত্র ভেঙে ফেললেন। পিতা বললেন, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? পুত্র বললেন, কিছু বীজ দেখতে পাচ্ছি। পিতা বললেন, এদের একটি ভেঙে ফেল। পুত্র বললেন, ভেঙেছি। পিতা বললেন কী দেখতে পাচ্ছ? পুত্র

বললেন, কিছুই না। পিতা বললেন, যাকে তুমি কিছুই না বলছো, আসলে সেখানে সবকিছু রয়েছে। এই ছোট ছোট অসংখ্য বীজের মধ্যেই অসংখ্য বিশাল বটবৃক্ষ অদৃশ্যরূপে বিদ্যমান। এরপরের কাহিনিতে পিতা পুত্রকে বললেন, তোমাকে এই লবণখণ্ড দিলাম। তুমি এই লবণখণ্ড জলে রেখে পরদিন সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবে। শ্বেতকেতু পিতার কথানুসারে তাই করলেন। পরেরদিন সকালে পিতা পুত্রকে বললেন, রাতে জলে যে লবণখণ্ডটি রেখেছিলে সেটি নিয়ে এসো। কিন্তু শ্বেতকেতু কোনো লবণখণ্ড খুঁজে পেলেন না, কারণ তা জলে মিশে গেছে। পিতা বললেন, এই জল থেকে একটুখানি পান করো। পুত্র পান করে বললেন, এটি তো লবণাক্ত। পিতা বললেন, একটু মাঝখানে ও নিচের দিকে থেকে পান করো। পুত্র বললেন, সর্বত্রই তো লবণাক্ত। পিতা বললেন, লবণ দেখা যাচ্ছে না কারণ এটি জলের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

অদৃশ্য সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, চল ও অচল সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলা যায়। যে বস্তুটি চলমান, 'গতিশীল' সেটিই আমাদের কাছে দৃশ্যমান এবং আমরা তাকেই সত্য বলে মনে করি। আমরা বুঝতে পারি যে চাকাটি চলছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে চাকাটি চলার পেছনে যদি স্থির কোনো বস্তু না থাকে তবে চাকাটি চলতে পারে না। দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয়ে আমরা বলেছিলাম যে, দৃশ্য অদৃশ্যের উপর টিকে আছে। সমস্ত দৃশ্য প্রথমে অদৃশ্যরূপে থাকে, এজন্য যথার্থ সত্তা অদৃশ্যরই। অদৃশ্য থেকে প্রবাহিত হয়েই সমস্ত দৃশ্য তৈরি হয়। চল ও অচল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যে চলমান বস্তু দেখি, তা বস্তুত অচল কিছুর সাহায্যে চলে। উদাহরণস্বরূপ চাকাটি চলছে, কিন্তু এটি একটি অচল কীলকের সাহায্যে চলছে। যদি কীলক না থাকতো, তবে চাকাটি চলতে পারতো না। রথ, যান এবং ট্রেনগুলো স্থির কীলকের সাহায্যে চলাচল করে। যদি স্থিরতা না থাকতো, অচল না থাকতো, তাহলে অস্থিরের সত্তা থাকতো না, চলমানের সত্তা থাকতো না। আমরা যদি চলমান বস্তুর অস্তিত্বকে মেনে নিই, তাহলে প্রথমে আমাদেরকে অচল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। আমরা দৃশ্যকে, চলমানকে সত্য বলে মনে করি, কিন্তু সত্য এটিই যে, অদৃশ্য ও অচলই সত্য। যা কিছু সচরাচর আমরা বুঝে থাকি বাস্তবতা আসলে তার চেয়েও এগিয়ে। এই ক্রমাগত পরিবর্তনের পুঁতিতে যে অপরিবর্তনীয়তার সুতোটি গেঁথে আছে তা অপরিবর্তিত থাকে, কারণ পরিবর্তন তার মধ্যেই দৃশ্যমান। অপরিবর্তনে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। আমরা আগেই বলেছি যে, যতক্ষণ কোনো অপরিবর্তনশীল বস্তু না থাকছে, ততক্ষণ কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়।

অদৃশ্যতা এবং অপরিবর্তনশীলতার এই গুণ যেখানে পাওয়া যায়, তাকে এই শরীরে 'আত্মা' বলা হয়। মানুষের শরীরের পরে এই উভয় গুণাবলি প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট সংসারেও পাওয়া যায়। মানুষের শরীর দৃশ্যমান, প্রকৃতির সৃষ্ট জগৎও দৃশ্যমান। শরীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে— শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এইসব শরীরের গুণাবলি, সংসারের প্রতিটি কণাতেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিবর্তনের এই কারণেই একে সংসার বলা হয় (সংসরতি ইতি সংসারঃ)। এই দৃশ্যমান শরীর যে অদৃশ্য সত্তার ওপর টিকে আছে, তাকে যেমন 'আত্মা' বলা হয়, তেমনি এই দৃশ্যমান সংসারও যে অদৃশ্য সত্তার ওপর টিকে আছে, তাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। আমরা দৃশ্যমানতা সম্পর্কে যা-ই বলি না কেন, পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। শরীরে পরিবর্তন হচ্ছে, তার মধ্যে অবিরাম গতিশীলতার প্রবাহ রয়েছে, তাই দেহের এই অবিরাম চলমান চাকার মধ্যে এমন কিছু স্থির কীলক থাকতে হবে, যার চারপাশে এই চাকাটি চলতে পারে। এই কীলকের নাম ‘আত্মা’। একইভাবে পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে, এই পরিবর্তন, এই নিরন্তর গতি যে গতিহীন সত্তার আধারে টিকে আছে, তাঁর নাম ‘পরমাত্মা’।

আমরা দেখেছি দৃশ্যমান সত্তাকে মানলে আমাদের অদৃশ্য সত্তাকে মেনে নিতে হয়। পরিবর্তন ও গতিশীলতার সত্তা মেনে নিলে এমন একটি সত্তাকে মেনে নিতে হবে যার কোনো পরিবর্তন নেই, যা গতিহীন, স্থির, কেননা দৃশ্যের আধার অদৃশ্য, গতিশীলতা ও পরিবর্তনের আধার হলো গতিহীনতা তথা স্থিরতা। এ দুটি বিষয় ছাড়াও তৃতীয় একটি বিষয় আছে যা বাধ্য হয়েও আমাদের মেনে নিতে হয়। ওই বস্তুটি কী? কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমরা যা দেখি, যা কিছু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, সেটি তখনই ঘটে, যখন সেটি আমাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে। যদি কোনো বস্তু আমাদের খুব কাছে থাকে, এত কাছে যে তার এবং আমাদের মধ্যে এক অণু পরিমাণ দূরত্বও থাকে না, তাহলে আমাদের সে সম্পর্কে দৃশ্য-জ্ঞান হয় না। চোখের মণি চোখের সবচেয়ে কাছে, তাই চোখ সেটিকে দেখতে পারে না। যদি কোনো সত্তা সর্বব্যাপী হয়, তাহলে আমরা যেখানে আছি সেখানেও তিনি বিদ্যমান। তিনি আমাদের থেকে দূরে থাকলেই আমরা তাঁকে দেখতে পেতাম। যেখানে তিনি আছেন সেখানে আমরা আছি, যেখানে আমরা আছি সেখানে তিনিও আছেন—তাহলে তাকে কে দেখবে এবং কীভাবে দেখবে? প্রথমত তিনি অদৃশ্য, দ্বিতীয়ত তিনি সর্বত্র বিরাজমান। দেখতে হলে দূরত্ব প্রয়োজন, যা উভয়ের মাঝে নেই।

এখন শঙ্কা হতে পারে, যদি অদৃশ্য আত্মার সত্তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে তাহলে তার অনুভব কেন হয় না? অদৃশ্য পরমাত্মার সত্তাও যদি সন্দেহের ঊর্ধ্বে হয়, তবে তাঁর প্রতীতি কেন হয় না? এর উত্তর হচ্ছে, যে বস্তুটি সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী তার প্রতীতি সম্ভব নয়। তিনি সর্বত্র রয়েছে, তাই তাঁকে কোথাও অনুসন্ধান করা যায় না। তাঁর অনুসন্ধান তখনই করা যেত, যখন তিনি একটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন। হ্যাঁ, তাঁর উপলব্ধি একভাবে করা যায়। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেমন তার অঙ্গের প্রতি ধ্যান দেয় না, অসুস্থ হলেই তার প্রতি ধ্যান চলে যায়। এভাবে যখন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার খেয়াল হয় যে, এমন কেউ আছে যে তাকে সুস্থ, নীরোগ এবং মানসিক শান্তি দিতে পারে। সংসার একটি অদ্ভুত খেলা। এটি দৃশ্যমান, তাই অদৃশ্যকে বিশ্বাস করতে হবে। এটি বিনাশশীল, তাই অবিনশ্বরকে স্বীকার করতে হবে; এটি গতিশীল এবং পরিবর্তশীল, তাই গতিহীন এবং অপরিবর্তনীয় কাউকে মানতে হবে; এটি দুঃখময়, তাই আনন্দময় কাউকে মেনে নিতে হবে; এটি অপূর্ণ, তাই পূর্ণকে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শ্রুতি বলছে— "স পর্য়গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবি□ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্য়াথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশ০ ৮)"

সন্দর্ভ গ্রন্থ— (সত্য কী খোঁজ; ডা০ সত্যব্রত সিদ্ধান্তলংকার)
ভাষান্তর— বিপ্লব আর্য

সত্যার্থ প্রকাশে উল্লেখিত মন্ত্র, শ্লোক ও অন্যাদি বাক্য গণনা

মনুস্মৃতি - শ্লোক ৪১২
ঋগ্বেদ - মন্ত্র ৩৭
যজুর্বেদ - মন্ত্র ৬৬
সামবেদ - মন্ত্র ২
অথর্ববেদ - মন্ত্র ২১

যোগ দর্শন - সূত্র ১৪
ন্যায় দর্শন - সূত্র ২১
সাংখ্য দর্শন - সূত্র ১৫
বেদান্ত দর্শন - সূত্র ২২
বৈশেষিক দর্শন - সূত্র ৪৯
মীমাংসা দর্শন - সূত্র ১
বেদান্তদর্শন শঙ্করভাষ্য - সূত্র ৩
কেবল্যোপনিষদ্ - বাক্য ১
মৈত্রায়ণীপনিষদ্ - বাক্য ২
নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্ বাক্য ১
জাবালোপনিষদ্ - বাক্য ২
মুণ্ডকোপনিষদ্ - শ্রুতি ১০
কেনোপনিষদ্ - শ্রুতি ৫
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ - শ্রুতি ৫
ঐতরেয়োপনিষদ্ - শ্রুতি ১
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ - শ্রুতি ৪
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ - শ্রুতি ১০
ছন্দোগ্যোপনিষদ্ - শ্রুতি ৩১
কঠোপনিষদ্ - শ্রুতি ১০
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - শ্রুতি ৩৪
বিদ্যারণ্যকৃত অনুভূতি প্রকাশ - শ্লোক ২
নিঘণ্টু - সূত্র ১
মহাভারত - শ্লোক ১৭
বাল্মীকি রামায়ণ -শ্লোক ১
চাণক্য নীতি - শ্লোক ৯
পঞ্চতন্ত্র কথা - শ্লোক ১
নিরুক্ত - সূত্র ৬
শ্রৌতসূত্র প্রকাশ - সূত্র ২
অশ্বালায়ন গৃহ্য - সূত্র ৩
পারস্কর গৃহ্য - সূত্র ২
কাত্যায়নপরিশিষ্ট - সূত্র ১
পরাশর স্মৃতি - শ্লোক ৩
ব্রহ্ম পুরাণ - শ্লোক ৫
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র - সূত্র ২

গীতা - শ্লোক ৫
শতপথ ব্রাহ্মণ - সূত্র ২৯
ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ - সূত্র ১
গোপথ ব্রাহ্মণ - সূত্র ২
ভর্তৃহরি বৈরাগ শতক -শ্লোক ২
সুশ্রুত সংহিতা - সূত্র ৫
ব্যাকরণ মহাভাষ্য - সূত্র ৫
অষ্টাধ্যায়ী - সূত্র ১০
শার্ঙ্গধর - শ্লোক ১
মহানির্বাণতন্ত্র পঞ্চমোল্লাস কালীতন্ত্রাদি - শ্লোক ১
কুলার্ণবতন্ত্র - শ্লোক ৫
জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র হঠয়োগ প্রদীপিকা -শ্লোক ৩
রুদ্রযামলতন্ত্র -শ্লোক ১
সদানন্দবিরাচিত বেদান্তসার - শ্লোক ১
শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বর সংহিতা -শ্লোক ১
ভবিষ্য পুরাণ -শ্লোক ১
রাজা ভোজ সঞ্জীবনী -শ্লোক ১
রামানুজ পটলপদ্ধতি - শ্লোক ১
ভক্তমাল - শ্লোক ৩
পদ্ম পুরাণ - শ্লোক ৪
দিব্যসূচিরিত কাব্য - শ্লোক ১
গরুণ পুরাণ -শ্লোক ১
প্রতিষ্ঠামযূখ তন্ত্র - শ্লোক ১
তীর্থদর্পণ পণ্ডাঅর্পণ - শ্লোক ১
গুরু গীতা - শ্লোক ১
ভাগবত পুরাণ - শ্লোক ৪
হিমাদ্রি -শ্লোক ৭
শ্রীকাণ্ঠশিব পণ্ডিত কা শাবরতন্ত্র -শ্লোক ১
ঊহ্য শাবরতন্ত্র -শ্লোক ১
ঊহ্য কামরত্ন বীজমন্ত্র -শ্লোক ২
কৌলোপনিষদ্ - শ্লোক ১
রামস্নেহধর্মপ্রকাশ - দোহা ১
জপজী পৌড়ী - দোহা ১
ঊহ্য সুখমনী -দোহা ২

ঊহ্য সুমরণ - দোহা ১
ঊহ্য নামপ্রতাপ - দোহা ৫
গোপাল সহস্রনাম স্তোত্র -শ্লোক ২
সিদ্ধান্তরহস্য - শ্লোক ৮
ঊহ্য পুষ্পাঞ্জলি - শ্লোক ১
সর্বদর্শন সংগ্রহ চার্বাক দর্শন - শ্লোক ১৫
সর্বদর্শন সংগ্রহ বৌদ্ধ দর্শন- শ্লোক ১৭
প্রকরণরত্নাকর আর্হতদর্শন -শ্লোক ৯১
শ্রাদ্ধদিনকৃত্য - শ্লোক ৩
অমরকোশ - শ্লোক ৩
বিবেকাসার - শ্লোক ৩
মোট ১০৮২ মন্ত্র, শ্লোক, সূত্র ও দোহা ।
অন্য গ্রন্থের ৪১৮ শ্লোক, দোহা সত্যার্থ প্রকাশে আছে । এভাবে সত্যার্থ প্রকাশে ১০৮২+৪১৮ = ১৫০০ শ্লোক এবং মন্ত্র ,সূত্র, দোহা বিদ্যমান। এছাড়াও আরো ২৮০টি গ্রন্থের উদাহরণ সত্যার্থ প্রকাশে আছে ।
সত্যার্থ প্রকাশে খ্রিষ্টান মত বাইবেল পুস্তকের ৩৭৯ আয়াত এবং ইসলাম মত কুরআনের ৩৯৪ আয়াত খণ্ডনের জন্য আছে ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কার কার কাছে কোন কোন শাস্ত্র পড়েছিলেন ?

 মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কার কার কাছে কোন কোন শাস্ত্র পড়েছিলেন

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য নামে অভিহিত হতেন। তৎকালীন সময়ে তিনি কাশী ও নানাস্থানে আর্যাবর্তের সর্বমতবাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। তার কিছু তথ্য নিম্নে উল্লেখিত হলো -

১। পণ্ডিত রামনিরঞ্জন শাস্ত্রী - বৈশেষিক, ন্যায়

২। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর তর্করত্ন- সাংখ্য, যোগ

৩। পণ্ডিত হরপ্রসাদ বিদ্যারত্ন - পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা

৪। পণ্ডিত রাসমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ - ব্যাকরণ

৫। পণ্ডিত নিখিলেশ শাস্ত্রী - কাত্যায়ন বার্তিক

৬। পণ্ডিত রুদ্রদেব বিদ্যালংকার - বাক্যপদীয়

৭। পণ্ডিত সোমদেব তর্করত্ন - জয়াদিত্যের কাশিকা

৮। পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রী - জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যাস

৯। পণ্ডিত বিমলেন্দু কাব্যনিধি - হরদত্তের পদমঞ্জরী

১০। পণ্ডিত শশীকান্ত ভট্ট - রামচন্দ্রের প্রক্রিয়া কৌমুদী

১১। পণ্ডিত মহাবীর শর্মা - বোপদেবের মুগ্ধবোধ

১২। পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ শাস্ত্রী - ১১ উপনিষদ্

১৩। পণ্ডিত বলদেব শিরোমণি - ১০১ নবীন উপনিষদ্

১৪। পণ্ডিত রত্নাকর শিরোমণি - প্রাচীন স্মৃতি

১৫। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন - নবীন স্মৃতি

১৬। ভিক্ষু তথাগত ধর্মপাল - মহাযানী বৌদ্ধমতের মাধ্যমিক ও যোগবাদ

১৭। রাহুল মণিভদ্র - হীনযানী বৌদ্ধমতের বৈভাষিক ও সৌতান্ত্রিক

১৮। জৈন সাধু যুগলকিশোর পারেখ - দিগম্বর সম্প্রদায় অন্তর্গত উমাস্বামীকৃত 'তত্ত্বার্থাধিগম' ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় অন্তর্গত হরিভদ্রকৃত 'লোকতত্ত্ব-নির্ণয়'

১৯। বৈতাল ভৈরব বাবাজী - তন্ত্র

২০। পণ্ডিত বিভূতিভূষণ তর্কবাগীশ - 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' ও পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দর্শনশাস্ত্রী 'নাস্তিকবাদ', সঞ্জয়কৃত 'সংশয়বাদ', কেশ কম্বলীকৃত 'জড়বাদ', কশ্যপকৃত 'ঔদাসীন্যবাদ', গোপালকৃত 'অদৃষ্টবাদ' ও কাকুদ-কাত্যায়নকৃত 'পঞ্চ-ভৌতিকবাদ'

২১। পরমহংস সচ্চিদানন্দ স্বামী - সাঙ্খ্যকারিকা, পাতঞ্জল যোগদর্শ সাধনপাদ সূত্রের ব্যবহারিক পাঠ

২২। স্বামী পরমানন্দ পরমহংস - বেদান্তসার, বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্তচিন্তামণি

২৩। স্বামী জ্বালানন্দ পুরী, স্বামী শিবানন্দ গিরি - যোগবিদ্যা

উল্লেখ্য, দণ্ডী স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীজির উল্লেখ এখানে করা হয়নি । কেবল সাধারণ অধ্যাপকের উল্লেখই এখানে বিদ্যমান ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরঃ

[জন্ম: ২৬ সেপ্টেম্বর,১৮২০ খ্রি০ মৃত্যু: ২৯ জুলাই,১৮৯১ খ্রি০]

বেদাদিশাস্ত্র কৃত ভূরিপরিশ্রমোঽসৌ,
মান্যো বভূব বিবুধেশ্বর চন্দ্রশর্মা ।
বিদ্যাপয়োনিধিরিতি প্রথিতো জনেষু,
শ্রীমান্ কুশাগ্রমতিরাস দয়ার্দ্রচেতাঃ ॥১॥

ভাবার্থ: বেদাদিশাস্ত্রে পরিশ্রমী, বহুধা মেধাবী শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা মাননীয় ছিলেন ! যিনি জনসাধারণে বিদ্যাসাগর নামে প্রসিদ্ধ, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি ও দয়ালু ছিলেন ।

বাল্যে বিবাহকরণস্য হি কুপ্রথাসীদ্,
বঙ্গাঙ্গ মাগধকলিঙ্গ বিহার দেশে ।
তৎকারণাচ্চ বিধবা অপি সৌকুমার্যে,
বহব্যো বভূবুরদয়ৈঃ পরিভূয়মানাঃ ॥২॥

ভাবার্থ: বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, উড়িষ্যা, বিহার আদিতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। যার কারণে বাল্যবিধবাও বেশি ছিল। নির্দয় ব্যক্তিরা বাল্যবিধবাদের তিরস্কার করতেন।

তাসাং বিলোক্য কুদশামতিশোচনীয়াং,
কারুণ্যসিন্ধুহৃদয়ং শতধা বিদীর্ণম্ ।
রাত্রিন্দিবং যতিতবান্ বিধবা বিবাহ-
শাস্ত্রানুমোদিতসুতর্কযুতত্বসিদ্ধচৈ ॥৩॥

ভাবার্থ: তাদের সেই অতিশোচনীয় দুর্দশা দেখে দয়াসাগরের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হলো। বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র ও তর্কসম্মত প্রমাণ করার জন্য তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে লাগলেন।

সন্তোষমাপ নহি তেন স রাজকীয়ং,
ব্যক্তং বিধানমপি কারয়িতুং প্রয়েতে ।
সাফল্যমাপ ভগবৎকৃপয়া দয়ালুঃ,
বন্দ্যো ন কস্য সুজনস্য মহামনীষী ? ॥৪॥

ভাবার্থ: শুধু এতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না বরং এই বিষয়ে আইন নির্মাণের জন্যও তিনি প্রচেষ্টা চালান এবং ঈশ্বরের কৃপাতে তিনি সফল হলেন । এমন মহামনীষী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন সজ্জনের জন্য বন্দনীয় নন ? অর্থাৎ সকলের জন্যই বন্দনীয় ।

■ পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ভক্তরা কাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে ?যজ্ঞ করেও অভক্ত কারা?

প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥
সামবেদ ৫৫৩
সরলার্থঃ সোমরসকে অভিষুতকারী অর্থাৎ সোমযাগ, সমাজসেবার জন্য এবং প্রভুভক্তদের উদ্দেশ্যে যে মানব ওই প্রশংসাত্মক উক্তি করতে চায় না, এমন ওই
১. অযজ্ঞসেবী,
২. অসমাজসেবী এবং
৩. কাম ও দ্বেষভাবযুক্ত,
৪. নিজের উদরপূর্তিকারী
মানবকে দূর করে দাও; যেমন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা জ্বাজ্জল্যমান তপস্বীগণ চঞ্চলতাকে দূর করে দেন অথবা যেমন তেজস্বী রাজপুরুষ মখাসুরকে অর্থাৎ যারা যজ্ঞের ভান ধরে ভণ্ডামি করে তাদের দণ্ডিত করেন।
অর্থাৎ পরোপকার রূপ যজ্ঞবিরোধী, সামাজিক উপকার কর্ম বিরোধী এবং বিষয়লোভীদের সঙ্গ করা অনুচিত ও যারা যজ্ঞের নামে করে অবিহিত আচার করে তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়া উচিত ।
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ব্রহ্মভাব কী ?

স য়ো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥
মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩.২.৯
সরলার্থঃ যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন। তাঁর কুলে (বংশে) কেউ অব্রহ্মজ্ঞ হয় না। তিনি শোক ও পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন এবং হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যু-রহিত হন অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥

যে আত্মজ্ঞানী পুরুষ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হন। যেমন, “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য০ উপ০ ৮।৩।৪)” এবং “য় আত্মা অপহতপাপ্মা (ছান্দোগ্য০ ৮।৭।১)” ইত্যাদি বাক্যে বলা

হয়েছে যে, 'পরম্ জ্যোতি'-কে প্রাপ্ত হয়ে জীব নিজের শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হন এবং পরমাত্মার তুল্য অপহতপাপ্মাদি ধর্মকে ধারণ করেন। এই ভাবকে মহর্ষি বেদব্যাস, আচার্য জৈমিনির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন— মুক্তি অবস্থায় জীবগণ ব্রহ্মের ধর্মযুক্ত (ব্রহ্মগুণান্বিত) হন (ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥; ব্র০ সূ০ ৪।৪।৫)। জীবাত্মার স্বভাব হচ্ছে, যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে তদ্ধর্মা হয়ে অর্থাৎ তার অনুরূপ ধর্ম ধারণ করে অবস্থান করেন। উদাহরণস্বরূপ, জল যে পাত্রে রাখা হয়, তার আকারই ধারণ করে। যেমন পৃথিবীতে পার্থিব এবং আগ্নেয় লোকে আগ্নেয় শরীর (Extremophiles) বা ধর্ম নিয়ে জীব বাস করে, তদ্রূপ মুক্ত আত্মা ব্রাহ্মধর্ম ধারণ করে ব্রহ্মে অবস্থান করেন এবং মুক্ত আত্মা শরীর-স্থানীয় ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা নিজের কামনা পূরণ করেন। এ বিষয়ে শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লিখেছেন— "শরীরের আধারে থেকে জীব যেমন ইন্দ্রিয়গোলকের দ্বারা স্বকার্য সিদ্ধ করে, তদ্রূপ মুক্তি অবস্থাতেও জীবাত্মা পরমেশ্বরের আধারে সমস্ত আনন্দ ভোগ করে (সত্যার্থ০ ৯ম সমু০)।" ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) বলা হয়েছে— "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ মুক্তিতে জীবাত্মা নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি যা কিছু করেন, নিজের স্বরূপে স্থিত থেকেই করেন। বেদান্তদর্শনে (৪।৪।৮) বলা হয়েছে— "সংকল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ॥" অর্থাৎ শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত যে, মুক্ত আত্মার কামনা সংকল্পমাত্র সিদ্ধ হয়। এই সন্দর্ভে ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।২।১০) বর্ণিত আছে— "য়ং য়মন্তমভিকামো ভবতি য়ং কামং কাময়তে, সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে॥" অর্থাৎ তিনি যে যে প্রদেশ ও কাম্যবস্তু কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই তা তাঁর নিকট উদ্ভূত হয় এবং তিনি তা লাভ করে আনন্দিত হন। তাৎপর্য এই যে, মুক্তাত্মা নিজের শক্তিরূপ 'সংকল্প' দ্বারা ভাবনার অনুরূপ সবকিছু অনুভব করেন, যার অভিব্যক্তি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়ার পরই হয়। অতএব, মুক্তিতে জীবাত্মা স্ব-সামর্থ্যের সাথে বিরাজ করে, তাঁর অস্তিত্বের নাশ হয় না। তাছাড়া উপর্যুক্ত শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, তাঁর কুলে কোনো 'অব্রহ্মবিৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানহীন পুরুষ হবে না। এই বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এখানে ব্রহ্মভাবই অভিপ্রেত, স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার নয়। কেননা, যদি এখানে জীবের ব্রহ্ম হওয়ারই অভিপ্রায় হতো, তাহলে এটি কখনো বলা হতো না যে, তাঁর কুলে কোনো পুরুষ অব্রহ্মজ্ঞ হবে না। কারণ নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাঁর কোনো কুল থাকতে পারে না। যদি তাঁর কুল মানা হয়, তাহলে বুঝতে হবে, কুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক এখনো নিবৃত্ত (সমাপ্ত) হয়নি। যদি কুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক থেকেই যায়, তাহলে তিনি কীভাবে ব্রহ্ম হতে পারেন? এইপ্রকারে পূর্বাপর বিচার দ্বারা এখানে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এর অর্থ 'তদ্ধর্মতাপত্তি' দ্বারা ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হওয়ার, নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার নয়। এভাবে সেই ব্রহ্মবিদ পুরুষের শোক (যা সংকল্প-বিকল্প ও ইচ্ছার দ্বারা উৎপন্ন হয়) এবং পাপ (যা কর্তব্যের অনাচরণ ও অকর্তব্যের আচরণ দ্বারা উৎপন্ন হয়) সবকিছু সেই জ্ঞানাধিগম্য এক ইষ্টদেব পরমাত্মার আশ্রয়েই দূর হয়ে যায়। কারণ তাঁর মধ্যে যখন কোনো আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট নেই, তাহলে শোকের আশঙ্কা কেন? তাঁর আর কোনো কর্তব্য-অকর্তব্য বাকি থাকে না, কারণ তিনি বিধি-নিষেধের মার্গ আগেই অতিক্রম করেছেন। তাঁর জন্য দেশ, কাল বা সমাজের বন্ধন অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। আর তাঁর কুলে কেউ অব্রহ্মজ্ঞ হন না। কারণ যে কুলে আস্তিকতা ও ব্রহ্ম-পরায়ণতার পরিবেশ আছে, সেখানে কোনো নাস্তিক ও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ থাকতে পারে না॥

টীকাঃ এই শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি 'ব্রহ্ম এব' হয়ে যান। এখানে 'এব' এর অর্থ 'ইব', অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের সমান হন। 'সমান' বা 'ইব' এর প্রয়োগ তখন করা হয়, যখন একটি বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকে। যেমন, এই পুরুষ সিংহের সমান; অর্থাৎ কিছু অংশে সিংহের সমান, সর্বাংশে নয়। এভাবে জীব ব্রহ্মের অপহতপাপ্মাদি গুণসমূহ ধারণ করে ব্রহ্মের সমান হয়ে যান। বামন শিবরাম আপ্টে তাঁর সংস্কৃত অভিধানে 'এব' শব্দের অর্থ লিখেছেন— like, as (Showing Similarity)। তিনি আরো লিখেছেন— This particle is used in the Vedas in the sense of so, justso, like, indeed, truly, really। অর্থাৎ বেদে 'এব' এর অর্থ 'ইব'-ও হয়। উপনিষদের

কোথাও কোথাও এমন কিছু বাক্য আছে যেখানে আপাতদৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সাথে এমনও শ্রুতিবাক্য আছে, যেখানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট। তাছাড়া অমরসিংহ প্রণীত "অমরকোষ" গ্রন্থের অব্যয়বর্গে 'এব' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য বলা হয়েছে (ব বা য়থা তদেবৈবং সাম্যে)। এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে— 'উপনিষদ্' শুধু দার্শনিক কোনো গ্রন্থ নয়, বরং এতে কাব্যরসও আছে। এজন্য যেখানে 'সর্ব ব্রহ্মময়ত্ব' এর প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেখানে তা ভক্তি-ভাবনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই করা হয়েছে। যেমন, একজন মানুষ যখন আরেকজনের প্রশংসা করে বলে— আপনার মতো আমার জীবনে আর কেউ নেই। এখানে 'কেউ নেই' এর তাৎপর্য হচ্ছে, 'আমার জীবনের অধিকাংশ জুড়ে আপনি'। এই ভাব ব্রহ্মের সম্বন্ধেও বুঝতে হবে॥

▪ (হ বৈ) নিশ্চিতরূপে (য়ঃ) যিনি (তৎ) সেই (পরমম্ ব্রহ্ম) সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে (বেদ) জানেন (সঃ) তিনি (ব্রহ্ম, এব) ব্রহ্মভাবই [প্রাপ্ত] (ভবতি) হন (অস্য, কুলে) এঁর কুলে (অব্রহ্মবিৎ) অব্রহ্মজ্ঞ (ন, ভবতি) হয় না [এবং তিনি] (শোকম্ তরতি) শোক থেকে উত্তীর্ণ হন (পাপ্মানম্ তরতি) পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন [এবং] (গুহাগ্রন্থিভ্যঃ) হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি থেকে (বিমুক্তঃ) মুক্ত হয়ে (অমৃতঃ, ভবতি) মৃত্যু-রহিত হন অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥

✅উপনিষদ্ সংগ্রহ - ১ম খণ্ড

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী নারীদের উন্নতির বিষয়ে সব থেকে উন্নত ও যৌক্তিক চিন্তাধারা পোষণ করতেন । ক্ষত্রিয় স্ত্রীদের ধনুর্বেদের শিক্ষাও দেওয়া উচিৎ, এই বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন-

"দেখো, আর্যাবর্তের রাজপুরুষগণের স্ত্রীগণ ধনুর্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাও খুব ভালো জানতো ; কেননা যদি না জানতো তো কৈকেয়ী আদি দশরথ আদির সাথে যুদ্ধে কী করে যেতে পারত এবং যুদ্ধ করতে পারতো?"

- সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস

বেদভাষ্যে স্বামীজি লিখেছেন-

হে মনুষ্যা ! যা রাজ্ঞী ধনুর্বেদবিচ্ছস্ত্রাস্ত্রপ্রক্ষেপ্ত্রী বর্ত্ততে তস্যা বীরৈঃ সৎকারঃ সততং কার্য্যঃ ॥

ঋগ্বেদ ৬.৭৫.১৫

অর্থাৎ, হে মানবগণ ! যে রানী ধনুর্বেদ জানে, অস্ত্রশস্ত্র চালাতে জানে, বীরগণের তাঁকে নিরন্তর সৎকার করা উচিৎ ।

রাজার অনুপস্থিতিতে রানী সেনাপতিত্বের কাজ যেন সামলে নেয়, এরকম নিদের্শ করে লিখেছেন-

সংগ্রামে রাজাভাবে রাজ্ঞী সেনাপতিঃ স্যাদ্যথা রাজা যোধয়িতুং বীরান্ প্রেরয়েদ্ধর্ষয়েত্তথৈব সাঽপ্যাচরেৎ ॥

ঋগ্বেদ ৬.৭৫.১৩

অর্থাৎ, সংগ্রামে, রাজার অভাবে রানী যেন সেনাপতি হয় এবং যেমন রাজা যুদ্ধ করানোর জন্য বীরগণকে প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করে, তেমনিই রানীও যেন আচরণ করে ।

পুরুষদের মতো নারীদেরও যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর জন্য উৎসাহিত করে বলেছেন,

সভাপত্যাদিভিঃ যথা যুদ্ধবিদ্যযা পুরুষাঃ শিক্ষণীয়াস্তথা স্ত্রিয়শ্চ, যথা বীরপুরুষা যুদ্ধং কুর্যুস্তথা স্ত্রিয়োঽপি কুর্বন্তি।

যজুর্বেদ ১৭.৪৫

অর্থাৎ, সভাপতি প্রভৃতির কর্তব্য হলো, যুদ্ধবিদ্যা যেভাবে পুরুষদের শেখানো হয় তেমন নারীদেরও শেখানো । যেভাবে বীরপুরুষ যুদ্ধ করবে সেভাবে নারীও যুদ্ধ করবে ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ব্রহ্মবাদিন্য ঋষিকাঃ

ঘোষা গোধাবিশ্ববারা, অপালোপনিষন্নিষৎ।
ব্রহ্মজায়া জুহূর্নাম অগস্ত্যস্য স্বসাদিতিঃ॥
ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা রোমশোর্বশী।
লোপামুদ্রা চ নদ্যশ্চ যমী নারী চ শশ্বতী॥
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ॥

- ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষদ্, নিষদ্, ব্রহ্মজায়া (জুহূ), অগস্ত্যের ভগিনী, অদিতি, ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্র মাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা ও নদিগণ, যমী, শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রী ও সূর্যা- সাবিত্রী ইত্যাদি সবাই ব্রহ্মবাদিনী।

ইমা বিদুষ্যঃ কিল বেদতত্ত্বং,
বিজ্ঞায় তদ্বোধনহেতুনর্ষিকাঃ ।
খ্যাতা ধরিত্র্যাং রমণীমণীস্তাঃ,
ভক্ত্যা নমামঃ পরিপূতচিত্তাঃ ॥১॥

অর্থঃ এই বিদুষীরা নিশ্চয়ই বেদতত্ত্ব জেনে উপদেশ প্রদানের কারণে ঋষিকা নামে ধরাতলে খ্যাতি লাভ করেছেন। এমন পবিত্র চিত্তযুক্তা রমণীদের আমরা ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি।

[টীকা: ঋষিকাঃ - মন্ত্র দ্রষ্ট্যঃ, ঋষির্দর্শনাৎ (নিরু০ ২.১১)- ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারস্তদ্বৎ (নিরু০ ২.১১ দু০ বৃ০) স্ত্রিয়ঃ - ঋষিকাঃ]

সদ্ব্রহ্মচর্যব্রতমাচরন্ত্য-
স্তাসামনেকা ভুবি জীবিতান্তম্ ।
তেপুস্তপো দারুণমপ্রধৃষ্যং,
বিহায় সর্বা অপি লৌকিকেচ্ছাঃ ॥২॥

অর্থঃ তাঁদের অনেকেই সমগ্র জীবন উত্তম ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে লৌকিক সর্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করে কঠোর, অদম্য তপস্যা করেছেন।

তাসাং চরিত্রং বিমলং পবিত্রম্,
অঘৌঘবিধ্বংসনমত্র চিত্রম্ ।
আসীৎসমস্তং খলু শুদ্ধসত্রং,
তদ্বর্ণনে কোঽপি কবির্ন শক্তঃ ॥৩॥

অর্থঃ তাঁদের চরিত্র নির্মল, পবিত্র, পাপপ্রবৃত্তিনাশক, অদ্ভুত, সম্পূর্ণ শুদ্ধ যজ্ঞ রূপ ছিলো। তার বর্ণনা করতে কে-ই বা সমর্থ ?

[টীকা: সত্রম্ যজ্ঞঃ]

বিদ্যাপ্রচারে তমসো নিবারে,

ধর্মপ্রসারে হ্যনৃতাপহারে ।

আসন্ প্রসক্তা রমণীসুধারে,

সদ্‌ব্রহ্মবাদিন্য ইমাঃ সুমান্যাঃ ॥৪॥

অর্থঃ বিদ্যা প্রচারে , অন্ধকার নিবারণে, ধর্ম প্রসারে, অসত্য নিরাকরণে ও নারী সংস্কারে এই অত্যন্ত মান্য উত্তম ব্রহ্মবাদিনীগণ তৎপর ছিলেন।

স্বকীয়সৌখ্যস্য বিহায় চিন্তাং,

রাত্রিন্দিবং সর্বজনোপকারে ।

এতা নিমগ্না নহি কস্য বন্দ্যা

ভক্ত্যা নমামো রমণীমণীস্তাঃ ॥৫॥

অর্থঃ নিজের সুখের চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্রি পরের উপকারে তৎপর এই মণিস্বরূপ রমণীগণ কাদের জন্যই বা বন্দনীয় নন ? আমরা তাদের ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি।

মূল: পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যাবাচস্পতির্বিদ্যামার্তণ্ড

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

আসলেই কি ঈশ্বর যাকে খুশি নিজ কৃপা করেন, সবার প্রতি নয় ?

✅ঈশ্বরের কৃপা সর্বদা সবার উপর থাকে। এমন কোন প্রাণী নেই যার উপর সর্বদা প্রভুর কৃপা থাকে না। এখন এ প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে যে, পরমাত্মা কার উপর বিশেষ কৃপা করেন? সাধারণত ঈশ্বর সবার প্রতি সমান কৃপা করেন, সবাইকে বায়ু জল, কিরণ প্রদান করেন, কিন্তু সজ্জন এবং পুরুষার্থী ব্যক্তিদের প্রতি তার বিশেষ কৃপা থাকে। তাদের হৃদয়ে সর্বদা সন্তোষ এবং আনন্দের অনুভূতি প্রদান করে নিজের বিশেষ কৃপা করেন।

ঈশ্বরের কৃপার জন্য সুপাত্র হওয়া পরম আবশ্যক। কোন ভিক্ষুক যখন কারোর গৃহে ভিক্ষা করতে যায়। গৃহে ক্ষীর রন্ধন হয়েছে। গৃহিণী দেখে যে, ভিক্ষুকের পাত্র নোংরা, অতএব ক্ষীর দিলে খারাপ হয়ে যাবে আর ভোজনের উপযুক্ত থাকবে না, অতএব সেই পাত্রে ক্ষীর দেবার আগে ভিক্ষুককে বলে যে, আগে নিজের পাত্র ধুয়ে স্বচ্ছ করে নিয়ে আসুন, তখন ভিক্ষা পাবেন। যার পাত্র শুদ্ধ-পরিষ্কার হয় সেই ভিক্ষা পাবার অধিকারী হতে পারে। এই স্থিতি সবার সঙ্গে জড়িত। যতক্ষণ মনুষ্য নিজের হৃদয়পাত্রকে পরিষ্কার করে না শুদ্ধ পবিত্র করে নেয় না অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদি অপবিত্র বস্তুগুলিকে বাইরে নিক্ষেপ করে না, ততক্ষণ ঈশ্বরের অমৃতময়ী কৃপা কীভাবে লাভ করতে পারে? ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী সর্বব্যাপক। তার জানা আছে কে কুপাত্র এবং কে সুপাত্র। যাচনা বিনাই সুপাত্র সবকিছু পেয়ে যান আর যাচনা করলেও কুপাত্রের কিছুমাত্রও লাভ হয় না।

যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস আদান-প্রদান হচ্ছে, ভেবে নাও ঈশ্বরের কৃপা বিরাজ করছে। ঈশ্বর পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্রমা, তারা, নক্ষত্র সমস্ত জীবের জন্যই নির্মাণ করেছেন। যার মধ্যে যতটুকু যোগ্যতা রয়েছে, সে এই প্রকৃতি থেকে, জড়

দেবতার থেকে লাভ গ্রহণ করে। এটাই ত পরমপিতা পরমাত্মার কৃপা। মানব জীবিত রয়েছে প্রাণের স্পন্দন চালু আছে, এও ত সেই প্রভুরই কৃপার প্রভাব!

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

উপনিষদে জীবনে চলার পথের শিক্ষা

🔰তৈত্তিরীয় উপনিষদে কি শুধুমাত্র নিবৃত্তির কথা বলা আছে, না কি এখানে সুখময় জীবন অতিবাহিত করে দীর্ঘায়ু উপভোগের কথা বলা হয়েছে? এ বিষয়ে বিচার করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ উপনিষদ্ বিচার করলে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, উপনিষদে কেবল এই ভূলোক থেকে নিবৃত্তির বর্ণনাই নেই বরং এই পৃথিবীতে আনন্দপূর্ণ জীবন লাভের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাও বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদে আচার্য, শিষ্য ও প্রবচনের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারাই এসব জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাষ্ট্রে বিস্তৃতি লাভ করে মানুষদের সুখী করে। এরপর মাতা, পিতা ও প্রজনন কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী-পুরুষ পূর্বোক্তভাবে সুশিক্ষা লাভ করে উভয়ে গৃস্থাশ্রমে বিধিপূর্বক প্রবেশ করবে এবং নিজের রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন করবে। সন্ন্যাসাশ্রম নয়, সুপ্রজা নির্মাণের আদর্শই এখানে লক্ষ্য। এজন্য বলা হয়েছে— "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ" (শীক্ষা০ ১১।১) অর্থাৎ প্রজা উৎপত্তির ধারা বিচ্ছেদ কোরো না অর্থাৎ সন্তান উৎপন্ন করো এবং সন্ততিপরম্পরা অটুট রাখো। এই উপদেশে গার্হস্থ্যধর্ম বৃদ্ধির জন্য বলা হয়েছে। শীক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাক নিম্নরূপ -

▪ বেদমনূচ্যাচার্য়োঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য়ায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥১॥

👉সরলার্থঃ আচার্য বেদ অধ্যাপনা করে শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করছেন যে, "হে শিষ্য! তুমি সত্য বলবে, বেদপ্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্মের আচরণ করবে। পঠন পাঠনে প্রমাদ করবে না, আচার্যের জন্য প্রিয় ধন আহরণ করবে। সন্তানধারাকে উচ্ছেদ করবে না, সত্যের পালনে প্রমাদ করবে না। ধর্ম পালনে প্রমাদ করবে না, নিজের শারীরিক আরোগ্যতা সম্পাদনে প্রমাদ করবে না। ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে প্রমাদ করবে না, স্বাধ্যায় ও প্রবচনে প্রমাদ করবে না"॥১॥

🔻এখানে "সত্য" শব্দ অহিংসা আদি যমের পাঁচটি উপলক্ষণ, যেমন "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য়াপরিগ্রহা য়মাঃ" যোগ০ ২।৩০ এই সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মন, বাক্য তথা শরীর দ্বারা অনিষ্ট চিন্তন, কঠোর ভাষণাদি দ্বারা প্রাণিমাত্রকে দুঃখ দেয়াই হচ্ছে 'হিংসা' আর কখনো কাউকে দুঃখ না দেয়াই হচ্ছে 'অহিংসা'। যথার্থ ভাষণ অর্থাৎ যেমন দর্শন, শ্রবণ বা অনুমান করা হয়েছে, ঠিক তেমন বর্ণনা করার নাম 'সত্য', ছল, কপট, চুরি তথা তাড়নাদি যে কোনোভাবে অন্যের সম্পদকে অধিগ্রহণ না করাই হচ্ছে 'অস্তেয়', সকল ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধপূর্বক উপস্থেন্দ্রিয়ের নিরোধের নাম 'ব্রহ্মচর্য' এবং দোষদৃষ্টি দ্বারা বিষয়ভোগে ঘৃণার নাম 'অপরিগ্রহ'। তোমার সর্বদা এই পাঁচের আচরণ তথা নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসমূহ তোমার সর্বদা করা উচিত। প্রত্যহ বেদের স্বাধ্যায় করা উচিত এবং নিজের স্বভাবানুকূল স্ত্রী দ্বারা বৈদিক সংস্কারানুসার বিবাহ করে প্রজা উৎপন্ন করা উচিত। নিজের শরীরের আরোগ্য সম্পাদনে কখনো প্রমাদ করা উচিত নয়, কারণ স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যক্তি কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। ধনাদি ঐশ্বর্যের প্রলোভনে পড়ে নিজের ধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। নিয়মিত বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা অবশ্য কর্তব্য; যেন আমরা পঠিত বিদ্যা ভুলে না যাই।

🍁এখন আচার্য শিষ্যকে মাতা-পিতা ও আচার্যকে দেবজ্ঞানে সেবা করতে উপদেশ দিচ্ছেন—

▪ দেবপিতৃকার্য়াভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য়দেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। য়ান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। য়ান্যস্মাক সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥২॥

👉সরলার্থঃ দেব ও পিত্রাদির সেবা কার্যে কখনো প্রমাদ করবে না। মাতাকে দেবরূপে মান্য করবে, পিতাকে দেবরূপে মান্য করবে, আচার্যকে দেবরূপে মান্য করবে, অতিথিকে দেবরূপে মান্য করবে। যে সকল অনিন্দিত কর্ম সেসবই তোমার আচরণ করা উচিত, দোষযুক্তগুলো নয়। আমাদের যেসব কর্ম বেদানুকূল সেগুলো তোমার অনুকরণ করা উচিত, অন্য সমস্ত নয়॥২॥

🍁য়ে কে চারুমচ্ছ্রেয়াসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়া২২সনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্॥৩॥

👉সরলার্থঃ আর যে সকল বিদ্বান ব্রাহ্মণ আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, তোমার তাঁদেরকে আসনাদি প্রদানপূর্বক সৎকার করা উচিত। শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁদের অন্নাদি দানপূর্বক করা উচিত, শ্রদ্ধা না থাকলেও দান করা উচিত। সবসময় প্রসন্নতাপূর্বক দান করবে, সলজ্জভাবে দান করবে, সভয়ে দান করবে, জ্ঞানপূর্বক দান করবে॥৩॥

🍁অথ য়দি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। য়ে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। য়ুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। য়থা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। য়ে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ। য়ুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। য়থা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্॥৪॥

👉সরলার্থঃ অতঃপর যদি তোমার বেদোক্ত কর্ম অথবা সদাচার বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে যাঁরা বিচারশীল, বেদবেত্তা, স্বয়ং উক্ত কার্যে যুক্ত অথবা কারো দ্বারা নিযুক্ত অথবা প্রেরিত, নিষ্ঠুরতা রহিত, ধর্মাভিলাষী থাকবেন, তাঁরা সেই বৈদিক কর্মে যেরূপ রত থাকেন, তদ্রূপ সেই কর্মে তোমারও রত থাকা উচিত। যদি এমন বিবাদাস্পদ বিষয়ে শঙ্কার উদ্ভব হয়, তবে সেখানে উপর্যুক্ত বিদ্বান পুরুষদের অনুগমন করবে। এটি বেদশাস্ত্রের আদেশ, এটিই উপদেশ, এটিই বেদের রহস্য, এটিই অনুশাসন, এই ভাবেই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এবং এই ভাবেই অনুষ্ঠান করতে হবে॥৪॥

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে সৌরশক্তিতে চলনমান বিমান

অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ ।
মহত্তদ্বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ ॥
ঋগ্বেদ ৪।৩৬।১

(ঋভবঃ) হে সূর্যকিরণ ! তোমার সৌরশক্তিতে চলমান (অনশ্বঃ) অশ্বহীন, (অনভীশুঃ) লাগামহীন, (উক্থ্যঃ) প্রশংসনীয়, (ত্রিচক্রঃ) ত্রিচক্রযুক্ত (রথঃ) রথ অর্থাৎ বিমান (জাতঃ) তৈরি হয়েছে, যা (রজঃ পরিবর্ততে) অন্তরিক্ষলোকে পরিভ্রমণ করে। হে সূর্যকিরণ! (তদ্ বঃ দেব্যস্য প্রবাচনম্) সেটি তোমার কলাকৌশলকে ব্যক্তকারী (বৃহৎ) মহান্ কার্য (যৎ) যে তুমি স্বীয় সৌরশক্তির মাধ্যমে (দ্যাং পৃথিবীং চ পুষ্যথ) আকাশ ও ভূমিকে পরিপুষ্ট করো, অর্থাৎ স্বীয় সৌরশক্তি দ্বারা আকাশ ও ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র চালনা করো ।

[ঋভবঃ - আদিত্যরশ্মি নিরুক্ত ১১।১৪]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর